সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

হেমন্তের ভোর। কিছুক্ষণ হল আলো ফুটেছে। খুলে গেল

১ পর্ব

বামুনবুড়ির ঘরের দরজা। প্রথমে পর পর দু'টো বিড়াল বাচ্চা লাফিয়ে এল বাইরে। তারপর পাতলা চাদর গায়ে বামুনবুড়ি। দালানে শুয়ে থাকা কুকুরটারও ঘুম ভাঙল। আড়মোড়া সহ বার কয়েক ডনবৈঠক মেরে চলে এল বুড়ির পায়ের কাছে। দালান ধারে কলাইয়ের থালা চাপা দেওয়া জলের বালতি। পাশে গিয়ে উবু হয়ে বসল বুড়ি। চোখে-মুখে জল দেবে। তার আগে চোখ বোলায় বাড়ির উপর। দশ কাঠা জুড়ে এই বাড়ি প্রায় দু'শো বছরের পুরনো। জীর্ণ অবস্থা। বামুনবুড়ির গায়ের কোঁকড়ানো চামড়ার সঙ্গে কোথায় যেন মিল খায়। বুড়ির বয়স কম-বেশি আশি। এ বাড়িতে চব্বিশ ঘরের বাস। সবার আগে ঘুম ভাঙে বামুনবুড়ির। মুখ-হাত ধুয়ে যায় ঠাকুর দালানের দিকে মুখ করে, কপালে হাত ঠেকাতে। তারপর হেলতে-দুলতে চলে সদরের দিকে। পাশেই ছিটেবেড়ার চা-দোকান। উনুনে আঁচ দিতে সাহায্য করে শ্যামলকে। দিনের প্রথম চা বামুনবুড়ি ওখানেই খায়। বিস্কুটের টুকরো ছুড়ে দেয় কুকুর-বিড়ালদের। এ বাবদ শ্যামল কোনও পয়সা নেয় না। অলিখিত চুক্তি আছে বামুনবুড়ির সঙ্গে।

আজ কিন্তু কাজ এগোচ্ছে না। এখনও পর্যন্ত বাসিমুখ ধুতে পারেনি বুড়ি। মনটা কেমন যেন এলিয়ে আছে। কেন এরকম উদাসভাব, কারণটা কী? কাল রাতে কি কোনও বাজে স্বপ্ন দেখল? স্বপ্নটা ভুলে গেলেও, মন খারাপটা রয়ে গিয়েছে। ঠিক ঠাহর করা যাচ্ছে না ব্যাপারটা। অন্যদিন ভোরের এই সময়টুকু বামুনবুড়ির বড় মনোরম লাগে। উঠোনের গাছে বসে ডাকে ভোরের পাখি। চারপাশে ফুটে ওঠে তালশাঁস রঙের আলো। জমিদারের বাড়িটাকে ততটা প্রাচীন বলে মনে হয় না। বেলা যত বাড়ে, জেগে উঠতে থাকে চব্বিশটা সংসারের মানুষ। দশ কাঠা জুড়ে প্রায় হাট বসে যায়! মনে হয়, কানাইপুরের সব ঝগড়ুটেরা বুঝি এই বাড়িতেই থাকে। বিষিয়ে যায় বাড়ির বাতাস। এর জন্য অবশ্য বামুনবুড়িই দায়ী।

কানাইপুর এখন দমচাপা শহর। ঘেঁষাঘেঁষি বাড়ি, ফ্ল্যাটবাড়ি। মাঝে ক্ষয়ে যাওয়া দাঁতের মতো এই বাড়ি। লোকে দুর্গাবাড়ি বলে ডাকে। পুরোটাই একতলা। বাড়িটার শেষের দিকে দু'টো দোতলা ঘর ছিল। ছাদ-টাদ ভেঙে আর বাসযোগ্য নেই। একসময় বাড়ির দু'পাশে অনেকটা খোলা জায়গা ছিল। খেলার মাঠ, ধার ঘেঁষে তাল-সুপুরির গাছ। সবই জমিদারের সম্পত্তি। শরিকরা কবেই সে সব বিক্রি করে দিয়েছে। ঢাউস-ঢাউস ফ্ল্যাটবাড়ি হয়েছে সেখানে। শুধু দুর্গাবাড়ি রয়ে গিয়েছে একই রকম। হাত ছোঁয়াতে পারেনি প্রোমোটার। এই জমি উদ্ধার করা মহা ফ্যাচাঙের কাজ। পুরো ব্যাপারটা জিলিপির প্যাঁচ হয়ে আছে...ভাবনাটা মাথায় আসতে মন

খারাপের কারণটাও পরিষ্কার হয়ে গেল। আজ এক প্রোমোটার আসবে বামুনবুড়ির সঙ্গে কথা বলতে। আগেও একদিন এসেছিল। চব্বিশ ঘর কীভাবে উৎখাত করবে তা-ও জানিয়েছে। প্রত্যেককে ক্ষতিপূরণ দেবে। সকলের সঙ্গে কথা বলে বুঝেছে, উপযুক্ত টাকা পেলে তারা অরাজি হবে না। এখন একমাত্র আটকেছে বামুনবুড়ির কাছে। এ বাড়ির চার শরিকের মধ্যে বামুনবুড়ি একজন। সে সই করে দিলেই বাড়িটা বিক্রি হয়ে যাবে। বদলে পাবে টাকা অথবা ছোট একটা ফ্ল্যাট। বুড়ি কিছুতেই মনস্থির করতে পারছে না। প্রোমোটার আজই ফাইনাল কথা জানতে আসবে। এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কারও সঙ্গে একটু পরামর্শ করা প্রয়োজন। কার সঙ্গে করবে? বামুনবুড়ির নিজের লোক বলতে একজনই আছে এ-বাড়িতে। নাতি বিজন। তা-ও সে রাতে থাকে না। ঠাকুরদালানের ঘরটায় যেখানে দুর্গাপুজো হত, বিজন ওখানে ছোট কারখানা দিয়েছে। স্ক্রিন প্রিন্টিং, কম্পিউটার, বাক্স-টাক্স তৈরি হয় সেখানে। সকাল আটটা নাগাদ খোলে, বন্ধ হয় রাত আটটায়। কাজের চাপ থাকলে দশটা, এগারোটাও বাজে। রক্তের সম্পর্কে ওই একজনের সঙ্গেই বুড়ির সপ্তাহের ছ'দিন দেখা হয়। বিজনকে বলেছিল বুড়ি, "এই প্রোমোটারটা ঘোড়েল পার্টি। মনে হচ্ছে, বাড়িটা কিনেই ছাড়বে। তুই কী করবি তখন?"

বিজন বলেছে, "কী আবার করব! পাকা ঘর চাইব একটা। সেখানেই চালাব কারখানা।"

"যদি জায়গা দিতে রাজি না হয়।"

"টাকা তো দেবে। কোথাও ভাড়া করে উঠে যাব অথবা কিনে নেব অন্য কোনও জায়গা। আমার তো আর দোকান নয়, জায়গা বদলালে বিজনেসের ক্ষতি হবে।" বলেছিল বিজন। সত্যি বলতে কী, এ বাড়ি বিক্রি হলে কারওরই তেমন কোনও ক্ষতি হবে না। বরং উপকার হবে। মাঝে-মাঝেই ছাদের চাঙর ভেঙে পড়ে। চোট পায় ঘরের লোকজন। যে কোনও সময় ঘরও ভেঙে পড়তে পারে। প্রচুর ফাটল। যে যার নিজের অংশ সামর্থ্য অনুযায়ী সারাই করে। লাভ হয় না কিছু। টাকাটাই জলে যায়।

বাড়ি বিক্রির পক্ষে এত যুক্তি, বিপক্ষে কি একটাও নেই...দালানে বসে চৌকোনা উঠোনের দিকে তাকিয়ে আছে বুড়ি। জবা, তুলসী, শিউলি, আতা, লঙ্কা যে যেমন পারে গাছ লাগিয়েছে। ঝোপমতো হয়ে আছে জায়গাটা। মাটিটা খারাপ নয়। ফুল ফোটে, আতা, লঙ্কা ফলেছে বেশ কিছু। এই ফল, ফুলগুলোই জানান দিচ্ছে, এ বাড়ির প্রতি বাসিন্দাদের কিছুটা অন্তত ভালবাসা, মায়া আছে। এ সব কেটেকুটে যখন ফ্ল্যাট হবে, ওদের বুকে কি কাঁটা বিঁধবে না? নিশ্চয়ই বিঁধবে। সেই যন্ত্রণা উপশম হবে কত টাকায়, কে জানে! তবে বুড়ি একটা বিষয়ে নিশ্চিত, এখানকার বাসিন্দাদের মতের মিল হওয়ার নয়। কিছু সম্পর্ক একেবারে সাপে-নেউলে। নির্দিষ্ট টাকায় এদের রাজি করানো মুশকিল। বিভিন্ন আয়তনের জায়গা নিয়ে বসবাস করছে এরা। কে কত টাকা পাবে, এটা ঠিক করতে হিমশিম খাবে প্রোমোটার। কোনও বাসিন্দার যদি মনে হয়, অমুক বেশি টাকা পাচ্ছে, ঠিক ঝামেলা পাকিয়ে তুলবে। এদের হাড়ে-হাড়ে চেনে সে...

বালতি চাপা থালা তুলে চোখে-মুখে জল দেয় বামুনবুড়ি। আসল নাম কনকলতা ভট্টাচার্য। বছর কুড়ি আগে কর্তার সঙ্গে ওই নামটাও সহমরণে গিয়েছে। 'বামুনবুড়ি' নামটা জমিদার বাড়ি থেকে পাওয়া। একসময় ওটা 'বামুনদিদি' ছিল। দাঁত গোটা চারেক অবশিষ্ট। মাড়িতে আঙুল চালিয়ে কুলকুচি করল বুড়ি। মুখ থেকে ছুড়ে দেওয়া জলটা লঙ্কাগাছের গোড়া অবধি গেল না। চোয়ালে জোর নেই। হঠাৎই শুনতে পায়, বাতাসে ভাসছে সানাইয়ের সুর! বহু দূর থেকে আসছে শব্দটা। সেই রেল স্টেশন পার করে আকডাঙা থেকে হয়তো। মনে মনে হিসেব কষে নেয় বামুনবুড়ি...আশ্বিন, কার্তিক মলমাস গিয়েছে। বিয়ে বড় একটা হয় না। অগ্রহায়ণ মাসে প্রথম বিয়ের দিন গিয়েছে গতকাল। আজ কালরাত্রি, সামনের দিন বউভাত। অর্থাৎ সানাইয়ের শব্দটা বিভ্রম নয়। সুরটাকে খোঁজার জন্যই বুঝি আকাশের পানে মুখ তোলে কনকলতা। শরৎকাল সব মেঘ নিয়ে চলে গিয়েছে। আকাশ যেন তকতকে ঠাকুরদালান! মিহি সুতোর মতো সুরটা ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। জোড় হাত কপালে ঠেকায় বামুনবুড়ি। সুর লাগা ভোরটা বড় পবিত্র লাগে তার কাছে। মনে মনে ভগবানকে কৃতজ্ঞতা জানায়, আশি বছরের পুরনো কানে এখনও কত দূরের শব্দ শুনতে পাচ্ছে! এতদিন জানত, তার শ্রবণ সীমানা রেল স্টেশন পর্যন্ত। ভোরের দিকে ট্রেনের ভোঁ-টোঁগুলো শুনতে পায়। তার পর জেগে ওঠে কানাইপুর। শান্ত হতে রাত প্রায় বারোটা বাজে। ততক্ষণে চলে যায় শেষ ট্রেন। মেঝেতে হাতের চাগাড় দিয়ে উঠে দাঁড়ায় বামুনবুড়ি। অনেকদিন হল সোজা হতে পারে না। ধনুকের মতো বেঁকে যাচ্ছে শরীর। তারে ঝোলানো গামছায় মুখটা মুছে নেয়। ঠাকুরঘরের দিকে তাকিয়ে আর একবার নমস্কার করে। ওই ঘরে কোনও দেবতার মূর্তি নেই। বিজনের কারখানার মেশিন, কাগজপত্রে ঠাসা। তবু এ বাড়ির সকলেই কাজে বেরনোর আগে ঘরটার দিকে চেয়ে টুক করে কপালে হাত ঠেকায়।

দালান ধরে সদরের দিকে হেঁটে যায় বামুনবুড়ি। পায়ে-পায়ে চলেছে পুষ্যিরা। বুড়ির মাথায় উচ্চারিত হচ্ছে একটা মন্ত্র, *ওঁ ব্রহ্মা-মুরারিস্ত্রি পুরান্তকারী ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ। গুরুশ্চ শুক্রঃ শনি-রাহু-কেতুঃ কুর্বন্তু সর্বে মম সুপ্রভাতম* — আজকের মতো কোনও নির্মল ভোরে যখন দিন শুরু হত, কর্তা উচ্চারণ করে উঠতেন এই মন্ত্র। স্পষ্ট উচ্চারণ এবং মধুরকণ্ঠে মন্ত্রগুলো গানের মতো শোনাত। বড়ই নিষ্ঠাবান পূজারী ছিলেন তিনি।

এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কারও সঙ্গে একটু পরামর্শ করা প্রয়োজন। কার সঙ্গে করবে?

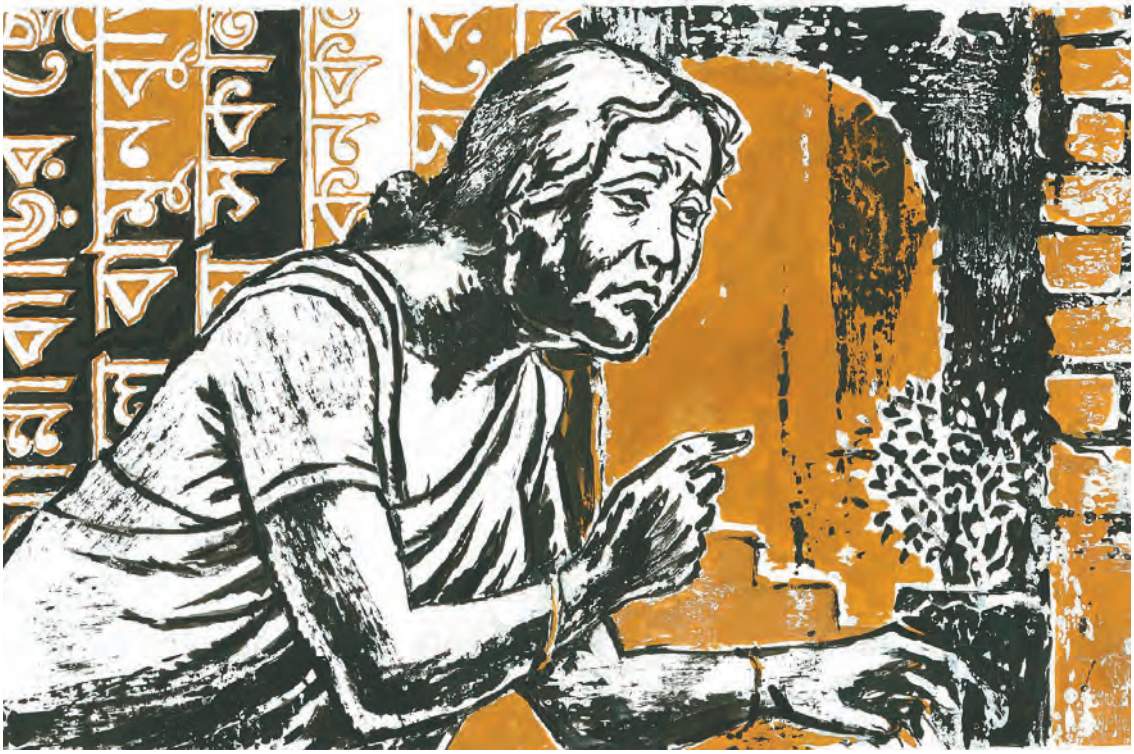

জমিদারবাড়ির লোকজন মাথায় তুলে রাখত। অথচ ওই মানুষটাকে শেষমেশ কী দুর্গতিটাই ভোগ করতে হল! এমত দুর্ভাগ্যের কারণও বামুনবুড়ি। জীবনে অনেক সৃষ্টিছাড়া কাজ কনকলতা করেছে। ফলও ভোগ করতে হয়েছে যথেষ্ট। তবু একটা বিশ্বাস আজও তার মনেপ্রাণে অটুট। জীবনভর অন্যায্য কোনও কিছু সে করেনি। সেটা আর কেউ না জানুক, ঈশ্বর জানেন!

পেল্লাই সদর দরজার আগে খানিকটা গলি। মাথার উপর ইট, সুরকির অর্ধবৃত্ত প্রমাণ করে বাড়ির প্রাচীনত্ব। বাইরে এসে বুড়ি দেখে শ্যামল উনুনে আঁচ দিয়েছে অনেকক্ষণ। কমে এসেছে ধোঁয়া। দোকান সাজাচ্ছে শ্যামলের বউ। বেঞ্চে গিয়ে বসে কনকলতা। তার অলস চাউনি এখন রাস্তার উপর। ধীরে ধীরে লোক চলাচল শুরু হয়েছে। মর্নিংওয়াকে বেরিয়েছে ফ্ল্যাটের বাসিন্দা। খবরের কাগজের হকার সাঁ সাঁ সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে। সদরে ঢোকার আগে কানে এল, "গুড মর্নিং ঠাকুরমা!" মান্নাবাড়ির ছোট ছেলে রোজই এটা বলে বামুনবুড়িকে। ফোকলা হাসি হেসে বুড়িও বলে, "গুড মর্নিং।" মধুর মশকরা দিয়ে শুরু হয় সকাল। আজ উত্তর দিতে ইচ্ছে করল না বুড়ির। কুকুরটা রয়ে গেল বাইরে। বিড়াল চলেছে পায়ে-পায়ে। ঠাকুরদালানে এসে দাঁড়াল কনকলতা। ঘরে তালা মারা। বিজনের তালা। কনকলতার ইচ্ছে করে আর একটা তালা মেরে দিতে। বিজন যাতে ঢুকতে না পারে। প্রচণ্ড অভিমান হচ্ছে নাতির উপর।

> ঝিমোচ্ছিল লাল বেনারসি পরা ডলি। গাড়ির ঝাঁকুনিতে উঠে বসে বলল, "এ কোন ভাগাড়ে নিয়ে এলে?"

বিজনের ব্যবহারে নিশ্চয়ই ঠাকুমার প্রতি শ্রদ্ধা, আন্তরিকতা কিছুই প্রকাশ পায় না। তাই তো এখানকার বাসিন্দারা সন্দেহ করে বিজন সত্যিকারের নাতি নয়! অথচ বিজনের দিকে তাকালেই বামুনবুড়ি নিজের শিরায় রক্তের চঞ্চলতা টের পায়। এ বাড়ির একমাত্র আপনজন তার নাতি। ছেলেকে তো কবেই ভুলেছে। ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন কর্তা। বাপ-বেটা একে-অপরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাইত না। বহু বছর চলে গেল এভাবে। একমুখ দাড়ি-গোঁফ নিয়ে বিজন একদিন হাজির হল এ বাড়িতে। বামুনবুড়ির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল, "ঠাকুরমা, চিনতে পারছ?"

এক পলকেই চিনেছিল বামুনবুড়ি! বিজনের পাঁচ বছরের জন্মদিনে লুকিয়ে একবার দেখে এসেছিল। সেই একই মুখ, যুবক বয়সেও যা পাল্টায়নি। মনের মধ্যে সে কী তীব্র দাপাদাপি বামুনবুড়ির! দীর্ঘ আয়ুর অবসাদ কেটে যাচ্ছিল ক্রমশ। বিজনকে আদর করতে করতে মনে হচ্ছিল, এই তো আমি নতুন হয়ে বেঁচে আছি। বার-বার জন্ম হবে আমার। রক্ত প্রবাহিত হবে প্রজন্ম ধরে! সেই প্রথম পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম এবং শেষ। ঘর চেয়েছিল ব্যবসার জন্য, বামুনবুড়ি দিয়েছে। এখন বিজয়াতেও প্রণাম করে না। ডেকে কথা বলে না একটা। ওর মেয়ে-বউকে একবারই দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছে। আর কখনও আনেনি। ঝুরঝুরে বাড়ির আধো-অন্ধকার ঘরের বাসিন্দা কনকলতাকে ঠাকুরমা পরিচয় দিতে বোধহয় লজ্জা পায়। বন্ধ দরজার তালা ঝাপসা হয়ে এল। চোখ মোছে বামুনবুড়ি। সানাইয়ের শব্দটা এখনও ভেসে আসছে কানে। ফের আকাশের দিকে তাকায় কনকলতা। চিলের কান্নার মতো সুর ভেসে বেড়ায়। চিলটাকে দেখা যায় না।

সানাই বাজছে আকডাঙায়, বাপিদের বাড়িতে। ভাড়াবাড়ি। একতলায় থাকে বাপিরা। বাপির বিয়ে হয়েছে গতকাল। অ্যাম্বাসাডরে বউ নিয়ে ফিরছে। গাড়িতে সাজানো ফুলগুলোর মতোই নেতিয়ে পড়েছে ডলি। নিতকনে, নিতবর, দু'জনেই ঘুমে কাদা। হেলে আছে বাপির গায়ে। বাপির বেস্ট ফ্রেন্ড চম্পক বসেছে ড্রাইভারের পাশে। ওর কিন্তু এনার্জি আছে। সারারাত বাসর মাতিয়ে এখনও বসে আছে খাড়া। কানাইপুর লেভেল ক্রসিং পেরনোর সময় চম্পকই কথাটা তুলল, "হ্যাঁ রে, সানাই কি

তোদের বাড়িতে বাজছে?”

লজ্জা পায় বাপি। বলে, “কে জানে!” মিথ্যে বলল। বাপির নির্দেশেই মাইকে সানাই বাজানো হচ্ছে। সানাই বাজাতে বলার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে বাপির। ডলির বাবা বলে রেখেছিল, “আমাদের বাসি বিয়ের ঝামেলা নেই। সকাল হলেই কনে বিদায় দেব।” তখনই বাপির মাথায় আসে, সকাল মানে ক’টা? হয়তো পাড়ার লোকের তখন ঘুম ভাঙবে না। বাপি বউ তুলবে ঘরে। কিন্তু এই বউ তো পাঁচজনকে দেখিয়ে ঘরে তোলার মতো! ডলির মতো সুন্দরী আকড়াঙায় বউ হয়ে আসেনি আগে, আসবেও না, গ্যারান্টি দিয়ে বলা যায়। পাড়ার লোকের ঘুম ভাঙানোর জন্যই মাইকের ব্যবস্থা! সকালের দিকে সানাই ছাড়া ঠিক জমেও না। সারাদিনটা তো রইল সিনেমার গান বাজানোর জন্য।

লেভেল ক্রসিংয়ের পর রাস্তাটা একটু এবড়ো-খেবড়ো। পঞ্চায়েত এলাকা শুরু হয়ে গেল। গাড়ি লাফাচ্ছে। বাপির কাঁধে মাথা রেখে ঝিমোচ্ছিল লাল বেনারসি পরা ডলি। গাড়ির ঝাঁকুনিতে উঠে বসে বলল, “এ কোন ভাগাড়ে নিয়ে এলে গো?” নতুন বউয়ের মুখে একদম বেমানান ভাষা! সামনের সিট থেকে ঘাড় ফেরাল চম্পক। দৃষ্টি বাপির দিকে, চাউনিতে তিরস্কার। কাল বাসরেও

“যাই বল বস, বউ সুন্দর হলে কী হবে, বাপেরবাড়ির লোকেরা কিন্তু লো ক্লাসের।”

বাপির কানে কানে চম্পক বলেছে, “যাই বল বস, বউ দেখতে সুন্দর হলে কী হবে, বাপেরবাড়ির লোকেরা কিন্তু লো ক্লাসের।” বাপি সে কথা অস্বীকার করে না। কলোনির কালচার কত আর ভাল হবে? শালি সম্পর্কের বাচ্চা-বাচ্চা মেয়েগুলো বাসরে কী খারাপ-খারাপ ইয়ার্কিই না মারছিল! বাপিদের পাড়াটা যে খুব হাই-ফাই ক্লাসের, তা নয়। তবু ছেলেপুলেরা স্কুল-কলেজে যায়। ক্লাব, লাইব্রেরি আছে। মাঝে-মাঝে ফাংশন, আঁকা প্রতিযোগিতা হয়। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার না থাকুক, চার ঘর সরকারি চাকরিজীবী আছে। বাকি সব কল-কারখানায় কাজ করা লোক। রাজমিস্ত্রি, জোগাড়ে, অটো ড্রাইভার, রিকশাওলা, কানাইপুরে ঝি-গিরি করতে যাওয়া মেয়ে-বউ, সবই আছে। আবার শহুরে কালচারের ছোঁয়াটাও বেশ স্পষ্ট। বাপির স্থির বিশ্বাস, তাদের পাড়ার সংস্পর্শে এসে ডলির আচার-ব্যবহার অনেকটাই শুধরে যাবে।

গাড়ি এখনও লাফাচ্ছে। কিছু দূর লাফাবে। ক’দিন আগে রাস্তা খোঁড়া হয়েছে। সন্ত্রস্ত হয়ে বসে আছে বাপি, এই বুঝি আরও কিছু বলে ওঠে ডলি! এবার ডলি নয়, কেঁদে উঠল নিতকনে। ডলির পিসতুতো বোন। বছর পাঁচেক বয়স। ঘুম ভেঙে গিয়েছে ঝাঁকুনিতে। নিতবরেরও ঘুম ভেঙেছে। সে কিন্তু কাঁদছে না। বাপির দিদির ছেলে। ভাগ্নে খুবই শান্ত। গাড়িতে ওঠার সময় নতুন মামির পাশে বসতে গিয়েছিল, দু’টো বাচ্চাকেই বাপির পাশে পাঠিয়ে দিয়েছে ডলি। ভাগ্য ভাল বলতে হবে, বউকে রিকশায় নিয়ে আসেনি বাপি। গাড়ির ঝাঁকুনিতে যা করছে, রিকশা

রেশম শিল্পী

পশ্চিমবঙ্গ রেশম শিল্পী সমবায় মহাসংঘ লিমিটেড

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা) ১২/১ হেয়ার স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০০১ ফোন ঃ ২২৪৮ ২৮৩৩

শোরুম ঃ দক্ষিণাপণ, বালিগঞ্জ, উত্তরাপণ, হেয়ার স্ট্রীট, এসপ্লানেড, গড়িয়া, বারাসত ও দুর্গাপুর

হলে হয়তো নেমে হাঁটা দিত! আকডাঙার রেল স্টেশন হচ্ছে কানাইপুর। চার স্টেশন বাদ দিয়ে বীরনগর। প্ল্যাটফর্ম লাগোয়া রথতলা কলোনি। ডলির বাপেরবাড়ি। বাপির মা বুদ্ধি দিয়েছিল, "ভোর-ভোর বউকে ট্রেনে নিয়ে আয়। আমাদের স্টেশন থেকে রিকশায় চলে আসবি। খরচ বাঁচবে।"

রাগ দেখিয়ে বাপি বলেছিল, "তুমি না, হেভি কিপটে! পাড়ার লোকের সামনে রিকশা থেকে নামা ছেলে-বউকে বরণ করবে, প্রেস্টিজে লাগবে না?"

"না, লাগবে না। ধারের পয়সায় ফুটানি দেখানো আমার স্বভাব নয়। তোর শ্বশুর যদি গাড়ি ভাড়ার টাকাটা দিত, এত কথা বলতে হত না।"

উত্তরে আর কিছু বলেনি বাপি। যদিও টাকা মাকে ধার করতে হয়নি। বাপিই করেছে। একসঙ্গে অনেক টাকা, বিশ হাজার! প্রিন্টিং প্রেসে কাজ করে বাপি। সিল্ক স্ক্রিন প্রিন্টার। বাপি কোনওদিন কারও কাছে দু'টাকাও ধার করে না। এটা তাদের বাড়ির ধরন। আজ সে নিজেকে অসম্মান করেছে শুধু ডলির মুখ চেয়ে। গোটা বিয়ে বিশ হাজারে উতরানোর কথা নয়। অনুষ্ঠানের খরচটা উঠে যাবে। বাকি খাট-বিছানা, ড্রেসিং টেবিল, টিভি বাপি ধীরে-ধীরে কিনে রেখেছিল। বিয়ের ইচ্ছেতেই এ সব করা। মা-দিদি পাত্রী দেখছিল এদিক-ওদিক। নগদ চাওয়া হচ্ছিল ত্রিশ হাজার। দুটো পার্টি রাজি হয়ে গেল। মেয়ে দেখতে গিয়েছিল বাপি। দুটোই খেঁদি, পেঁচি, নুরজাহান! বুঝেছিল, রেট কমাতে হবে। মা-দিদির সঙ্গে আলোচনা চলছিল বাপির। সেই সময়ই চোখে পড়ে যায় ডলিকে। যা দেখতে, বাপিকেই না নগদ দিতে হয়! ফলে ও সব কথা আর তোলা যায়নি।

ভাঙা রাস্তা শেষ হল। গাড়ি ঢুকে পড়ল গলিতে। আধ পাক ঘুরলেই বাপিদের ভাড়া বাড়ি। দোতলাটায় বাড়িওয়ালা থাকে। একতলা পুরো বাপিদের। সকালের আলোয় ঝিকাচ্ছে বাড়িটা। বাড়িওলার সঙ্গে হাফ-হাফ শেয়ারে কলি ফেরানো হয়েছে। বাড়ির পাশে ফাঁকা জমিতে বাঁশের খাঁচা। ওখানেই খাওয়ানো হবে বউভাত। জানলা থেকে কেউ বোধহয় দেখে নিয়েছিল বরের গাড়ি। নিমেষে ভিড় লেগে গেল সদরে। বাপি দেখল, অনেকদিন পর মা একটা ধবধবে শাড়ি পরেছে। দিদি, বাড়িওয়ালি কাকিমার পরনেও নতুন শাড়ি। পাড়ার বেশ কিছু মেয়েও জড়ো হয়েছে। কেউ বাজাচ্ছে শাঁখ, অনেকে মিলে দিচ্ছে উলু। সানাই বেজে যাচ্ছে নিজের খেয়ালে। গাড়ি থেকে দোরগোড়া অবধি কাপড় পেতে দিল দিদি। বউ নামল, তারপর বাপি। পাশের বাড়ির নমিতা ডলির মাথায় ধান ভর্তি কুনকে রাখল। বাপিকে বলল, "জাঁতিটা আছে তো? বউ ধান ফেলতে-ফেলতে

যাবে। তুমি জাঁতিতে কুটবে।" বাধ্য ছাত্রের মতো ঘাড় হেলায় বাপি। কত রকম নিয়ম আছে বিয়েতে! এগিয়ে যাচ্ছে ডলি। বেশ লক্ষ্মীঠাকুর টাইপের দেখতে লাগছে। প্রতিবেশীদের মুখে চোখ বোলায় বাপি, ডলির রূপ দেখে সবাই হাঁ হয়ে গিয়েছে! বাপির দিকে কেউ ফিরেও দেখছে না।

দরজার কাছে পৌঁছতে বাপির মাসি বউয়ের কাঁকালে ঘড়া দিল। দিদি দিল জ্যান্ত ল্যাটা মাছ। ডলি খ্যারখেরে গলায় বলল, "না-না, আমি ধরব না। ভীষণ আঁশটে গন্ধ হয় হাতে।" ভিড় একটু থমকাল। নতুন বউয়ের লজ্জা কোথায়? এত রীতিমতো চোপা করছে! দিদি বোঝানোর ভার নিল, "ও রকম করে না বউ। একটুখানি নিয়মমতো ধরে রাখো। এ সব খুব শুভ জিনিস।" ডলি কোনও মতে মাছটা হাতে ধরল। ল্যাজ নাড়ছে মাছ, ছটফট করছে। কেউ একজন দুধ-আলতা মেশানো থালা রাখল ডলির পায়ের সামনে। এই সিনটা হিন্দি সিনেমায় খুব দেখায়। তাই বোধহয় ডলিকে কিছু বলতে হল না। দু'পা তুলে দিল থালার উপর। এর আগে অথবা পরে আর একটা সিন আছে, ঘটি ভর্তি ধান পা দিয়ে ঠেলে ফেলতে হবে। সিনটা হল না। বাপিদের বাড়ির স্ত্রী-আচারে সেটা মনে হচ্ছে নেই। ঘরে ঢুকে এল বাপিরা। মা বলল, "চল, রান্নাঘরে দুধটা একবার দেখে আসবি।" মানেটা বুঝল না বাপি। বউয়ের পিছু-পিছু রান্নাঘরে গেল। গ্যাসের উনুনে দুধ ফুটছে। মাসি দাঁড়িয়ে আছে উনুনের সামনে। বউ কাছে যেতে মাসি জিজ্ঞেস করল, "কী দেখছ উনুনে?"

ডলি উত্তর দেয় না।

মা পাশ থেকে বলে, "বলো, শ্বশুরমশাইয়ের উথলে পড়া সচ্ছল সংসার দেখছি।"

ডলি চুপ করে বলে, "বলেছি, মনে-মনে।" বাপির মাথায় ঘুরতে থাকে "উথলে পড়া সচ্ছল সংসার" কথাটা। বাবা চাকরি করতেন কামারহাটি জুট মিলে। ছ'মাস খোলা তো ছ'মাস বন্ধ। মিল বন্ধ থাকলে স্টেশন ধারে সাইকেল সারাইয়ের দোকানে কাজ করতেন বাবা। বাপি যখন ক্লাস টেনে উঠেছে, তখন মারা গেলেন। দিদির বিয়েটা দিতে পেরেছিলেন। বাপির পড়াশোনায় ইতি পড়ে গেল। খুব বেশি দূর যে হত, তা নয়। চালিয়ে গেলে মাধ্যমিকটা পাশ করত ধরে নেওয়া যায়। মাধ্যমিক না দিতে পারায় একটা খেদ রয়ে গিয়েছে বাপির। প্রাইভেটে একবার দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। বসাই হল না। ততদিনে পুরোপুরি রোজগারে লেগে গিয়েছে বাপি। বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের একটা ইলেকট্রনিক্সের দোকানে ডেলিভারি বয়ের কাজ করত। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর শরীরে আর কিছু থাকত না। রাতে পড়তে বসলেই ঘুম পেয়ে যেত। পরীক্ষাটা দেওয়া হল না। মা বলত, "দুঃখ করিস না। তোর বাবা তো একটাও পাশ দেয়নি। ওই বিদ্যেতেই টেনে দিল সংসার। তুইও পারবি।" মা হয়তো চাইত না, ছেলে বাবার চেয়ে বেশি শিক্ষিত হাক। দিদি কিন্তু দুটো ক্লাসে ডিগবাজি খেয়ে মাধ্যমিকটা উতরে গিয়েছিল। তার পরই ওর বিয়ে নিয়ে উঠে পড়ে লাগল বাবা-মা। পাশ করা মেয়ে, ভাল একটা ঘর পাবে নিশ্চয়ই। পাওয়া গেল। জামাইবাবুর সারা ভারত ঘুরে চাকরি। দেশের বিভিন্ন কারখানায় বয়লার রিপেয়ার করে। ইঞ্জিনিয়ার নয়, অ্যাসিস্ট্যান্ট। এক-এক শহরে দু'মাস-তিনমাস করে থাকতে হয়। সব জায়গায় দিদিকে নিয়ে ঘোরা সম্ভব নয়। ভাগ্নেটাও স্কুলে ভর্তি হয়েছে,

দিদিকে জামাইবাবু ছাড়াই থাকতে হত শ্বশুরবাড়িতে। এখানেই লাগল গন্ডগোলটা। শিবেনদা না থাকলে শ্বশুরবাড়ির লোকের অন্য মূর্তি। ঝিয়ের মতো দেখে দিদিকে! শিবেনদা ফিরলেই দিদিকে মাথায় তুলে নেয়! ব্যাপারটা দিদি শিবেনদাকে কোনও ভাবেই বোঝাতে পারেনি। এত ভাল অ্যাক্টর দিদির শ্বশুর, শাশুড়ি, দেওর। একটা ননদও আছে, বিবাহিত। সে-ও কিছু কম যায় না। বাপেরবাড়ি এলেই লেগে যায় দিদির পিছনে। শিবেনদা এ সব বিশ্বাস করে না। বলে, দিদি বাপেরবাড়ি থাকার জন্যই এ সব বানিয়ে বানিয়ে বলছে। অগত্যা দিদি এখন এ বাড়িতে থাকে। শিবেনদা এলে শ্বশুরবাড়িতে যায়। ভাগ্নে দু'বাড়ির মাঝামাঝি একটা স্কুলে পড়ে। শিবেনদা দিদির খরচ পাঠিয়ে দেয়। বাপিদের বাড়িতে সুখ, আনন্দের পরিবেশ কোনওদিনই তেমন ছিল না। দেওয়ালে লাগা ঝুলের মতো দুঃখ সবসময় সঙ্গী। বাপির খুশির স্মৃতি সব ঘরের বাইরে, মাঠে, ঘাটে, স্কুলে...বাপি বারে-বারেই চাইত বাইরের আলো, বাতাস বাড়িতেও ঢুকে পড়ুক কখনও-সখনও। এতদিনে ঢুকল! ঘর আলো করে থাকবে ডলির মতো বউ। কপালে কুলো দিয়ে আলতো ঠেলা দিল দিদি। দিদি বরণ করছে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে শাঁখ বাজাচ্ছে মাসি। বাপি দিদিকে জিজ্ঞেস করে,

বাপি শুনতে পেল ডলি বলছে, "আশীর্বাদের টাকা বাবা সব নিয়ে নিয়েছে।"

"হ্যাঁ রে, মা কোথায়? বরণ করল না!"

"মা করতে পারবে না। বিধবা যে!" নির্বিকারভাবে বলল দিদি। কষ্ট দলা পাকাল বাপির গলায়। মা ডলিকে বরণ করে ঘরে তুলছে, ছবিটা গেঁথে রেখেছিল মাথায়। মিলল না! বরণ শেষ। সবার উদ্দেশে বাপি বলে, "আমি এবার যেতে পারি?" নমিতা বলল, "পারো। তবে একা। বউকে ছাড়ছি না। পাঁচশো এক টাকা চাই।"

"ও মা, আমি এত টাকা কোথায় পাব!" ঘাবড়ে যাওয়া গলায় বলল ডলি।

বাপি বুঝল, ব্যাপারটা পুরোপুরি মেয়েমহলের। এখানে নাক না গলানোই মঙ্গল। বউয়ের হয়ে কিছু বলতে গেলে আওয়াজ খেতে হবে। আস্তে করে কেটে যাচ্ছিল, খপ করে হাতটা ধরে নিল ডলি। বলল, "কী হল, চলে যাচ্ছ যে বড়! ঝামেলাটা সামলাও।"

বাপি কিছু বলার আগে দিদি বলে, "ও কেন সামলাবে বউ, ব্যাপারটা তোমাকেই মেটাতে হবে। কনে বিদায়ের সময় আশীর্বাদী টাকা তো পেয়েছ। তার থেকে দিয়ে দাও আমাদের।"

বাপি শুনতে পেল ডলি বলছে, "আশীর্বাদের টাকা বাবা সব নিয়ে নিয়েছে। আমার কাছে এক পয়সাও নেই।"

দিদি বোঝদার মেয়ে। চট করে পরিস্থিতি ঘুরিয়ে দিল। মেয়েদের বলল, "তোরা এখন ছেড়ে দে। কাল সারা রাত জাগা বেচারির। মুখ-হাত ধুয়ে রেস্ট নিক, তারপর দেখছি।"

ক্রমশ

অলঙ্করণ: নির্মলেন্দু মণ্ডল

এই ঘরেই ফুলশয্যা হবে। আপাতত পরিপাটি করে

২ পর্ব

সাজিয়ে রেখেছে দিদি। বিছানায় নতুন চাদর। ড্রেসিং টেবিলের আয়নার মাথায় লেসের পর্দা। জানলায় নতুন পর্দা। ঘরের কোনে কোথাও এতটুকু ঝুল লেগে নেই। পুজো চলে গিয়েছে মাস খানেক হল, কিন্তু গরম কমেনি। ফ্যান চালিয়ে সিল্কের পাঞ্জাবিটা খলে ফ্যালে। সাপের খোলসের মতো লাগছে এটা। আলনায় রেখে, বিছানায় এসে গা ছেড়ে দেয়। ফ্যানটা নতুন। বেশ খশি খশি ভাব নিয়ে হাওয়া ছড়াচ্ছে। ঘরের সমস্ত আসবাব বলা যায় নতুন। দেড় বছর ধরে পয়সা জমিয়ে বাপি এক এক করে সব কিনেছে। ডলি মেয়েটা কেমন, ভালমতো জানা হয়নি। জানার সুযোগ এবং ইচ্ছে, কোনওটাই ছিল না। বিয়েটা হয়ে গেল খুব তাড়াতাড়ি। এর জন্য বাপি এবং ডলির বাড়ির লোক, দু'পক্ষই দায়ী। ডলিকে প্রথম দেখার দিন কুড়ির মাথায় বিয়ে। মা খুঁতখুঁত করছিল, হুজুগ তুলল দিদি। দু'পক্ষেরই যখন সায় আছে, মিছিমিছি শুভ কাজ ফেলে রাখা নাকি ঠিক হবে না। বাপির মাথায় অবশ্য ঘুরছিল আর একটা আশঙ্কার কথা, ডলির মতো রূপসি যদি ফস্‌কে যায়...তার চেয়ে বিয়েটা জলদি সেরে নেওয়াই ভাল। ফল কী হবে, এখনও বোঝা যাচ্ছে না। প্রতাপ অবশ্য জোর দিয়ে বলেছে, তার মাসতুতো বোন ডলি খুবই ভাল। কোনও বদ অভ্যেস, বায়নাক্কা কিচ্ছু নেই। গরিব ঘরে বড় হয়েছে, দিব্যি বাপিদের বাড়িতে মানিয়ে থাকতে পারবে। প্রতাপ আর বাপি একই কারখানায় কাজ করে। বছর খানেক হল প্রতাপ কোম্পানিতে ঢুকেছে। দেওয়ালিতে বাপিদের ছুটি থাকে। তার ক'দিন আগে বাপি কথায় কথায় প্রতাপকে জিজ্ঞেস করেছিল, "ছুটির দিন কী করবি?"

প্রতাপ বলেছিল, "মাসির বাড়ি যাব। বীরনগর।"

কথায় কথায় বাপি বলে, "চল, আমিও যাই। পাড়ায় থাকতে বেকার লাগে। ঘরে বসে ঢাকের আওয়াজ শোনো। পাড়ায় ছেলেগুলো মাল খাওয়া ছাড়া কিছু বোঝে না। ইচ্ছে না করলেও আমাকে খেতে হবে।" প্রস্তাব লুফে নিয়েছিল প্রতাপ, "চল আমার সঙ্গে। ভালই হবে। আমিও একা একা বোর হব মাসির বাড়ি।"

দুই বন্ধু গিয়েছিল বীরনগরে। মাসির বাড়ি ঢোকার আগে চোখে পড়ে ডলিকে। সিমেন্টের উঁচু চাতাল মতো জায়গায় চার, পাঁচটা মেয়ে একসঙ্গে আড্ডা মারছিল। বটতলার সেলুনের আয়নায় যেন আলো পড়েছে, এমনটাই চকচক করছিল ডলি। পা থেমে যায় বাপির। চোখ সরাতে পারছিল না। চোখে চোখ মেলায় ডলি। অবিকল হিন্দি সিনেমার ঢঙে! ডলিকে ঘিরে থাকা বান্ধবীরা হেসে নয়ে পড়ছে। বাপি যেন বঁড়শিতে গেঁথা অবশ মাছ! কনুই ধরে টেনেছিল প্রতাপ। নিজেকে সামলে প্রতাপের পাশে হাঁটতে হাঁটতে বাপি অবধারিতভাবে সেই প্রশ্নটাই করেছিল, যেটা কোনও ইয়ং ছেলে মাত্রই করবে, "মেয়েটা কে রে?"

প্রতাপ বলেছিল, "জানি, তুই ডলির কথাই বলছিস। মাসির মেয়ে।"

খুবই অপ্রস্তুত হয়ে বাপি বলেছিল, "সরি, কিছু মনে করিস না। আমি তো..."

পরোটা বলতে না দিয়ে প্রতাপ বলে, "অত লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। যে কোনও ছেলেই ডলিকে দেখলে হড়কায়। মাসি ওর বিয়ের চেষ্টা করছে, বেশিদিন বাড়িতে বসিয়ে রাখা যাবে না। তুই কি ওকে বিয়ে করবি?"

খুব অবাক হয়েছিল বাপি। বিস্মিত কণ্ঠে জানতে চেয়েছিল, "আমার মতো ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবে?"

"না দেওয়ার কী আছে! কোনও বদ নেশা নেই, রোগ নেই কোনও। চেহারাও ভাল। হাতের কাজ জানা ছেলে। মাসে হাজার চারেক রোজগার। আর কী চাই? আমার মেসো রাজমিস্ত্রির কাজ করে। বেশিরভাগ দিন কাজ থাকে না। স্টেশন ধারে দরমার হোটেলে রান্না করে মাসি। পাত্র হিসেবে তুই ওদের কাছে রাজপুত্র। কথা বলি?"

উত্তেজনা গোপন করে বাপি ক্যাজুয়ালি বলেছিল, "বলে দ্যাখ!"

টালির চালের মাসির বাড়ি ঢুকে প্রথম দশ মিনিট তেমন পাত্তা পায়নি প্রতাপ, বাপি। কোনও একফাঁকে প্রতাপ প্রস্তাবটা মাসি, মেসোকে শুনিয়ে দেয়। তারপরই শুরু হয়ে যায় খাতিরযত্ন। প্রতাপের মেসো সেঁটে বসে রইল। মাসি দিয়ে যেতে লাগল খাবার সাপ্লাই। তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছিল প্রতাপ। বাপি কিছুটা জড়সড়। মা, দিদিকে কিছু বলা নেই, কথা প্রায় পাকা হতে চলল। ডলি এঁদের একমাত্র সন্তান। বাড়িতে দেখানোর মতো ওই একটাই শো পিস। বাকি সবই কেমন ফাঁকা ফাঁকা, শ্রীহীন। ছোট উঠোন আছে, একটাও গাছ নেই। শ্যাওলা জমা কুয়ো পাড়, বাথরুম, পায়খানার দরজা কালশিটে পড়া তোবড়ানো টিনের। পাশেই একটা সন্ধ্যামালতী গাছ। অযত্নে বেড়ে ওঠা। বিয়ে করে ফেরার সময় গাছটার কথা মনে পড়েছিল বাপির, ওদিকে চোখ যেতে দেখে, গাছটা নেই। অনুষ্ঠান উপলক্ষে পরিষ্কার করার নামে কেউ হয়তো তুলে ফেলে দিয়েছে। বাপিও উপড়ে নিয়ে এল ডলিকে। ওদের বাড়িটা নিশ্চয়ই আরও বিশ্রী হয়ে গিয়েছে! প্রথম দেখাতেই বিয়ের কথা উঠবে ডলি বোধহয় ভাবতেও পারেনি। তাই সেদিন লজ্জায় সামনে আসতে পারছিল না। দরজা জানলার আড়াল থেকে অল্প দেখা দিয়েই সরে যাচ্ছিল। ঠোঁটে, চোখে ছিল সেই অদ্ভুত সুন্দর হাসি। ভেসে গিয়েছিল বাপি। ওই একদিনই! হাসিটা আর দেখা গেল না ডলির মুখে! বিয়ের কথা যত এগোতে লাগল, তত গম্ভীর হয়ে গেল সে। সেটাই স্বাভাবিক, নতুন জীবনে প্রবেশ করছে বলে কথা! টেনশন তো একটু থাকবেই।

ডলিকে দেখে বাপির অবস্থা যে বেসামাল, বুঝতে অসুবিধে হয়নি ডলির বাবার। পরের দিনই বাপির মা দিদিকে আসতে বলেছিল। একই সঙ্গে জানিয়ে রাখে, "আমরা কিন্তু দিতে থুতে কিছু পারব না। অবশ্য দেওয়া থোওয়ার জন্য আমার মেয়ের বিয়ে আটকাবে না জানি। ওকে দেখে একবস্ত্রে অনেকেই বউ করে নিয়ে যেতে চেয়েছে। পাত্র, পাত্রের বাড়ি আমাদের পছন্দ হয়নি। তোমাকে দেখেই মনে হচ্ছে বড় ঘরের ছেলে। বাবা মারা যাওয়ার পর একা সংসারের হাল ধরে আছ। আমরা এই ধরনের সৎ, দায়িত্ববান ছেলে খুঁজছিলাম।"

প্রতাপের মাসির বাড়ি থেকে ফিরে বাপি প্রথমে দিদিকে গিয়ে ধরে। বাপির দিদির নাম স্বপ্না। না দেখা জগৎটাকে স্বপ্নের চোখে দেখতেই ভালবাসে। সব শুনে বলেছিল, "মেয়েটাকে খব সুন্দর দেখতে, না রে? ভাগ্যিস তোর চোখে পড়ল! নয়তো কোনও বাজে লোকের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যেত! চিন্তা করিস না। মাকে রাজি করানোর দায়িত্ব আমার।" রাজি করিয়েও ফেলল দিদি। তবে দেখতে যাওয়ার সময় থেকে বাড়ি ফেরা পর্যন্ত বড্ড চুপচাপ ছিল মা। রাতে খেতে দেওয়ার সময় বলেছিল, "পারলে শ্বশুরবাড়ি এড়িয়ে চলিস। লোক সুবিধের মনে হল না।"

> নাকে জুঁইফুলের গন্ধ এল। সাবানের গন্ধ। এতক্ষণ চোখ বন্ধ করে রেখেছিল বাপি। এবার খোলে সে। ডলি এসেছে ঘরে।

নাকে জুইফুলের গন্ধ এল। সাবানের গন্ধ। এতক্ষণ চোখ বন্ধ করে রেখেছিল বাপি। এবার খোলে। ডলি এসেছে ঘরে। পরনে ছাপা শাড়ি। চলে গিয়েছে ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে। ঝুঁকে পড়ে নিজের মুখ দেখছে। একটু উঠে বসে বাপি। জানতে চায়, "কেমন লাগছে এখন শরীরটা?"

"ভাল," ঘরে দাঁড়াল ডলি। বাথরুমে ধুয়ে আসা ভেজা ভেজা মুখটা টাটকা ফুলের মতো লাগছে। খাটে এসে বসল ডলি। পা গুটিয়ে নেয় বাপি। বিছানার গদি টিপতে টিপতে ডলি জিজ্ঞেস করে, "নতুন?"

বাপি ঘাড় হেলায়। প্রশ্নটা আসলে বাপির করার কথা, যদি ডলির বাবা শয্যা দিত। যেমন মেয়ের বাপেরা দেয়। ডলি ফের বলে, "বেশ শক্ত। পুরনো গদি ধুনে নিয়েছ নাকি?" কথাটা প্রেস্টিজে লাগল। উত্তর দিল না বাপি। প্রসঙ্গ থেকে সরে গিয়ে ডলি বলে, "যাই বলো বাপু, তোমার বোনেরা কিন্তু হেভি ঝামেলাবাজ। এমন যদি জানতাম, শান্তাকে নিয়ে আসতাম। একদম টাইট দিয়ে দিত।" বাপির চোখে ভেসে উঠল বাসরের সেই ধানিলঙ্কার চেহারাটা। যন্তর মেয়ে! বয়সে ডলির চেয়ে অনেকটাই ছোট। কিন্তু কথার তুবড়িতে ঘায়েল করে রেখেছিল বাপির বন্ধুদের। মনে পড়ে গেল বুলবুলিকেও। ঠাট্টা ইয়ার্কি সে ও করছিল, তবে শান্তার মতো উগ্র নয়। বাপির বন্ধুদের বুলবুলিকেই পছন্দ হয়েছে ও বাড়ির মেয়েদের মধ্যে। মুশকিল হয়েছে একটাই, বুলবুলির পছন্দ হয়েছে বাপির সব বন্ধুকে! কিছুক্ষণ অন্তর এক একটা ছেলে বেছে নিয়ে ঝারি মেরে গিয়েছে সে...ঠিক এই কারণে অবশ্য বুলবুলিকে এখন মনে পড়েনি বাপির। খেয়াল হল আর একটা ব্যাপারে। আজ সকালে বউ নিয়ে বেরনোর আগে বুলবুলি হঠাৎ বাপিকে আড়ালে ডাক ল। বলল, "ডলিটা বড্ড কাঁদছে। আপনি হাঁদার মতো দাঁড়িয়ে আছেন, বউকে সামলাতে হবে তো, নাকি?" বলে, বাপির হাত নিজের হাতে নিয়ে একটা চৌকো বাক্স দিয়েছিল বুলবুলি। বাক্সটা রঙিন কাগজে মোড়া। বলেছিল, "আপনাদের বাড়িতে গিয়ে যদি মনখারাপ করে থাকে ডলি, এই গিফটটা দেবেন। দেখবেন, সব কান্নাকাটি ভ্যানিস!" গিফটটা পাঞ্জাবির পকেটে পুরে মিষ্টি করে হেসেছিল বাপি। নিশ্চয়ই ডলির পছন্দের কিছু খব ইচ্ছে হচ্ছিল খুলে দেখতে। এত সুন্দর প্যাক করা, খুললে নষ্ট হবে। কৌতূহল

চেপে রেখেছিল বাপি। সকাল থেকে নানা ঘটনার মধ্যে একসময় ভলেও গিয়েছে গিফটটার কথা। আছে তো পাঞ্জাবির পকেটে? পড়েও যেতে পারে বেখেয়ালে।

বিছানা থেকে উঠে পড়ল বাপি। ডলি জানতে চাইল, "কোথায় চললে?"

"তোমাকে একটা জিনিস দেব।"

"কী জিনিস?" বাচ্চা মেয়ের মতো উচ্ছ্বাস ডলির গলায়।

বাপি এগিয়ে গেল আলনার কাছে। পাঞ্জাবি নামিয়ে পকেটে হাত ঢোকাল। প্যাকেটটা নিয়ে এসে ডলির হাতে দিয়ে বলল, "দ্যাখো তো কী আছে? আমিও ঠিক জানি না।" রঙিন কাগজ মোড়া গিফটটা হাতে ধরে ডলি না বোঝা দৃষ্টিতে বাপির দিকে তাকাল। বাপি মুচকি মুচকি হাসে। মোড়ক খুলতে থাকল ডলি। যে জিনিসটা বেরিয়ে এল, দেখে, দু'জনেই হতবাক! কন্ডোমের গোটা চারেক প্যাকেট। বিদেশি। খুল্লম খুল্লা ছবি দেওয়া। ডলি বিস্মিত দৃষ্টি সহ বাপিকে কিছু বলতে যাবে, এমন সময় শোনা গেল স্বপ্নার গলা, "কী রে, তোরা দু'জন এক ঘরে? আজ না কালরাত্রি? মুখ দেখতে নেই বউয়ের!"

বাপি ততক্ষণে প্যাকেটগুলো নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছে।

দিদি ঘরে ঢুকে বলল, "ভাই, তুই অন্য ঘরে যা। বউ এখানে থাকুক।"

বাপি মানে মানে কেটে পড়ল। ওর মুঠিতে নিজের লোভ, নাকি শ্বশুরবাড়ির লজ্জা ধরা আছে, বুঝে উঠতে পারছে না!

"আসব?"

প্রশ্ন শুনে কম্পিউটার থেকে ঘাড় ফেরাল বিজন। ঠাকুরদালানে দাঁড়িয়ে আছে প্রোমোটার। ঠোঁটে আর্টিফিশিয়াল হাসি। লোকটা এই প্রথম

> "তোমাকে একটা জিনিস দেব।"
> "কী জিনিস?" বাচ্চা মেয়ের মতো উচ্ছ্বাস ডলির গলায়।

বিজনের কাছে এল। দুর্গাবাড়ির সব ক'টা ফ্যামিলিতে ঘোরা হয়ে গিয়েছে। বিজন একটু দুশ্চিন্তায় ছিল, কেন আসছে না তার কাছে? টাকা বা স্পেস, কোনওটাই কি দেওয়ার ইচ্ছে নেই? উসুল করার মতো দম বিজনের নেই, সেটা কি জানে? বাড়াবাড়ি আতিথ্য দেখিয়ে বিজন ঠাকুরঘর, অধনা অফিসঘরে বসাল প্রোমোটারকে। সহকারী রায়দাকে বলল, "যান, দু'টো স্পেশাল চা নিয়ে আসুন।" প্রোমোটারের আগমনে রায়দাও যথেষ্ট উত্তেজিত। গ্লাস হাতে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

প্রোমোটার পারিজাতের বয়েস চল্লিশের একটু কম বেশি। বিজনের চেয়ে ছোটই হবে। চেহারায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে সদ্য বেরনো কয়েনের চাকচিক্য! ঘাড় ঘুরিয়ে ঠাকুরঘরটা দেখছে। দাম ঠিক করছে কি? বিজনের ঠোঁটে দুধের সর লেগে থাকার মতো হাসি। একসময় নিরীক্ষণ শেষ হল পারিজাতের। বিজনের দিকে স্থির চোখে সেকেন্ড পাঁচেক তাকিয়ে থেকে বলল, "আপনাকে নিয়ে তো কোনও সমস্যা নেই, শিক্ষিত মানুষ। আপনার কাছে আসতাম সবার শেষে। ছ্যাঁচড়া পার্টিগুলোকে সামলে। কিন্তু আসতেই হল। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, কনকলতা ভট্টাচার্য অর্থাৎ আপনার ঠাকুরমা এই বাড়ির একজন শরিক। বাকি তিন শরিককে আমি রাজি করিয়ে ফেলেছি বাড়ি বিক্রির ব্যাপারে। উনিই শুধু নিমরাজি। ফাইনাল কথার দিন বললেন, 'আমি কিছু জানি না। সিদ্ধান্ত যা নেওয়ার, আমার নাতি নেবে।' জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কোন নাতি?' বললেন, 'আমার একটাই নাতি!' তারপর আপনার নাম করলেন।"

হতভম্ব ভাবটা আরও ঘনিয়ে এল বিজনের মুখে। কোনও লাভ হবে না জেনেও একবার রায়দার দিকে তাকাল। সদাহাস্য মুখ রায়দা থমথমে হয়ে গিয়েছে। বিজন ভেবে পাচ্ছে না, ঠাকুরমার কৌশলটা ঠিক কী? কেন তাকে এত বড় ডিসিশন নেওয়ার অধিকারী বানিয়ে দিচ্ছে? ঠাকুরমার সঙ্গে তার সম্পর্কটা মোটেই তেমন স্নেহসিক্ত নয়। কোনওদিন ছিলও না। মহিলা প্রখর বুদ্ধিমতী। বিজন যখন ঘর চায়, বুড়ি ভালমতোই বুঝেছিল, স্বার্থের কারণে সম্পর্কটা জীবন্ত করছে বিজন। বুড়ির নিজেরও দরকার ছিল, কোনও নিকটাত্মীয়কে কাছে রাখার। বয়েস হচ্ছে, প্রভাব প্রতিপত্তি হারিয়ে ফেলছে এ বাড়ির উপর থেকে। এমন দিনও আসতে পারে, দখলকারীরা উচ্ছেদ করে দিল বুড়িকে। নাতি পাশে থাকলে সেটা সহজে সম্ভব নয়।

"কী ভাবছেন?"

পারিজাতের প্রশ্নে সম্বিত ফিরল বিজনের। যা ভাবছে, তা বলা যাবে না। যে কোনও কারণেই হোক, বল এখন তার কোর্টে। প্রোমোটারকে লেজে খেলানো যেতেই পারে। চিন্তার ভান করে বিজন বলল, "ঠাকুরমা এখনও এই ব্যাপারে আমার সঙ্গে কোনও আলোচনা করেনি। কথা বলে দেখি। আপনি আর একটা দিন সময় বের করুন। ঠাকুরমার সঙ্গে একটু আলোচনা করে নিই। পরে আপনাকে ফোনে জানিয়ে দেব।"

প্রোমোটারের এখনই ওঠার ইচ্ছে ছিল না। মোটামুটি পাকা কথা আদায় করে উঠতে চাইছিল।

বিজনের আচরণে খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে বলল, "বামুনবড়িকে রাজি করানোর জন্য আমি আপনাকে আলাদা টাকা দেব। আপনার স্পেসের দামের সঙ্গে সেটা জুড়বেন না। চলি তা হলে? খবরটা তাড়াতাড়ি পেলে ভাল হয়। এই প্রজেক্টের উপর আমার ভাগ্য অনেকটাই নির্ভর করছে। প্লিজ, একটু দেখবেন।"

বিজন কোনও উত্তর দিল না। ঘরে দেখলও না পারিজাতের দিকে। টের পেল, চৌকাঠ ডিঙিয়ে গিয়ে জুতো পরছে পারিজাত। ধীর চলনে নেমে গেল ঠাকুরদালান ছেড়ে। এতক্ষণে তার মোজার দুর্গন্ধ ভাসতে শুরু করল ঘরে। গা গুলিয়ে উঠল বিজনের।

পারিজাত যতক্ষণ বিজনের কারখানায় ছিল, নিজের চৌকাঠে দাঁড়িয়েছিল বামুনবড়ি। মাঝে উঠোন। ঠাকুরঘরের কথা শোনা যাচ্ছিল না কিছুই। তবু বিজন পারিজাতের হাত পা নাড়া দেখে বোঝার চেষ্টা করছিল ঘরের আবহাওয়া। কথা চলল কিছুক্ষণ ধরে। অর্থাৎ বামুনবড়ির কথা উড়িয়ে দেয়নি বিজন। অস্বীকার করেনি সম্পর্ক এখন দেখতে হবে সিদ্ধান্ত কী হল? কিন্তু বিজনকে একমনে কাজ করতে দেখে সন্দেহ হল বড়ির। পারিজাত কি আসল কথাটা বললই না? ও কথা শোনার পর বিজনের তো শান্ত হয়ে বসে থাকার কথা নয়! হাজারটা প্রশ্ন নিয়ে উঠে আসা উচিত বামুনবড়ির কাছে! উত্তরগুলো একরকম সাজিয়েই রেখেছে কনকলতা। বিজনের সব কিছু জেনে রাখা দরকার। একমাত্র নাতি জিজ্ঞেস করতেই পারে, পেটের সন্তানকে ত্যাজ্যপুত্র করেছ, অথচ প্রোমোটারের কাছে এত নাতি নাতি করছ কেন? উত্তরে কনকলতা বলবে, ত্যাজ্যপুত্র আমি করিনি। করেছিল ওর বাবা। হ্যাঁ, আমি তাঁর বিপক্ষে যেতে পারিনি। তবে বন্ধ ঘরে অনেক করে বুঝিয়েছিলাম। শুনলেন না। বললেন, 'শাস্ত্র অমান্য করে একবার তুমি আমার মাথা হেঁট করেছ। ভিটে থেকে উৎখাত হয়েছি। দ্বিতীয়বার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হোক চাই না।'' উনি যতই সম্মান হারানোর ভয় পান, সেটা আসলে কিন্তু আমরা হারিয়ে এসেছিলাম বধমানেই। এখানকার জমিদার সেই সম্ভ্রম আমাদের দেখায়নি। এখানে থাকতে দিয়ে 'দয়া' করেছিলেন। যে নির্যাতন বধমানরাজ করেছিলেন, মানুষটার শরীর মন, দু'টোই গিয়েছিল ভেঙে। পুজা পাঠে আগের মতো তেজ ধরা দিত না। আমি পাশে থেকে পুজা উপাচার জোগান দিয়ে যথাসাধ্য চাঙ্গা রাখার চেষ্টা করতাম। এ সবের মধ্যে ছেলে কখন যেন বড় হয়ে লায়েক বনে গেল! বামুনের ছেলে হয়ে হাতে ধরল ছেনি হাতুড়ি। মিস্তিরি হয়ে গেল। দুম করে বিয়ে করে ফেলল বেজাতের মেয়েকে। ছেলে অবশ্য জানত, বাবা মেনে নেবে না। পৃথক ব্যবস্থা করে রেখেছিল আগেই। বউ দেখাতে পর্যন্ত নিয়ে আসেনি এ বাড়িতে। আমি তোর ঠাকুরদাকে বহুবার বলেছি, ছেলে বউকে ঘরে তোলো। আত্মহত্যা করবে বলে ভয় দেখিয়েছে আমায়। লুকিয়ে দেখে এলাম তোর মাকে। স্নেহহীনা, দুঃখী মেয়ে। পা না ছুঁয়ে একটু দূরে মাটিতে প্রণাম করল। ভয় পাচ্ছিল, ওর হাতে

দিদি ঘরে ঢুকে বলল, "ভাই, তুই অন্য ঘরে যা। বউ থাকুক।" বাপি মানে-মানে কেটে পড়ল।

জল খাব কি না। চেয়ে খেলাম। মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললাম, 'ইচ্ছে থাকলেও তোমায় ঘরে নিতে পারছি না। তোমার শ্বশুরের মুখ চেয়ে এটা করতে হচ্ছে। এটা আমার প্রায়শ্চিত্ত বলতে পারো। নিজের ছেলেকেও বুকছাড়া করতে হচ্ছে। আমার ছেলেটাকে একটু দেখো।'' তোর মা কী বুঝেছিল, জানি না। সে আমার ছেলেকে দেখেছে, অশেষ মমতা দিয়ে পালন করেছে সংসারধর্ম। তোর জন্মের সময় আর পাঁচ বছরের জন্মদিনে দেখা করতে গিয়েছি, অবাক হয়ে দেখেছি, তোর মায়ের সংসার সুখী মুখ। তোর বোন যখন হল, তখনও একই রকম। আমি সব খবরই রাখতাম। আহামরি আয় ছিল না তোর বাবার। সংসার চলত টেনেটুনে। কোনও অবস্থাতেই তোর মা বাবা আমাদের মুখাপেক্ষী হয়নি। দেখা করতে আসেনি একদিনের তরেও। অভিমান করেছিল খুব। ওঁর মৃত্যুর পর তোর বাবা কতব্যমতো মুখাগ্নি করতে এসেছিল। একফোঁটা কাঁদেনি। আমি কাঁদছিলাম, স্বামী ছেলে দু'জনের জন্যই। উনি চলে যাওয়ার পরও ছেলের রাগ কমল না। দেখা করত না আমার সঙ্গে। তোর মা ও পুষে রেখেছিল অভিমান। অনাত্মীয়দের মাঝে অপরিচিতের মতো একা রয়ে গেলাম দুর্গাবাড়ি আগলে। বহুদিন পর এলি তুই। 'ঠাকুরমা' বলে ডাকলি। বক ভরে গেল আমার! জানি, স্বার্থের কারণেই এসেছিলি। কিন্তু স্বার্থও তো একটা বন্ধন। জীবনে যদি কোনও বন্ধনই না থাকল, বেঁচে থেকে কী লাভ! এখন মরে যাওয়ার কথা ভাবলে কষ্ট হয়। এই বাড়িটা ছেড়ে, তোকে চোখের বাইরে রেখে চলে যেতে হবে। এই মায়ার বাধনে এক রকমের অহঙ্কার আছে। তুই না থাকলে মৃত্যুর পর এ বাড়িতে আমি বেওয়ারিশ হয়ে যেতাম...কথাগুলো চোখের জল হয়ে বেরিয়ে আসছে! খাটে ঠেস দিয়ে মেঝেতে বসে আছে বামুনবড়ি। এ সব জরুরি প্রসঙ্গ কোনওদিনই হয়তো তোলা যাবে না নাতির কাছে। বিজন যে দু'দণ্ড দাঁড়ায় না বামুনবড়ির সামনে!

পারিজাত ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর নিজের কাজে মন দিয়েছে বিজন। কনকলতা ভট্টাচার্যর চাপিয়ে দেওয়া অধিকারে প্রাথমিকভাবে একটু টালমাটাল হয়ে পড়েছিল। দ্রুত সামলে নিয়েছে। অধিকার চাপিয়ে দিলেই যে নিতে হবে, এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। সে মিছিমিছি ঝুট ঝামেলায় জড়াবেই বা কেন! কাজের এই জায়গাটুকুর সঠিক মূল্য পেলেই ওর চলবে। সবচেয়ে ভাল হয়, মাপে কম হলেও স্পেসটা যেন এখানেই থাকে। মোজাইক করা মেঝে, নতুন দেওয়াল, খানিকটা যেন আলো এসে পড়বে তার ধূসর জীবনে। একটা ব্যাপার এখনও পরিষ্কার হচ্ছে না। কনকলতা কেন বাড়ি বিক্রির ব্যাপারে তাকে টানছে? কোনও রাজনীতি আছে কি? আশির উপর বয়েস হয়ে গেল বড়ির, মাথা এখনও শার্প! কিছু একটা প্ল্যান নিশ্চয়ই ভেজেছে। যে প্ল্যানই করে থাকুক, বিজন তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না। ঠাকুরমার যদি কিছু বলার থাকে, এখানে এসে বলে যাবে। এ রকমটা ঠিক করে কাজে মন বসাতে গিয়েও পারল না। পারিজাত পুরো ঘেঁটে দিয়ে গেল সকালটা! কম্পিউটার শাট ডাউন করে চেয়ার থেকে উঠে এল বিজন। পা থেমে যায়। দরজার দু'পাশে হাত দিয়ে চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে বামুনবড়ি। স্থির চোখে তাকিয়ে আছে বিজনের দিকে। ঠাকুরমার উপস্থিতিকে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে বিজন জানতে চাইল, "কী হল, কিছু বলবে?"

চৌকাঠ ডিঙিয়ে ভিতরে এল বামুনবড়ি, "প্রোমোটার কী বলল?"

"তুমি যা বলতে পাঠিয়েছিলে, তাই বলে গেল," প্রিন্টিং টেবিলের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল বিজন।

"তুই কী বললি?"

টেবিলের কাজগুলো গুছিয়ে নিতে নিতে বিজন বলল, "তোমার সম্পত্তি নিয়ে আমি কেন ডিসিশন নেব?"

"তা হলে কে নেবে?"

"তুমিও নিতে পার। তোমার ব্রেন এখনও বেশ ভালই কাজ করে।"

"তা করে। তবে আমি আর কতদিন? বাকি আয়ুটুকু ভাঙাচোরা বাড়িতে কাটাতে আমার অসুবিধে হবে না। ভবিষ্যতের কথা তোকেই চিন্তা করতে হবে। আমি সিদ্ধান্ত নিলে, নিজের স্বার্থমতো নিয়ে ফেলব।"

কী শার্প যুক্তি! বিজন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল কনকলতা ভট্টাচার্যর দিকে। বড়িকে দেখলে বিশ্বাসই হয় না, ইনি বিজনের বাবার মা! বাবা অনেক সাধারণ বুদ্ধির মানুষ। এত গুছিয়ে কথা বলতে পারে না। বাবা কি ঠাকুরদার ধরন পেয়েছে? ঠাকুরদাকে দেখার সুযোগ ঘটেনি। কেমন ব্যক্তিত্ব ছিল কে জানে!

"এভাবে চুপ করে বসে থাকলে তো চলবে না। বাড়ির অন্য লোকেরা আমায় ছিঁড়ে খাচ্ছে। যা ব্যবস্থা করার, এ মাসের মধ্যেই করতে হবে।"

বিজন এবার একটা ছোট্ট চাল খেলে বলল, "নাতির চেয়ে নিজের ছেলে বেশি আপন, তাকে ডেকে পাঠাচ্ছ না কেন?"

"আমি জানি, সে আসবে না।"

"সেটা যখন জান, এটাও বোঝা উচিত, আমি তোমার সম্পত্তি নিয়ে মাথা ঘামাব না।"

উত্তরটা ভাবতে একটু সময় নিল বামনবুড়ি। তারপর ধীরে সুস্থে বলল, "মাথা তো ঘামাতেই হবে। বাড়ির একটা অংশ তুমি ভোগ করছ। এই অংশটা তো আমারই!"

এবার আর মেজাজ ধরে রাখতে পারল না বিজন। উঁচু পর্দায় বলে উঠল, "তার মানে? আমি তোমায় ভাড়া দিতে যাইনি? তুমিই তো নিলে না। বললে, 'এখানকার বহু ঘরের লোকই নিয়মিত ভাড়া দেয় না। তুই নাতি হয়ে কেন দিতে যাবি? তোরটা ফ্রি।' বলো, তুমি এ কথা বলোনি?"

"হ্যাঁ, বলেছি। পরে এ ও জানতে পেরেছিস, এখানকার চার পাঁচ ঘর নিয়মিত সরকারের ঘরে ভাড়ার টাকা জমা দেয়। তুই দিসনি কেন?"

কোনও উত্তর খুঁজে না পেয়ে বিজন বলল, "ঠিক আছে। এবার থেকে রেন্ট কন্ট্রোলে টাকা জমা দেব। ভালই হবে, এই অংশটায় আইনত অধিকার থাকবে আমার।"

"অধিকার তো আমি নিজে যেচে দিতে চাইছি। সেটা নিচ্ছিস না কেন? তোর অংশের চেয়েও বেশি অধিকার!"

কথা ঘরে ফিরে একই জায়গায় এসে দাঁড়াল। তাই দু'পক্ষই চুপ। রায়দা দাঁড়িয়ে আছে স্ট্যাচুর মতো। স্ক্রিনে রং টানতে শুরু করেছে বিজন। বুড়ি পায়ে পায়ে এগিয়ে এল বিজনের কাছে। একদম পাশে এসে দাঁড়াল। একটু আগের রুদ্রমূর্তি একেবারেই বদলে গিয়েছে। প্রায় ভিখারিনির আর্তি নিয়ে বলল, "আমার কাছ থেকে এত ছাড়া হয়ে থাকিস বলেই তো এ বাড়ির কেউ বিশ্বাস করতে চায় না, তুই আমার সত্যিকারের নাতি!"

বিজন ঠাকুরমার দিকে সরাসরি তাকাল। ভীষণ হতাশাগ্রস্ত লাগছে মুখটা। অভিনয় নয় বলেই মনে হচ্ছে।

ঠাকুরমা ফের বলল, "ক'টা দিন আর বাচব? যাওয়ার সময় নিজের সম্পত্তি আপনজন কাউকে দিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। এটুকুও কি চাইতে পারি না?"

এ সব সেন্টিমেন্টাল ডায়লগে বিজন সাধারণত ভিজেই যায়। কেন জানি না, এখন ভিজল না। অচেনা এক প্রতিশোধস্পৃহা ঘলিয়ে উঠল মনে। বিজন বলল, "নিচু জাতের মেয়েকে বিয়ে করার জন্য বাবাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলে। তোমার নাতি তো ভেজাল! শরীরে সেই মায়েরও রক্ত বইছে। তাকে আপন করতে চাও কেন? প্রায়শ্চিত্ত? সে সুযোগ আমি তোমায় দেব কেন?"

আর কোনও কথা বলল না কনকলতা। ঘরে গিয়ে হাঁটতে থাকল। চৌকাঠ ডিঙিয়ে পা রাখল ঠাকুরদালানে। একটু দূরে ধবধবে রোদ। শীর্ণ, সাদা পা দু'খানা সেই রোদে মিশে গেল!

বিয়েটা বোধহয় সুখের হল না বাপির। সপ্তাহ দু'য়েক যেতে না যেতে সেটা বেশ টের পাচ্ছে। ডলি কিছুতেই মিশ খাচ্ছে না বাড়ির লোকের সঙ্গে। নাকি মা দিদিই মেশাচ্ছে না ডলিকে, ব্যাপারটা কেমন যেন গোলমাল পাকিয়ে যাচ্ছে

বাপির কাছে। ইতিমধ্যেই মা দিদিকে ভিলেন বানিয়ে দিয়েছে ডলি। বাপি ডিউটিতে বেরনোর সঙ্গে সঙ্গে মা দিদি নাকি ডলির পিছনে পড়ে যায়! কথায় কথায় খোঁটা দেয়, বাপেরবাড়ি থেকে সোনা নগদ কিছুই দেয়নি, রান্নাবান্না, ঘরের কাজ কোনওটাই পারে না ডলি। সারাক্ষণ দরজা এঁটে শুয়ে থাকে। বাপেরবাড়িতেও নাকি কদর নেই ডলির। অষ্টমঙ্গলায় গিয়ে মাত্র একদিন থেকেছে...এ সব কথা ডলির মুখেই শুনেছে বাপি। মা দিদি কিন্তু এখনও সে রকম কোনও কমপ্লেন করেনি। যত দিন যাচ্ছে মা দিদি, এমনকী ভাগ্নেও একটু গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে যেন! ভাগ্নেটাকে এতটুকু কাছে টানে না ডলি, এটা নিজেই খেয়াল করেছে বাপি। রান্না নিয়ে একদিন জটিল কাণ্ড ঘটে গেল। রহস্যটা থেকেই গিয়েছে, ভেদ করার চেষ্টা করেনি বাপি। হয়েছিল কী, একদিন রাতে খেতে দিচ্ছিল দিদি। ডলির পেট ভার, খাবে না। শুয়ে আছে ঘরে। গরম রুটি, তরকারি বেড়ে দিয়ে দিদি বলল, "কপির তরকারিটা তোর বউ করেছে। আমি, মা সন্ধেবেলায় হরিসভায় গিয়েছিলাম। এসে রুটি করলাম।" তরকারিতে নুন বেশি ছিল। দিদিকে কিছু না বলে, চুপচাপ খেয়ে উঠে গেল বাপি। বুঝতে পারল, মুখে না বলে দিদি ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল, দ্যাখ, তোর বউ কী রকম রান্না করে!

মুখ হাত ধুয়ে বাপি শোওয়ার ঘরে এসেছিল। কপালে কনুই ঢাকা দিয়ে শুয়ে আছে ডলি। গামছায় হাত মুছতে মুছতে বাপি নরম গলায় বলেছিল, "কপির তরকারিটা তুমি করেছ?"

হাত চাপা অবস্থায় ডলি বলে, "হ্যাঁ, কেন?"

"নুন একটু বেশি হয়ে গিয়েছে।"

"নুন বেশি?" চড়াক করে উঠে বসল ডলি, "বললেই হল নুনপোড়া? রান্নার পর আমি নিজে টেস্ট করেছি।"

"তা হলে হয়তো আমারই ভুল। আমরা নুন একটু কম খাই," বলে কথা চাপা দিতে চাইছিল বাপি।

ডলি ছাড়ার পাত্রী নয়, "বাজে কথা বোলো না। তোমরা নুন কম খেলে, এই ক'দিনে আমি বুঝতাম না? নিশ্চয়ই তোমার ওই কুচুটে দিদির কাজ। তোমাকে খেতে দেওয়ার সময় তরকারিতে নুন ঢেলে দিয়েছে। দাঁড়াও, আমি দেখছি!" বলে বিছানা থেকে নামতে যাচ্ছিল ডলি। বাপি বাধা দিল, "না তোমায় যেতে হবে না। আমি দেখছি কী কেস।"

ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরে এসেছিল বাপি। মা দিদি তখন খেতে বসেছে। ভোলাভালা মুখ করে বাপি দিদিকে বলল, "হ্যাঁ রে, তরকারিতে নুন বেশি হয়ে গিয়েছে না?"

দিদি নিষ্পাপ চোখ তুলে বলল, "ভলে দু'বার পড়ে গিয়েছে মনে হয়। রান্নাটা তো ডলি খারাপ করে না।"

ভাবনা গুলিয়ে গিয়েছিল বাপির। দিদি যদি নুন ঢেলে থাকে, ডলির রান্না খারাপ প্রমাণ করার জন্যই ঢেলেছে। কিন্তু ডলির রান্নার প্রশংসাই করছে দিদি। এমনকী, তখন মা ও বলে উঠেছিল, "না না, রান্নাটা ভালই করে। তবে রান্নাঘরে ঢোকার আগ্রহটা কম।"

গোটা ব্যাপারটা রহস্যের ঘেরাটোপে চলে গেল। বাপি চলে এসেছিল ঘরে। বিছানায় মটকা মেরে শুয়ে পড়েছিল। ডলি মা দিদির নিন্দে করেই যেতে লাগল। কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল বাপি...কিন্তু আজ তার মনে হচ্ছে, দিদি নির্দোষ। ডলিই বেশি করে নুন দিয়েছিল তরকারিতে! বাপি কমপ্লেন করলেই বলবে, দিদি ঢেলেছে। দিদির কারণেই এখন কানাইপুর স্টেশনে এসে দাঁড়িয়ে আছে বাপি। জামাইবাবুকে নিতে এসেছে। রাজস্থান থেকে ফিরছে শিবেনদা। বাপির বিয়েতে আসতে পারেনি। এত তড়িঘড়ি বিয়ের দিন ঠিক হল, শিবেনদা ছুটি ম্যানেজ করতে পারল না। হাওড়ায় শিবেনদার ট্রেন আসবে সকাল আটটায়। তারপর লোকাল ট্রেন ধরে কানাইপুর। দু'টো ট্রেন রাইট টাইম থাকলে সাড়ে আটটার মধ্যে তার কানাইপুর প্ল্যাটফর্মে চলে আসা উচিত। ন'টা বাজতে চলল, এখনও এল না। ইতিমধ্যে বেশ ক'টা আপ লোকাল ট্রেন চলে গিয়েছে। বাপি দাঁড়িয়ে আছে প্ল্যাটফর্মের শেষে ঢালুর কাছে।

ট্রেন থেকে নেমে শিবেনদা প্রথমে কানাইপুরে নিজের বাড়ি যায়। ব্যাগপত্র রেখে ঘণ্টা পাঁচ ছয়েকের পর আসে বাপিদের বাড়িতে। আজ দিদি বলেছে, স্টেশন থেকেই ওকে এ বাড়িতে নিয়ে আসতে। ডলির সঙ্গে দিদির মিশ খাচ্ছে না। তাই ঠিক করেছে শিবেনদাকে বলবে, শ্বশুরবাড়ির কাছে একটা বাড়ি ভাড়া করে দিতে। দিদি সেখানেই থাকবে ছেলেকে নিয়ে! দিদির কথাগুলোর মধ্যে কেমন জানি 'পর পর' ভাব ফুটে উঠছিল। ওর কি মনে পড়ছে না সেসব দিনের কথা, যখন কোলে বাচ্চা নিয়ে এসে কাঁদত? জানাত শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারের কথা। তখন বাপিই ভরসা দিয়েছিল দিদিকে, "তুই এ বাড়িতে ফিরে আয়। আমরা ঠিক চালিয়ে নেব।" ফিরে এসেছিল দিদি। শিবেনদার ইচ্ছে ছিল না, তবও। প্রেস্টিজ জ্ঞান আছে শিবেনদার, টাকা পাঠাতে কখনও সে ভোলে না। একটু বেশিই পাঠায়। সেটা বুঝেও না বোঝার ভান করে থাকে মা। দিদিও জানে, তার বাপের বাড়ি তার মাসোহারার টাকায় খানিকটা হলেও নির্ভরশীল। রাগের মাথায়, প্রতিশোধরূপে সেই অবলম্বনটুকু কি কেড়ে নিতে চাইছে দিদি? এই চ্যালেঞ্জটা মেনে নিয়েই বাপি নিতে এসেছে জামাইবাবুকে। মনটা বেশ ভেঙে আছে। শিবেনদাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ডিউটি ধরবে। মালিককে ফোন করে বলে দিয়েছে, আজ দেরি হবে যেতে। আর একটা ব্যাপার নিয়েও দুশ্চিন্তায় আছে বাপি, ডলি কেমন ব্যবহার করবে জামাইবাবুর সঙ্গে? দিদি যে এবাড়ি থেকে চলে যাওয়ার কথা ভাবছে, এখনও ডলিকে জানায়নি ও। চাইছিল, এটা নিয়ে বেশি জলঘোলা না হোক। ডলিকে বলেছে, "জামাইবাবু এলে, পায়ে হাত দিয়ে একটু প্রণাম কোরো। সম্মান দিলে খুশি হবে।" উত্তরে ডলি বলেছিল, "ভক্তি হলে, তবেই প্রণাম করব।"

এর পর আর কোনও কথাই হয়নি। বাপি জানে না, শিবেনদার জন্য কী ব্যবহার অপেক্ষা করছে! দেখতে দেখতে ঢুকে পড়ল ব্যান্ডেল লোকাল। দেখতে পাচ্ছে, ভিড়ের মাঝে কাঁধে ব্যাগ আর হাতে সুটকেস নিয়ে এগিয়ে আসছে শিবেনদা। বাপি একটু অপেক্ষা করে দেখে নিল, দিদির শ্বশুরবাড়ির কেউ শিবেনদাকে রিসিভ করতে এসেছে কি না। না, কাউকেই দেখা যাচ্ছে না আপাতত। বাপি এগিয়ে গেল হাসি হাসি মুখ করে।

জামাইবাবুকে নিয়ে বাড়ি ঢুকতেই টেনশন অনেকটা কমে গেল বাপির। নতুন শাড়ি পরা, আধ ঘোমটা দেওয়া ডলি শিবেনদা চৌকাঠ পেরতেই প্রণাম করল। বউয়ের চেহারা দেখে যথারীতি চমকে গিয়েছে শিবেনদা! অবাক হওয়ার ঘোর কাটছে না মুখ থেকে। মাঝের ঘরে জানলার দিকে পিঠ করে রাখা চেয়ারে বসেছে শিবেনদা। সামনের টেবিলে চা, মিষ্টি। বিছানায় লাজুক ভঙ্গিতে বসে আছে ডলি। মা, দিদি ঘরে আসছে, যাচ্ছে। এক ফাঁকে স্নান করে মাথা মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকল বাপি। খেয়েই বেরিয়ে যাবে ডিউটিতে। শিবেনদা চা খেতে খেতে ডলিকে জিজ্ঞেস করল, "বীরনগরে কোথায় যেন তোমাদের বাড়ি

বাপির ইচ্ছে করে, না খেয়েই অফিস বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবহাওয়া ঘোলাটে হয়ে যাবে।

বললে?"

গলা নামিয়ে নতুন বউয়ের মতো ডলি বলল, "রথতলা কলোনি।"

"রথতলা কলোনি!" একটু অবাক হয়ে কথাটা রিপিট করল শিবেনদা। তারপর থম মেরে গেল। হাতের কাপটা টেবিলে রেখে একটু ঝুঁকে এসে জিজ্ঞেস করল, "রথতলা কলোনি মানে তো বীরনগর স্টেশনের গায়ে? তোমাদের বাড়িটা কি কলোনির মধ্যেই?"

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এখন চুল আঁচড়াচ্ছিল বাপি, আয়নাতেই দেখল, জামাইবাবুর প্রশ্ন শুনে ডলি একবার মুখ তুলে তাকাল, কোনও উত্তর দিল না। টুকাইটা ইতিমধ্যে বাবাকে জ্বালাতে শুরু করেছে খেলনা দেখানোর জন্য। "দেখাচ্ছি, দেখাচ্ছি," বলে, চেয়ার থেকে উঠে সুটকেসের দিকে গেল শিবেনদা। এই সময় দিদি ঘরে ঢুকে বাপিকে বলল, "যা, মা খাবার বেড়েছে।"

বাপি ঘরের বাইরে যেতে যেতে দেখল, ডলিও উঠে আসছে বিছানা থেকে। এতক্ষণে দিদি একা পেল শিবেনদাকে। এবার আসল প্রসঙ্গ তুলবে। বাপির ইচ্ছে করে, না খেয়েই অফিস বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ির আবহাওয়া ঘোলাটে হয়ে যাবে। খেয়েদেয়ে বাপি গেল নিজের ঘরে জামা প্যান্ট পরতে। ডলি আলমারি খুলে কিছু গোছাচ্ছে। ঘড়ি পরতে পরতে বাপি জিজ্ঞেস করল, "কেমন বুঝলে জামাইবাবুকে?"

"ভাল," শান্ত গলায় উত্তর দিল ডলি। বাপি একবার ভাবল, শিবেনদাকে এ বাড়িতে প্রথমে নিয়ে আসার কারণটা ডলিকে বলে। পরক্ষণেই ভাবল, না থাক। পরিস্থিতি হঠাৎ ঘুরেও যেতে পারে। জামাইবাবুকে পছন্দ হয়েছে ডলির। দু'জনে অনেক কথা বলেছে। কথার মাঝে দিদিও কখনও সখনও ঢুকে যাচ্ছিল। দিদি এবং ডলি, কারও গলাতেই ধরা পড়েনি নিজেদের মধ্যে বিদ্বেষ। এমন হতেই পারে, দিদি কোনও অভিযোগ করল না জামাইবাবুর কাছে। আপাতত মলতুবি রাখল এবাড়ি থেকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত। বাড়ির আবহাওয়া কিন্তু বাপির ভাবনাকেই সমর্থন করছে। মাঝের ঘর থেকে ভেসে আসছে টুকাইয়ের হইচই। একই সঙ্গে ভেসে আসছে দিদির ধমক, জামাইবাবুর হাসি!

মাঝের ঘরের চৌকাঠে এসে দাঁড়াল বাপি। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বলল, "জামাইবাবু, আমি বেরচ্ছি। কাল আসছেন তো আবার?"

"দাঁড়াও। তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে," উঠে এল শিবেনদা।

বাপি আশঙ্কিত হল! দিদি কি তা হলে বলেই দিল? এত কম সময় লাগল বলতে? তা হলে গোছানোই ছিল কথা!

শিবেন এসে বাপির কাঁধে হাত রেখে বলল, "এখানে নয়, বাড়ির বাইরে গিয়ে বলি।"

জামাইবাবুর কাঁধের উপর দিয়ে দিদির দিকে তাকাল বাপি। দিদিও খুব অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। ও ও হয়তো জানে না, জামাইবাবু কী বলবে! ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না। দু'জনে মিলে হাঁটতে হাঁটতে সদর দরজা ডিঙোল। বাপি এবার ঘুরে তাকাল জামাইবাবুর দিকে। কীরকম যেন একটা হতাশভাব লেগে আছে চোখে।

"তোমার শ্বশুরবাড়ির পাড়ায় বিয়ের আগে ক'বার গিয়েছ তুমি?"

"কেন বলুন তো?" ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল বাপি।

"আমি জানতে চাইছি, ওদের পাড়া সম্বন্ধে তুমি কতটুকু, কী জান?"

"বিশেষ কিছু না। পাকা দেখা নিয়ে দু'বার গিয়েছিলাম। অষ্টমঙ্গলায় গিয়েছিলাম। তবে রাতে থাকিনি।"

"আর একটু খোঁজখবর নিলে পারতে।"

অজানা আশঙ্কায় বাপির বুকটা কেমন যেন খালি খালি লাগে! জামাইবাবু ঠিক কী বলতে চাইছে, ধরা যাচ্ছে না। প্রশ্ন করতেই ভুলে গিয়েছে বাপি!

"একসময় ওই পাড়ার খুব বদনাম ছিল, যখন আমরা স্কুল কলেজে পড়তাম। সে অবশ্য অনেকদিন আগের কথা। এখন হয়তো সব ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছে। আমিও তো বাইরে থাকি, খবর রাখি না।"

বাপি টের পেল, ব্যাপারটা হালকা করে দিতে চাইছে জামাইবাবু। ঠান্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী নিয়ে বদনাম ছিল পাড়াটার?"

বাপির কাঁধে হাত রাখল শিবেন। আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল, "ছেড়ে দাও, সেসব কবেকার কথা! বিয়ে যখন হয়েই গিয়েছে, ওসব মাথায় না রাখাই ভাল। যাও, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ো, ডিউটিতে দেরি হয়ে যাচ্ছে তোমার।"

ফের একই প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল বাপি, বদনামটা কিসের? পারল না। গলাটা কেমন যেন বুজে এসেছে। হাত, পায়ের তালুতে ঠান্ডার ছোঁয়া। আপাতত এখান থেকে সরে পড়াই ভাল। মাথা নিচু করে অফিসের উদ্দেশে রওনা দিল বাপি।

ডিউটি সেরে বাড়ি ফিরতে প্রায় এগারোটা বেজে গেল। বিয়ের পর এই প্রথম বাড়ি ফিরতে এত রাত হল। বাড়ির লোক নিশ্চয়ই চিন্তা করছে খুব।

ক্রমশ

অলঙ্করণ: নির্মলেন্দু মণ্ডল

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

ডলি কী ভাবছে কে জানে! বাড়িওয়ালার ফোন আছে।

পর্ব ৩

আগে যখন হঠাৎ কাজের চাপ বেড়ে গেলে ফিরতে রাত হত, বাপি অফিস থেকে ফোন করে দিত বাড়িওয়ালার ঘরে। আজ সে সুযোগও পায়নি। প্রথম দিকে হাতের স্পিড কম ছিল, মেকআপ করতে, ঘাড় গুঁজে কাজ করে যেতে হয়েছে। দিদির ব্যাপারটা কী হল, সেটা জানার এখন খুব দরকার। দিদি আদৌ কি জামাইবাবুকে কিছু বলল? কী সিদ্ধান্ত নিল শিবেনদা...বাড়ি থেকে ফুট তিরিশেকের দূরত্বে দাঁড়িয়ে বাপি খেয়াল করল, তাদের নীচের তলাটা কেমন যেন অন্ধকার, অন্ধকার! আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল নাকি সবাই? দরজায় গিয়ে কড়া নাড়ল বাপি। একটু পরে খুলে দিল মা। মুখটা ভীষণ থমথমে। ঘুম থেকে উঠে এল বলে কি এরকম? বাপি জিজ্ঞেস করল, "কী গো, শুয়ে পড়েছিলে নাকি? শরীর খারাপ?" মা উত্তর দিল না। বাপি ঘরে এসে জুতো ছাড়ল। কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে বাড়িটা! তখনই মা পিছন থেকে বলল, "শিবেন ছেলে বউ নিয়ে চলে গেল।"

গোটা খবরের কাগজটা দেখতে পাঁচ মিনিটও লাগে না বিজনের। কিন্তু রোজ অনেকক্ষণ ধরে উলটে পালটে যায়। ভান করে পড়ার। মেয়ে বউ সামনে এসে উসখুস শুরু করলে তবে ছাড়ে! এই সংসারের প্রতি বিজনের কর্তব্য প্রচুর। আর অধিকার বলতে, সকালের কাগজটা প্রথমে পড়তে পারা, ব্যস! আজও কাগজটা নিয়ে ক্রমাগত পাতা উল্টে যাচ্ছে। কোনও খবরেই মন বসাতে পারছে না। মন কাড়ার মতো খবরও ছাপা হয় না বড় একটা। রাশিফলের মতো একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লেখা হয়। বিজন একবার লক্ষ করেছিল, তিনদিনের তফাতে বধূ নির্যাতনের খবরে স্বামীর নাম একই ছিল! শুভেন্দু মাঝি, বয়সও এক, তিরিশ! শুধু ঘটনা দুটো ঘটেছিল ভিন্ন স্থানে। একটা মুর্শিদাবাদে, অন্যটা ডায়মন্ড হারবারে! বিজনের যথেষ্ট সন্দেহ হয়, খবরগুলো বুঝি পাতা ভরানোর জন্য তৈরি করা। মেয়ে বুলান সামনে ঘুরঘুর শুরু করেছে। অর্থাৎ, কাগজটা চাই। বুলান ক্লাস নাইন। কোন কোন খবরের প্রতি ওর আগ্রহ, জানে না বিজন। ওর পড়া শেষ হতে না হতেই কৃষ্ণা কেড়ে নেয়। কৃষ্ণার আবার অফিসের তাড়া। সাড়ে ছ'টায় উঠে পড়ে ঘুম থেকে। রোবটের মতো বাথরুম, রান্না, শাড়ি পরা, কাগজে চোখ বুলিয়ে ন'টার মধ্যে বেরিয়ে পড়ে। মেয়ে স্কুলে বেরোয় আরও দেড় ঘণ্টা পরে। বিজন কখন বেরল, তা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই মা মেয়ের। বাজার করার থাকলে, কৃষ্ণা একটা লিস্ট বিজনের সামনে ফেলে দিয়ে চলে যায়। আজ বোধ হয় বাজার করতে হবে। সবজি মাছ নিশ্চয়ই ফুরিয়েছে। তিনদিন আগে বাজার করেছিল বিজন। এখন তাই বাজারের থলে পাশে নিয়ে কাগজটা পড়ছে। এমনিতে তাদের বাড়িতে চায়ের খুব একটা চল নেই। অল্প ঠান্ডা পড়েছে বলেই বোধ হয় আজ একটু চা খেতে ইচ্ছে করল। কৃষ্ণা রান্নাঘরে। ওখানে গিয়ে বলার সাহস নেই বিজনের। নিজে যে করে নেবে, তাও সম্ভব নয়। গ্যাসের দুটো উনুন ব্যস্ত অফিস,

স্কুলের রান্না করতে। অগত্যা মেয়ের শরণাপন্ন হতে হল। কাগজটা পাট করে মেয়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "দ্যাখ তো, এক কাপ চা হবে কি না?"

কাগজ হাতে নিয়ে মেয়ে চলে গেল রান্নাঘরে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফেরত এসে বলল, "চা হচ্ছে। মায়ের মোবাইলটা কোথায় রেখেছ, বের করে দাও।"

'মোবাইল, আমি!' বলতে গিয়েও ঢোঁক গিলে নিল বিজন। বলান কেমন একটু কড়া চোখে তাকিয়ে চলে গেল পাশের ঘরে। অস্বীকার করাই যায়। কৃষ্ণাকে বলা যায়, তোমার ফোন নিয়ে আমি কী করব! নিজে কোথায় ভলে রেখেছ, দ্যাখো। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, সত্যিই কৃষ্ণার ফোনটা ভোর রাতে নিয়েছিল বিজন। মা মেয়ে তখন লিভিং রুমে অঘোর ঘুমে। বিজন শোয় ড্রয়িংয়ে। একটা বিশেষ কারণে কৃষ্ণার ফোনটা দরকার হয়ে পড়েছিল। পায়ে পায়ে ওদের ঘরে ঢুকে টেবিল থেকে ফোনটা নিয়ে বাথরুমে ঢুকে যায় বিজন। সেটটা ওখানে ফেলে রেখেই চলে এসেছে, একদম খেয়াল নেই! এখনই ফোনটা বাইরে এনে রাখা দরকার। কারণ, কৃষ্ণা কোনও অবস্থাতেই বাথরুমে ফোন নিয়ে যাবে না। যথেষ্ট পিটপিটানি আছে ওর।

সোফা ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিল বিজন, তখন কিচেন থেকে চায়ের মগ হাতে বেরিয়ে এল কৃষ্ণা। বিজনের চোখে চোখ রেখে বলল, "ফোন আমি নিয়ে এসেছি। এখন বলো, আমার সেট নিয়ে কী করছিলে?"

চায়ের মগটা নিয়ে মাথা নিচু করে বসে থাকল বিজন।

সোফাটার কোণে কৃষ্ণা বসল, "কী হল, উত্তর দিচ্ছ না কেন?"

জবাব দেওয়ার মতো কোনও অজুহাত বিজনের কাছে নেই। চা টা দ্রুত শেষ করতে থাকল।

কৃষ্ণা ফের বলে উঠল, "আমি জানি, কেন তুমি ফোনটা নিয়েছিলে!"

চমকে চোখ তুলল বিজন। সেটটা নেওয়ার কারণ একমাত্র তার মনই জানে। কৃষ্ণার কনফিডেন্স দেখে মালুম হচ্ছে, মনের কথাও পড়তে পারছে আজকাল! বিজনের দৃষ্টিতে অবিশ্বাস!

"তুমি আমার মেসেজ ইনবক্স দেখছিলে। কিন্তু দেখার পর ফোনটা যে প্রাইমারি পজিশনে রেখে দেবে, সে খেয়াল নেই! কেন দেখছিলে? অন্যের মেসেজ পড়ার মতো ছোট কাজ কেন করছিলে?" গলা চড়ছে কৃষ্ণার।

প্রায় মরিয়া হয়ে বিজন বলে উঠল, "এখন এসব প্রসঙ্গ থাক না। মেয়ে আছে পাশের ঘরে, সব শুনতে পাবে।"

"শুনুক। আমি তো শোনাতেই চাই। ও জানুক, ওর বাবার চরিত্রটা কেমন?"

বিজন আর দেরি করল না। উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে। এখন যে স্কেলে চেঁচাচ্ছে কৃষ্ণা, লাগোয়া ফ্ল্যাটের লোকেরাও শুনতে পাবে। বাজারের খালি ব্যাগ হাতে এক ঝটকায় বিজন বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ফ্ল্যাটটা গ্রাউন্ড ফ্লোরে। গ্রিল ঘেরা বারান্দায় বিজনের সাইকেল। তড়িঘড়ি সেটা নামিয়ে আনল রাস্তায়। কোথায় যাবে, কোনও ঠিক নেই। তেতো হয়ে গিয়েছে মনটা।

কানাইপুরের রাস্তায় একা হয়ে সাইকেলের প্যাডেল মারতে থাকল বিজন। জন্মাবধি এই কানাইপুরেই আছে সে। এক সময় কত বন্ধুবান্ধব ছিল। মনখারাপ হলেই কারও কাছে চলে গেলেই হত। এখন সবাই ছিটকে গিয়েছে। বিজনের তিন ঘনিষ্ঠ বন্ধুই কানাইপুরের বাইরে রুটি রুজিতে ব্যস্ত। অর্ক, অমিতেশ, কুণাল। একসঙ্গে স্কুল কলেজ, লিট্‌ল ম্যাগাজিন বের করা, নাটকের দল, আর্টিস্ট ক্যাম্প। কবে থেকে যেন ওরা হঠাৎ

> কিচেন থেকে চায়ের মগ হাতে বেরিয়ে এল কৃষ্ণা। বিজনের চোখে চোখ রেখে সে বলল, "সেট নিয়ে কী করছিলে?"

কেরিয়ার নিয়ে সচেতন হয়ে গেল! অর্ক এখন আমেরিকায়। কোনও একটা কলেজে ইকনমিক্স পড়ায়। অমিতেশ দিল্লিতে, অ্যাড এজেন্সির আর্ট ডিরেক্টর। কুণালের স্বপ্ন ছিল ভাল সিনেমা তৈরি করবে। এখন মেগা সিরিয়াল করে, থাকে কলকাতার নাকতলায়। তিন বন্ধুরই পৈতৃক বাড়ি আছে কানাইপুরে। কেউই সময় পায় না আসার। যখনই কোনও কারণে মনখারাপ হয় বিজনের, রাগ হয় তিন বন্ধুর উপর! ঠিক রাগ নয়, অভিমান! যে অভিমানের কোনও মানেই হয় না। শুধু যখন ঘোর অপমানিত হয়, বড় একা লাগে। মনে পড়ে বন্ধুদের কথা। আরও দু'জনের অস্তিত্ব খেয়াল হয়, মা বাবা। ওরা থাকে জেলেপাড়ায়। বিজনদের সেই প্লাস্টার খসা দ' কামরার বাড়িতে। রান্নাঘর টালির চালের। মল বাড়ি থেকে তিরিশ ফুট দূরে কলঘর, বাথরুম। সেটা আবার ভাড়াটের সঙ্গে কমন। বিয়ের পর এক রাতের জন্যেও ও বাড়িতে থাকেনি কৃষ্ণা। সেরকমই কথা ছিল বিজনের সঙ্গে। অন্যত্র বাড়ি ভাড়া করার পর বিজনরা বিয়ে করে। মা বাবার তা নিয়ে কোনও অভিযোগ নেই। জেলেপাড়ার ওই বাড়িতে শিক্ষিত, চাকুরিরতাকে নিয়ে বাস করা যায় না, এই বাস্তবজ্ঞানটুকু তাদের আছে। কৃষ্ণা তার শ্বশুর শাশুড়ির সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখে না। বলা যায়, ধর্তব্যে আনে না! কিন্তু সপ্তাহে একদিন অন্তত বিজন ও বাড়িতে যায়। খবর নেয় মা বাবার। টাকাপয়সা দিতে হয় না। বাবার পেনশন আছে। এ ছাড়াও টুকটাক কাজকর্ম করে। সাইকেল চালাতে চালাতে বিজন একবার ভাবল, জেলেপাড়ার বাড়িতে যাবে। পরক্ষণেই সিদ্ধান্ত পাল্টাল, বউয়ের কাছে ঝাড় খেয়ে বাবা, মা'র কাছে বসে থাকার মতো বোকা বোকা ব্যাপার আর হয় না। তার চেয়ে বরং নিজের ওয়র্কশপে চলে যাওয়া ভাল। এদিকে বাজার যাওয়াটাও উচিত। মাছ ফুরিয়েছে নির্ঘাত। আর কী কী ফুরিয়েছে, জানা হল না। বিজনের অনির্দিষ্ট সাইকেল চালনা কেউ লক্ষই করছে না! দশ বছর আগেও পাঁচ ফুট অন্তর একটা চেনা লোক পাওয়া যেত। হঠাৎ হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ফ্ল্যাটবাড়ির মানুষ সেসব লোককে আড়াল করে দিয়েছে। ফ্ল্যাটবাড়ির কথা মাথায় আসতে বিজনের মনে পড়ে গেল ঠাকুরমাকে। দুর্গাবাড়িতে হাউজিং কমপ্লেক্স হবে কি না, সিদ্ধান্ত নেবে বিজন। কত বড় দায়িত্ব! মনে করলেই ওয়র্কশপসমেত একটা ফ্ল্যাটও বাগিয়ে নিতে পারে! এই কথাটাই জানানো হল না কৃষ্ণাকে। বিজনের নির্বুদ্ধিতার কারণে আজ

সকালটা নষ্ট হয়ে গেল। ফোনের মেসেজ ইনবক্স দেখার কারণ অতি তুচ্ছ। ভ্যালেন্টাইন ডে র জন্য চারটে কার্ড ডিজ়াইন করেছে বিজন, ক্যাপশন দিয়ে উঠতে পারছিল না। প্রেমে পড়ার অনভতি সে কবেই হারিয়েছে! চান্স নিয়ে দেখছিল, কৃষ্ণার অফিসের প্রেমিকপ্রবরটি যদি তেমন কোনও মেসেজ পাঠিয়ে থাকে। অনেক কটাই পাঠিয়েছে। একটা খব মনে ধরেছে বিজনের, A hand when I need it. A smile when I'm sad...For my Adorable darling. কিন্তু ওকে ক্যাপশন দিতে হবে বাংলায়। কৃষ্ণার প্রেমিকের মেসেজ বাংলায় তজমা করতে গিয়েছিল বিজন। কিছুতেই শ্রুতিমধর হচ্ছিল না। তখনই ভলে যায় সেটটার কথা। ছোট্ট ভলে কি হেনস্থাটাই না হতে হল! মেয়েটাই বা কী ভাবল তার বাবার সম্বন্ধে! বাবার প্রতি অনাস্থাটা কৃষ্ণা সযত্নে ধীরে ধীরে বনে দিয়েছে বলানের মনে। মেয়ের জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই। কেন এভাবে বিজনকে শাস্তি দিচ্ছে, ঠিক বোঝা যায় না। নিরুপায় হয়ে বিজনকে বিয়ে করতে হয়েছিল বলেই কি? তা হলে তো বলতে হয় বলানও ওর কাঙ্ক্ষিত ছিল না! মেয়ে সে কথা জানে না। একদিন সযোগ বঝে বলানের কানে কথাটা দিয়ে দেবে কি? হয়তো বিশ্বাসই করবে না বলান। কিন্তু খটকাটা থেকে যাবে। সেটাই যথেষ্ট। তবে এসব নোংরামি করতে মন চায় না বিজনের। যেমন, কৃষ্ণার প্রেমিকের নামটা পর্যন্ত সে জানার আগ্রহ দেখায়নি। শুনেছিল, ওর অফিসেই চাকরি করে। সম্ভবত মল্লিক টাইটেল। বলানও মায়ের সঙ্গে কথা চালাচালির সময় মল্লিককাকুর নাম উল্লেখ করে। এসব থেকেই আন্দাজ করেছিল বিজন। কৃষ্ণার ফোনে মেসেজ সেন্ডারের নাম দেখল ডি এম। কোড নেম। কাকে লকানোর

> থলে ভর্তি বাজার করে ফেলল বিজন। মাছ দু'রকম নিয়েছে। কৃষ্ণা এতক্ষণে অফিস বেরিয়ে গিয়েছে।

জন্য নামটা ছোট করেছে কৃষ্ণা? হয়তো আশঙ্কা করে বলানও ইনবক্স ঘাঁটতে পারে। কিন্তু 'এম' দেখেই তো মেয়ে মল্লিককে ধরে নেবে। 'ডি' দিয়ে শুরু নামটা বোধ হয় জানে না। বিজনেরও এখন অল্প কৌতূহল হচ্ছে নামটা জানার। মানুষটি কেমন দেখতে, আচার ব্যবহার কীরকম...ডি এম এর মতো ব্যক্তিত্বর জন্যই কি প্রতীক্ষা ছিল কৃষ্ণার? কী সেই বৈশিষ্ট্য, যা ওর নেই?

বিজন সাইকেল থেকে নামল। সকালের এই সময়টা বাজারে বেশ ভিড় থাকে। বিজন আসে বেলা করে। আজ অজান্তে চলে এল। কৃষ্ণার কাছে চূড়ান্ত অপমানের পরও, মনের গভীরে সংসারের প্রতি মায়া একটুও টলে যায়নি। ফ্রিজ় খালি। তিনদিন আগে বাজারে এসেছিল বিজন। মা, মেয়ে হয়তো আজ মাছ না খেয়েই অফিস, স্কুলে বেরবে। রাতে অন্তত মাছটা যেন পায়, মনের ভিতরে এই বাসনাটাই বোধহয় বাজারে নিয়ে এল বিজনকে। এটা কি শুধু কর্তব্য বলেই ভাবে কৃষ্ণা? কে জানে! সাইকেল গড়িয়ে বাজারে ঢুকল বিজন। রাস্তার পাশে বসা খোলা বাজার। শেষ প্রান্তে মাছ বাজারে অবশ্য শেড আছে। প্রায় আটটা বাজে। শীতের বাতাসে মিহি উষ্ণতা মিশছে। মনটা ভাল হতে শুরু করল। সকাল সকাল অপমানটা জোরদার আঁতে লেগেছে। মাথা ঝাঁকিয়ে আজেবাজে চিন্তা তাড়াল বিজন। বাজারের সবজিপাতির দিকে মনোযোগী হল। কড়াইশুঁটি, টম্যাটো, বাঁধাকপির গায়ে এখনও খেতের হিম লেগে আছে। সবজিগুলো যেন বলছে, কী হল বিজনদা, কেনাকাটা এবার শুরু করো! থলে ভর্তি বাজার করে ফেলল বিজন। মাছ দু'রকম নিয়েছে। এখনই বাড়ি ফিরে সব ফ্রিজে তুলে দেবে কি? কৃষ্ণা এতক্ষণে অফিস বেরিয়ে গিয়েছে। স্কুলের জন্য তৈরি হচ্ছে মেয়ে। সকালের ঘটনার পর এখনই মেয়ের মখোমখি হতে কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছে। তা হলে কি ওয়র্কশপে যাবে? পরে একসময় বাড়ি গিয়ে রেখে আসবে বাজারগুলো। ভাবতে ভাবতে বিজন খেয়াল করল, সে আসলে সাইকেল চালিয়ে দিয়েছে জেলেপাড়ার বাড়ির দিকে!

স্কুল বয়স থেকেই নিজেদের বাড়িটাকে হরপ্পা, মহেঞ্জোদারোর একটা অংশ বলে মনে হত বিজনের! রাস্তা থেকে চার ধাপ সিঁড়ি ভেঙে উঠোনে নামতে হয়। বাঁ হাতে তাদের শ্যাওলা রঙের বাড়ি। ডানদিকে ভাড়াটের ঘর। সিঁড়ির মখোমখি ভাঙা পাঁচিল, ওপারে ডোবা। এককালে বিজনরা এবাড়ির ভাড়াটে ছিল। বাড়িওয়ালা থাকত পায়ে হেঁটে কুড়ি মিনিটের দরত্বে। বেশ কয়েকবার বাবার দেওয়া খামে করে ভাড়া দিয়ে এসেছে বিজন। বাড়িওয়ালা বিনোদ ওদের খব খাতির করত। হঠাৎই একদিন বাড়ি ফিরে বাবা ঘোষণা করল, "মামলা ঠুকে দিলাম। মাসের পর মাস ভাড়া গুণে যাচ্ছি। বাড়ি মেরামত করে না।

ইয়ার্কি নাকি?” তারপর বিজনকে আর ভাড়া দিতে যেতে হত না। স্নেহময়ী বাড়িওয়ালির কথা মনে হত খুব। কয়েক বছর পর সনৎ সরকার জলের দরে বাবাকে বাড়িটা বিক্রি করে দিল। তবে ভাড়াটেসমেত। ভাড়াটে পাল্টায়নি। তারাও প্রায় বিজনদের ফ্যামিলির লোক হয়েই আছে।
সাইকেলসুদ্ধু উঠোনে নেমে এল বিজন। বাবা বারান্দায় বসে সাইনবোর্ড লিখছে। এটাই এখন প্রধান পেশা। এছাড়াও মোটর রিপেয়ারিং করে। ঘাড় ঘুরিয়ে বিজনকে একবার দেখে, কাজে মন দিল বাবা। বারান্দার মুখে এসে থমকে গেল বিজন, লাজুক হাসি নিয়ে শ্যামলা রঙের একটা বউ বারান্দায় এসে তাকে দেখছে। কোনও আত্মীয় কী? চিনতে পারছে না তো? অথচ বউটা এমনভাবে হাসছে, যেন কতদিনের চেনা! দ্রুত স্মৃতির পাতা উল্টাতে থাকে বিজন। বউটি নেমে আসছে দু’ ধাপ সিঁড়ি বেয়ে। সামনে এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। নিজের পরিচয় দিল না। ভেবেছে, বিজন নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছে। “দিন, বাজারটা আমাকে দিন,” বিজনের হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে বউটি হাঁটা দিল ঘরের দিকে। মা কেন এখনও আসছে না! বিজন পায়ে পায়ে উঠে এল বারান্দায়। ভাঙা চেয়ারে ঠেসান দেওয়া সাইনবোর্ড। বাবা এক মনে লিখে যাচ্ছে। বিজনের দিকে না তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, “বউমা, বুলান, সব ভাল?” বিজন উত্তর দিতে যাবে, ঘর থেকে ভেসে এল মায়ের গলা, “এই দ্যাখো, মেয়ের কী কাণ্ড! আরে বাবা, বাজারটা ওর বাড়ির। তুই এখানে নিয়ে এলি কেন? সব আবার ঢেলেও ফেলেছিস! আমাকে একবার জিজ্ঞেস করবি তো!” বাবার কাজের হাত থেমে গিয়েছে। বিজন বসে পড়ল বারান্দায় রাখা চেয়ারে। সোফা প্যাটার্নের কাঠের চেয়ার। বসার জায়গাটা প্লাস্টিকের তারে বোনা। প্রায় বিশ বাইশ বছরের পুরনো। বৃষ্টি হলে ভিতরে ঢোকানো হয়। মা এসে দাঁড়াল চৌকাঠে। মুখে হাসি। বিজন ইশারায় জানতে চাইল, মেয়েটি কে? মা ইশারাতেই বলল, পরে বলছি।
বাবা তুলি ধুয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। মায়ের উদ্দেশে বলল, “ফের থলিতে পুরে দিয়েছ তো সব?”
“শিউলিই তুলছে।”
মেয়েটার নাম জানা গেল, শিউলি। তাতে অবশ্য কোনও সুবিধে হল না চিনতে। আরও যেন অপরিচিত লাগছে। অথচ রান্নাঘর অবধি মেয়েটার প্রবেশাধিকার! ফিরে এসেছে শিউলি। মাকে বলল, “জেঠিমা, বড়দা দু’ রকমের মাছ এনেছে। কাটা পোনা চার পিস তুলে রাখলাম। জেঠাকে আর বাজার যেতে হবে না।”
বাবা চেঁচিয়ে উঠল, “একদম না। কে তোমাকে পাকামো করতে বলেছে? যেমন এনেছিল, তেমনই থলিতে রেখে দাও।”
বাবার বকুনিতে থতমত খেয়ে গিয়েছে শিউলি। মায়ের মুখ শুকনো। অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল বিজন। প্রায় অস্ফুটে বলল, “থাক না, ক’টা মাছ। আমি বেশি করেই নিয়েছি।”
বাবা হঠাৎ গলা মোলায়েম করে নিয়ে বলল, “বাজার আমাকে যেতেই হবে। অন্য দু’ একটা

বিজন চান্স নিয়ে দেখছিল, কৃষ্ণার অফিসের প্রেমিকটি যদি তেমন কোনও মেসেজ পাঠিয়ে থাকে।

জিনিস কেনার আছে। তা ছাড়া ক’দিন ধরে পমফ্রেট মাছ খেতে ইচ্ছে করছে খুব।”
বাবার স্বভাব বিজন জানে। যেহেতু এবাড়ির নাম করে আনা হয়নি মাছ, কিছুতেই নেবে না। পরিস্থিতি ঘোরাতে বাবা ঢুকে গেল ঘরে। মনে হচ্ছে এখনই পায়জামা, পাঞ্জাবি গলিয়ে বেরিয়ে যাবে বাজারে। সাইনবোর্ডের কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেল।
“দাদা, চা,” আবার শিউলি। হাতে চায়ের কাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটার পরিচয় এখনও জানা হল না। মা দোরগোড়ায় বসে পড়ে শিউলিকে বলল, “ওকে জিজ্ঞেস না করে চা করতে গেলি কেন?”
শিউলির গলায় একটু যেন অভিমান, “জেঠা চা চেয়েছিল, তাই দাদার জন্যও করলাম।”
মেয়েটা কি একটু বেশি কথা বলছে? ওভার অ্যাক্টিভ? চায়ের কাপ নিল বিজন। শিউলি চলে গেল ঘরে।
গলা নিচু করে বিজন জানতে চাইল, “মেয়েটা কে?”
“সন্দীপের বউ,” বলল মা।
সন্দীপ বিজনদের ভাড়াটের বড় ছেলে। দুর্গাপুরের কোনও এক কারখানায় কাজ করে। বছরে এক দু’বার বাড়ি আসে। বিজন বলল, “সন্দীপের বিয়ে হয়েছে, জানতাম না তো!”
“শুনেছিস। এখন মনে নেই। বিয়ে দুর্গাপুরে হয়। দু’ বছর আগে। নেমন্তন্ন ছিল। তোকেও বলেছিলাম।”
সত্যিই এপিসোডটার কিছুই মনে পড়ছে না বিজনের। এবাড়িতে না থাকার কারণেই এরকম হচ্ছে। অজান্তে এই সংসারের বিষয়গুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে সে...ভাবনা ঘুরে যাচ্ছে অন্য পথে। বিজন ফিরিয়ে আনে, “সন্দীপ বউ নিয়ে ক’দিন হল এসেছে?”
“শিউলিকে এবাড়িতে রেখে গিয়েছে সন্দীপ।”
“কেন, কাকা কাকিমা কারও শরীর খারাপ?”
“না, শিউলিরই মাথা খারাপ!”
“মানে?” কিছুই বুঝতে না পেরে বলে বিজন।
“মেয়ের মাথায় স্ক্রু ঢিলে আছে, বিয়ের ক’দিন পরেই টের পায় সন্দীপ। কাউকে কিছু বলেনি। দুর্গাপুরে ডাক্তার দেখিয়েছিল। কোনও উপকার হয়নি। এবার এসে কলকাতায় গেল ডাক্তার দেখাতে। দেখিয়ে টেখিয়ে এ বাড়িতে রেখে গেল। বলল, ‘ওষুধ খেয়ে সুস্থ হোক, তারপর নিয়ে যাব। ওখানে থাকলে আমার অর্ধেক দিন ডিউটি কামাই করিয়ে দেয়। এভাবে চললে চাকরি থাকবে না।’”
“বউটা প্রবলেম কী করে?”
“সেটা পরিষ্কার করে কিছু বলে যায়নি সন্দীপ। ওর বাবা মা জানতে চেয়েছিল। সন্দীপ বলেছে, ভলভাল কাণ্ড করে। ঠাকুরপো, দিদি দু’জনেই সিঁটিয়ে আছে। বউটাও হয়েছে এমন, ওদের ঘরে প্রায় থাকেই না। সব সময় আমার পিছনে ঘুরঘুর করছে। ইদানীং রাতে আমার পাশে শুচ্ছে! ওর শ্বশুর, শাশুড়ি বেঁচেছে,” একটানা বলে গেল মা, “জলখাবার খাবি তো? নিশ্চয়ই খেয়ে বেরসনি?”
“খাব,” বিজন ঘুরে গেল বাবার অধসমাপ্ত কাজের সামনে। তুলিতে তুলে নিল সবুজ রং। সাইন বোর্ডে সবুজ জমি ভরাট করতে থাকল। এই বোর্ডের কোণে ছোট সই থাকবে বাবার, ‘নন্দ ভট্টা’। সইটা হুবহু নকল করতে পারে বিজন। কলেজ পড়ার সময় বাবার বেশি অর্ডার থাকলে, গোটা সাইনবোর্ড নিজেই বানিয়েছে বিজন। অনুমতি নিয়ে বাবার সইটা পর্যন্ত করে দিত। এখন বোধহয় পারবে না।
“আপনিও বোর্ড আঁকতে পারেন!”
শিউলির গলা শুনে ঘাড় ফেরাল বিজন। মেয়েটা অদ্ভুত ভাবে হাসছে। ভবিষ্যতে বলা হবে, এমন অনেক কথা লুকিয়ে আছে ওই হাসিতে। শিউলির শরীরের অকপট আবেদনটাও বেশ বিভ্রান্তিকর। এমনও হতে পারে, হাসিতে কোনও কথাই নেই। আবেদনটাও মিথ্যে। সমস্ত কিছুর মধ্যে ঘোর পাগলামি ঘাপটি মেরে আছে!
“আপনার ফোন বাজছে, শুনতে পাচ্ছেন না!”
সত্যিই শুনতে পায়নি বিজন! শিউলির চোখে চোখ রেখে ঘোরের মধ্যে চলে গিয়েছিল। বুক পকেট থেকে ফোন বের করে স্ক্রিনে দেখে ওয়ার্কশপের নম্বর। সুইচ টিপে কানে নেয় ফোন। ওপ্রান্ত থেকে রায়দা বলল, “তাড়াতাড়ি চলে আসুন। বামুনবাড়ির বাক্সপ্যাটরা কারা যেন উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে!”
“কারা ফেলল?”
“সেটাই তো বোঝা যাচ্ছে না। আপনি তাড়াতাড়ি আসুন। উঠোনভর্তি লোক। বামুনবাড়ি খুব শাপ শাপান্ত করে যাচ্ছে।”
“ঠিক আছে, যাচ্ছি,” ফোন কেটে দিল বিজন। তারপর শিউলিকে বলল,“আমার বাজারের থলিটা নিয়ে এসো তো।”
রীতিমতো শাসনের ভঙ্গিতে চোখ পাকিয়ে শিউলি বলল, “জলখাবার না খেয়ে এ বাড়ি থেকে বেরবেন না!”

বিয়ের আগে ছোটখাটো দু’ একটা প্রেম করা যে

কতটা জরুরি, এখন তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে বাপি! ইয়ং মেয়েদের সম্বন্ধে ভাল করে না বুঝে শুনে বিছানায় তুলে ফেলা, মহা মূর্খের কাজ! বিশেষ করে ডলির মতো হাই ভোল্টেজ মেয়েদের। অদেখা মন আর অচেনা যৌবন মিলিয়ে ডলি। তাকে যে কীভাবে সন্তুষ্ট রাখা যাবে, ভেবে পায় না বাপি। ভেবেছিল, দিদি চলে যাওয়ার পর ডলি বোধহয় ভাল থাকবে। কিন্তু সে একই রকম গুম মেরে আছে। এখন যত অভিযোগ মায়ের দিকে! মা নাকি রান্নাবান্না, ঘরদোরের কাজ কিছুই করছে না। সব ডলির উপর রেখে পাড়া বেড়াচ্ছে, হরিসভায় যাচ্ছে। পরশু রান্না করতে গিয়ে হাত পুড়িয়েছে ডলি। তালুর উল্টো পিঠে অনেকটাই পুড়েছে। মলম লাগিয়ে শুয়ে বসে টিভি দেখে কাটাচ্ছে এখন। গতকাল নাইট শোতে ডলিকে নিয়ে সিনেমা দেখেছে বাপি। তবু ডলির মন ভাল হয়নি। বরং আরও রেগে গিয়েছে। এবার রাগটা বাপিদের বাড়ির কাছাকাছি সিনেমা হলটার উপর। বলেছে, "এই তোমাদের সিনেমা হল! ছেড়া সিট, ছারপোকা, হলের মধ্যে পেচ্ছাপের গন্ধ! কী করে তোমরা এখানে সিনেমা দ্যাখো! নাইট শো র লোকগুলোও কী অসভ্য! ড্যাবড্যাব করে খালি দেখছে, যেন মেয়েছেলে দেখেইনি জীবনে। আমাদের বীরনগরে শ্রীরাধা হলে কোনওদিন সিনেমা দেখেছ? ইয়া বিশাল পর্দা, কী সাউন্ড! গদিমোড়া চেয়ার। কত ভদ্রলোকের মেয়ে বউ ওখানে সিনেমা দেখতে যায়।"

যে কোনও কথায় বাপের বাড়ির সঙ্গে তুলনা টানা ডলির অভ্যেস। সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে গোটা তিনেক চপ খেল ডলি। একটা ডিমের, দুটো মাংসের। রাতের দিকে ঠান্ডা চপ। বাপি ভয়ে ভয়ে একটাই খেয়েছিল। যথারীতি প্রচণ্ড অম্বল হল ডলির। দুটো ট্যাবলেট খেয়ে রাতে শুয়ে পড়েছিল। বাপি রাতের খাবার খেতে বসেছিল মায়ের সামনে। রুটির সঙ্গে দু'রকম তরকারি করেছিল মা। ছিল এই শীতের প্রথম পাটালি গুড়। ডলির খাওয়া হল না বলে খারাপ লাগছিল বাপির। খেতে খেতে মাকে জিজ্ঞেস করে, "কখন এত সব করলে? হরিসভায় যাওনি?"

"কখন আর যাব। স্বপ্না চলে যাওয়ার পর থেকে আর যাওয়াই হয় না," বলেছিল মা, "রান্নাবান্না কে সামলাবে! তারপর কাচাকুচি, ঘরদোর ঝাড়পোঁছ। স্বপ্না থাকতে অনেক সুবিধে হত। হাত লাগাত সব কাজে।"

"কেন, তোমার বউমা হাত লাগায় না? সে তো রান্না করতে গিয়ে হাত পুড়িয়ে বসে আছে। কেন যে উননের কাছে যেতে দাও ওকে! কাটাকুটি, জোগাড় করে দিতে বলতেই তো পার। বাপের বাড়িতে রান্নাবাড়া কিছুই করেনি। এখানে এসে ওস্তাদি দেখাচ্ছে!"

মা খানিকক্ষণ চুপ করেছিল। একটু পরে ঝিমানো গলায় বলল, "আমি বউমাকে উননের কাছে যেতে বারণ করি। সেদিন শুনল না। বলল, 'আপনার বিধবা টাইপের রান্না আমার ভাল লাগে না।' মাছটা নিজেই ভাজতে গেল। তেল ছিটকে ওই কাণ্ড!"

খেতে খেতে কান গরম হয়ে যাচ্ছিল বাপির। ডলি এত নিষ্ঠুর কেন? মা বেচারি মাছ, মাংস, ডিম, পেঁয়াজ কিচ্ছু খায় না। অথচ কত যত্ন করে রেঁধে দেয় বাপিদের। তাকে কি না রান্না নিয়ে খোঁটা দিচ্ছে! গত রাতে ডলির সঙ্গে ঝগড়া করবে, ঠিক করে নিয়েছিল বাপি। মশারি তুলে বিছানায় এসে দেখে, ডলি অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ঘুমন্ত অবস্থায় ডলিকে যা দেখতে লাগে, ডেকে ঝগড়া করার কথা ভাবাই যায় না! ওর পাশে চুপটি করে শুয়ে পড়েছিল। ভেবেছিল, সকাল হলে ডলিকে বুঝিয়ে বলবে...কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল বাপি। হয়তো তখন ভোর রাত, ডলির গরম শ্বাস প্রশ্বাসে ঘুম গেল বাপির। এই প্রথম ডলি নিজে থেকে জড়িয়ে ধরেছে বাপিকে। আদর চাইছে। ঘুমের চটকা ভেঙে গিয়েছিল তখনই। মেয়ের আজ কী হল হঠাৎ! অন্যদিন তো এমন ভাব করে থাকে, ওসব না করলেও বিবাহিত জীবন চালানো যায়। ডলির শরীরের চাহিদার সঙ্গে নিজেকে জোগান দিতে দিতে ওই উত্তেজনা ঘন মুহূর্তে বাপির একটা মারাত্মক কথা খেয়াল পড়ে, কন্ডোম ফুরিয়েছে! ডলির শরীর থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছিল বাপি। ঘষা আদুরে গলায় ডলি বলল, "কী হল!" বাপি কারণটা বলল। সঙ্গে সঙ্গে ডলির ঘুম এলানো ভাবটা উধাও। উঠে বসল বিছানায়। আদরকালীন ডলির নাইটি খুলে ফেলেছিল বাপি। খোলা মোম শরীরে তুলনাহীন দু'টো বুক। চোখ মোমবাতির মতো জ্বলছে, "কেন নেই কন্ডোম?"

"কিনতে ভুলে গিয়েছি। খেয়াল ছিল না।"

আচমকাই থেমে গেল ডলি। মেঘ সরে গেলে চাঁদ যেমন হেসে ওঠে, সেরকম হেসে বলে উঠল, "অ্যাই, বুলবুলির দেওয়া প্যাকেটটা আছে না? নিয়ে এসো।" সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আগুন নিভে গেল বাপির। সেই নির্লজ্জ মেয়েটার কথা বলছে ডলি। কনে বিদায়ের সময় বুলবুলির দেওয়া রঙিন কাগজে মোড়া প্যাকেটটা খোলার পর কন্ডোমের প্যাকেট দেখে, বর বউ দু'জনেই হাঁ। সেই সময় ঘরে ঢুকে পড়েছিল দিদি। বাপি লুকিয়ে ফেলেছিল প্যাকেটটা। ভীষণ অপমানিত বোধ করেছিল সেদিন। ডলির বন্ধু তার সঙ্গে এত নোংরা ইয়ার্কি করল! বাপিকে এতটাই লো কোয়ালিটির মনে করে! আলমারির লকারে প্যাকেটগুলো তুলে রেখেছিল বাপি। খুব ইচ্ছে ছিল, বুলবুলির হাতে ওগুলো ফেরত দিয়ে বলবে, 'এই ধরনের ইয়ার্কি আমার সঙ্গে আর কোনওদিন কোরো না।' বাপি জানে, এই কাজটা করতেও তার রুচিতে বাধবে। ওই প্যাকেটগুলো বাপির অপমান! ডলি তাড়া দিচ্ছিল, "যাও, নিয়ে এসো। বসে আছ কেন!" নিরুপায় হয়ে বুলবুলির দেওয়া প্যাকেট ব্যবহার করল বাপি এবং বুঝতে পারল, মেয়েটাকে আর কোনওদিনই দু' কথা শোনানো যাবে না! ওসব করাকালীন তাই খানিকটা অন্যমনস্ক ছিল বাপি। ডলি টের পায়নি। ওর চাহিদা ছিল তুঙ্গে, সহজেই ঠান্ডা হল। তৃপ্তির তোড়ে আরামের নানা শব্দের সঙ্গে দু'টো খুব খারাপ গালাগাল দিয়ে ফেলল ডলি! ভীষণ কানে লেগেছিল বাপির। অত সুন্দর মুখে এত খারাপ ভাষা মানায় না, তা সে যতই রাতের অন্ধকার ঘর হোক।

খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল ডলি। বাপির ঘুম আসছিল না। ডলির পাড়ার পরিবেশ নিশ্চয়ই খুব খারাপ। জামাইবাবুর কথা তা হলে ঠিক। শিবেনদা যখন বলেছিল, বুলবুলির কেসটা মাথায় ছিল না। কাল রাতে মনে পড়ে গেল। বুলবুলির গিফ্‌ট, ডলির আর এক বন্ধু শান্তা বড্ডা গায়ে পড়ছিল বাসরঘরে। বেখেয়ালে ডলির মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে নোংরা গালাগাল। সব মিলিয়ে প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে, কোন পরিবেশে মানুষ হয়েছে ডলি। পাড়াটা কতটা খারাপ জানতেই হবে বাপিকে। আজ রবিবার। জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়েছে বাড়ি থেকে। মা, ডলিকে বলেছে, "যাই, দিদির বাড়ি ঘুরে আসি। শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পর থেকে খোঁজ নিইনি।"

ক্রমশ

অলঙ্করণ: নির্মলেন্দু মণ্ডল

বাপি এখন যাচ্ছে ডলিদের পাড়া সম্বন্ধে

পর্ব ৪

শিবেনদার না বলা অংশটা জানতে। ভাব করবে এমন, যেন দিদিকে দেখতে এসেছে! লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে কানাইপুরে ঢুকে পড়েছে বাপি। দিদির বাড়ি ঢোকার আগে ভাল দোকান থেকে মিষ্টি নিতে হবে। কানাইপুরে মিত্র সুইটস-এর নাম আছে। দিদির শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে যেতে হয়। মিষ্টি কিনে রিকশা চেপে দিদির বাড়ির সামনে নামল। বাড়িটা দোতলা। রাস্তাটা ইটপাতা গলি হলেও, বেশ চওড়া। গলির ধারে ক্রিকেট খেলছিল ছোট-ছোট কয়েকটা ছেলে। বাচ্চাগুলোর মধ্যে ভাগ্নেকে দেখতে পেল বাপি। এই ক'দিনেই এখানকার ছেলেদের সঙ্গে দিব্যি মিশে গিয়েছে। এতে নিশ্চিন্ত হওয়ার কথা বাপির, হয়েওছে। একই সঙ্গে খারাপ লাগছে দেখে, ছেলেটা এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেল মামার বাড়ির কথা!

ব্যাট করছিল টুকাই। এমনই মশগুল, মামাকে খেয়াল করেনি। বাপি গিয়ে ওর কাঁধে হাত রাখল। মুখ তুলে তাকাল টুকাই। মামাকে দেখে একগাল হাসল। তারপর নির্দ্বিধায় হাতের ব্যাটটা অন্য বন্ধুকে দিয়ে, মামার আঙুল ধরে বাড়ির গেটের দিকে পা বাড়াল। বিয়েতে অসুখী হওয়া দিদিকে শ্বশুরবাড়িতে ঘর মুছতে অথবা বাসন ধুতে দেখবে, এমনটাই কল্পনা করেছিল বাপি। যেমন সব ভাই ভাবে। কিন্তু মিলল না। ভাগ্নের হাত ধরে বসার ঘরে এসে বাপি দেখে, দিদি সোফায় বসে, হাতে থালা ধরে লুচি খাচ্ছে। উল্টো দিকের সোফায় ওর ননদ। দু'জনেরই হাসি-হাসি মুখ। দিদির শাড়িটা মনে হচ্ছে নতুন।

বাপিকে দেখে চমকে উঠল দিদি, "কী রে, তুই হঠাৎ!"

বাপি হাসল। দিদির ননদ খুশি-খুশি মুখ করে তাকিয়ে আছে। মিষ্টির প্যাকেটসুদ্ধ ক্যারিব্যাগটা বাপি তার দিকে এগিয়ে ধরল।

ননদ বলল, "আমাকে নয়, মাকে গিয়ে দাও।"

দিদি বলল, "আয় আমার সঙ্গে।"

বাপি অনুসরণ করল দিদিকে। দিদির শাশুড়ি রান্নাঘরে ছিলেন। বাপিকে দেখে, আঁচলে হাত মুছতে-মুছতে বেরিয়ে এলেন হাসিমুখে, "কেমন আছ বাবা? মা ভাল আছেন?"

ঘাড় হেলাল বাপি। লক্ষ করে, নতুন বউয়ের কথা জিজ্ঞেস করলেন না মহিলা। বিয়েতে যাননি, যদি কথাটা তোলে বাপি।

"দিদির বাড়ি দুপুরে দু' মুঠো খেয়ে যাবে কিন্তু," দিদির শাশুড়ির গলায় আন্তরিকতা ঝরে পড়ল। এই মহিলার আসল রূপ এটা নয়। দিদির কাছে শুনেছে বাপি। অ্যাক্টিং বেশ ভালই জানেন দেখা যাচ্ছে। বাপি রাজি হল না দুপুরে খেতে, "মা'কে বলা নেই। রান্না চাপিয়ে দিয়েছে। অন্য একদিন এসে খাব'খন।"

রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন মহিলা। বাপি হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। দিদি ইশারায় বাপিকে ডাকল। ওরা এসে বসল দিদির

ঘরে। দিদি বসেছে বিছানায়, বাপি চেয়ারে। আকডাঙার বাড়ির যে-কোনও ঘরের চেয়ে এসব ঘর ঢের বেশি সাজানো-গোছানো। টুকাইকে ফের খেলতে পাঠিয়ে দিয়েছে দিদি। বাপিকে বলল, "কী ব্যাপার, তুই হঠাৎ খোঁজ নিতে চলে এলি! ও বাড়ির সব খবর ভাল তো?"

এখানে আসার আসল উদ্দেশ্য বলা যাবে না। বাপি বলল, "হ্যাঁ, ঠিকই আছে। আজ ছুটি, চলে এলাম তোদের দেখতে।"

দিদির হাসি মুখ দেখে মনে হচ্ছে, বিশ্বাস করল কথাটা। বাপি এবার প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গটা তুলল, "জামাইবাবু কোথায় রে, দেখছি না!"

"ওর কথা আর বলিস না, বাড়ি থাকে কতক্ষণ! বন্ধুদের বাড়িতে আড্ডা মেরে বেড়াচ্ছে," গলার সুর পাল্টাল দিদি, "দোষ দেওয়া যায় না, কতদিন অন্তর দেখা হয় বন্ধুদের সঙ্গে।"

পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল দিদির ননদ। হাতে জলখাবারের প্লেট, "নাও, খেয়ে নাও। পরে আরও লুচি দিচ্ছি। ভাজা হচ্ছে।"

"না না, আর না," প্লেট হাতে নিয়ে বলল বাপি। খেতে শুরু করে দিল। খিদেও পেয়েছিল।

দিদি বলতে থাকল, "তোর শিবেনদাকে বলেছি,

পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল দিদির ননদ। হাতে জলখাবারের প্লেট, "নাও, খেয়ে নাও। পরে আরও লুচি দিচ্ছি। ভাজা হচ্ছে।"

আমার জন্য একটা ভাড়াবাড়ি ঠিক করে দিতে।"

"কেন?" খেতে-খেতে কপাল কুঁচকে জানতে চাইল বাপি।

"ও চলে গেলে, এরা আমায় এ বাড়িতে টিকতে দেবে না। এখন বাপের বাড়ির রাস্তাও বন্ধ। বাড়িভাড়া করেই থাকতে হবে।"

খাবারটা বিস্বাদ লাগছিল বাপির। সাজিয়ে দেওয়া এই প্লেট আসলে ভান। এ বাড়িতে দিদিরই জায়গা নেই। বাপিও বলতে পারছে না, কে বলেছে, তোর বাপের বাড়ির রাস্তা বন্ধ? কালই চল ও বাড়িতে। ওখানে গেলে ডলি-দিদির ঝামেলা শুরু হয়ে যাবে। দিদি অবশ্য ও বাড়ি যাওয়ার কথা মাথাতেই আনছে না।

"বাড়ি একটা পাওয়া গিয়েছে। ভাড়াও বেশি না। বাড়িওলা গাঁইগুঁই করছে, আমি আর টুকাই থাকব বলে। বলছে, একজন পুরুষমানুষ অথবা বয়স্কা গার্জেন থাকলে ভাল হয়। ভাবছি, মাকে এনে রাখব।"

খাওয়া একেবারেই থেমে গেল বাপির, "তার মানে! মা নিজের বাড়ি ছেড়ে তোর কাছে থাকবে?"

মলিন হেসে দিদি বলল, "নিজের বাড়ি বলছিস কেন? ওটাও তো ভাড়াবাড়ি।"

"ঠিক আছে, বাড়ি না হোক, সংসারটা নিজের।" আবার একই রকম হাসল দিদি। হাসির মধ্যে লুকিয়ে আছে অনেক কথা। সেসব না বলে, দিদি উল্টো পথে হাঁটল, "মা যেমন তোর, আমারও। মাকে বলব, আমার কাছে এসে থাকতে। তারপর মা যা ঠিক করবে..."

বিয়ের পর বাপির এখন আর সেই জোর নেই, মাকে আটকে রাখবে। ডলির প্রতি মা সন্তুষ্ট নয়। কাল রাতের পর থেকে বাপিও ডলির কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছে। কারণটা মা-দিদিকে বলা সম্ভব নয়। অর্থাৎ যা দাঁড়াল, বাপি এখন একা! মা, দিদি, বউ, টুকাই সবাই তার কাছ

খুস্কি বিহীন স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুন্দর চুলের জন্য
আর্নিকাপ্লাস-ট্রায়োফার
ট্রিপল অ্যাকশন হোমিও হেয়ার থেরাপি
ট্রায়োফার ট্যাবলেট ঃ হেয়ার অ্যান্ড স্ক্যাল্প টনিক- কেশ সমস্যার মূল কারণগুলি (লিভার ও পেটের গোলমালে, কোষ্ঠবদ্ধতা ও অ্যানিমিয়া) ভেতর থেকে দূর করতে ও অপরিবর্তিত বয়সে চুল পাকায় এটি বিশেষ কার্যকরী।
আর্নিকাপ্লাস ঃ হোমিও হেয়ার ভাইট্যালাইজার - স্নানের পরে ও রাতে শোবার আগে স্ক্যাল্পে লাগান, যা চুলের গোড়ায় পুষ্টি জোগায়, চুলের বৃদ্ধিতে ও নুতন চুল গজাতে সাহায্য করে। চুলের গোড়া শক্ত করে, অতিরিক্ত চুলপড়া বন্ধ করে, খুস্কি রোধ করে।

100ml+50Tabs M.R.P.-₹125/-
'হেলদি লিভার হেলদি স্কিন'
লিভোসিন
লিভার অ্যান্ড স্কিন হেলথ ক্যাপসুল
প্রকৃতির দান হার্বাল অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস, লিভার কারেকটিভস্ ও ব্লাড পিউরিফায়ারস্ সমৃদ্ধ ক্যাপসুল যা লিভারকে রিজুভিনেট ও ব্লাড পিউরিফাই করে ভেতর থেকে ত্বকের স্বাস্থ্য সতেজ রাখে। মেটাবলিজম নিয়ন্ত্রন ক'রে ওবেসিটি, প্রিম্যাচিওর এজিং ও রিংকল্স প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে।
সকাল ও রাতে শোবার আগে একগ্লাস জলসহ একটি করে লিভোসিন ক্যাপসুল খান আর ত্বকের স্বাস্থ্য সতেজ রাখুন।

20 Caps M.R.P.-₹ 80/-
স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য রক্ষায় লিভার আর লিভারের সুরক্ষায়
লিভোসিন
লিভার অ্যান্ড স্টম্যাক টনিক
লিভার ও স্টম্যাকের কার্যক্ষমতা বাড়ায়। গ্যাস, অম্বল, বদহজম তাড়ায়। বুকজ্বালা সারায়, লিভার ও স্বাস্থ্য সতেজ রাখে। প্রতিদিন সকালে ও রাতে শোবার আগে দু'চামচ ক'রে লিভোসিন এক গ্লাস জলসহ সেবন করুন আর সুস্থ, সতেজ থাকুন।

250 ml - M.R.P. 75/-
450 ml - M.R.P. 110/-

Dr.G.P. Sarkar
Allen's
Business Associates Ph. Mr. P. Rakshit-09434007123
Available all Leading Medical Shop
M.H.L. No. 09830111222, Mr. D. Rakshit-9836007075
Email-sss@allensindia.com

থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। বাপির অপরাধটা কী? চোখের কোনটা একটু জ্বালা-জ্বালা করে উঠল! দিদি ফের বলল, “লোকে বলে বটে, সংসার মেয়েদের। আসলে কিন্তু ছেলেদেরই। বাবা যখন বাড়ির কর্তা ছিল, মা কর্ত্রী। এখন তুই কর্তা, তোর বউ বাড়ির মাথা হয়েছে, কেন সহ্য করবে!”
দিদির কথার সুরের মধ্যে কোথায় যেন বাবার ধরন টের পায় বাপি। ১৫ বছর বয়সের মধ্যে বাবাকে হারালেও, অনেক স্মৃতি আছে মনে। স্মৃতিগুলোকে জ্যান্ত রাখে মা। মুড থাকলে বাবার সম্বন্ধে অনেক গল্প করে। বাবা ছিলেন এককথার মানুষ। যা ঠিক মনে করতেন, মুখের উপর বলে দিতে বাধত না। শত অভাবেও কারও কাছে হাত পাতেননি। তেল মারা, আপস রফায় যাওয়া ধাতে ছিল না বাবার। লোকে ধরে নেয়, বাবার গুণ কিছুটা হলেও, ছেলে পাবে। দেখা যাচ্ছে, মেয়ে পেয়েছে। বাপি তা হলে কার ধরন পেল? মায়ের সঙ্গেও তার স্বভাবের মিল নেই।
“যা, হাত-মুখটা ধুয়ে আয়।”
দিদির কথা শুনে উঠে পড়ল বাপি। বেসিনের খানিকটা পিছনে রান্নাঘর। দিদির শাশুড়ি ওখান থেকে বললেন, “সে কী গো, হয়ে গেল খাওয়া! আমি তো আরও ক’টা লুচি পাঠাচ্ছিলাম। তোমার দিদিও তেমনই! কোথায় ভাইকে বসিয়ে ভাল করে খাওয়াবে, তা না, খালি কথাই বলে গেল।”
উত্তরে বাপি কিছু বলতে যাবে, শুনতে পেল শিবেনদার গলা। দিদির সঙ্গে এতক্ষণ যা কথা হল, ভুলে গেল বাপি! শিবেনদার জন্যই আজ এ বাড়িতে আসা। তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে দিদির ঘরে এল বাপি। শিবেনদার গলা শুনে দিদি বেরিয়ে গেল। যাওয়ার সময় বলল, “ও তোকে দুপুরে খেতে বলবে, খাবি না। মা, মিঠু দু’জনেই তোকে

> শিবেনদা বলল, “দেখো ভাই, মা তোমাদের। তোমরা ভাই-বোন মিলে মীমাংসা করে নাও।”

নিয়ে খুব ঢং করবে ওর সামনে।” সংসারটা যে এত ক্যাচালের জায়গা, বিয়ের আগে জানত না বাপি। মেয়েরা পারেও বটে! যাকে অপছন্দ করে, দিব্যি হেসে-হেসে কথাও বলতে পারে। আজ যেমন এ বাড়িতে ঢুকেই দেখেছিল, দিদি আর ননদ মিঠু, বন্ধুর মতো গল্প করছে। হঠাৎ দেখলে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না, ওদের সম্পর্ক কতটা খারাপ!
কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরে ঢুকল শিবেনদা। বাপিকে দেখে বলল, “কী খবর ব্রাদার ইন ল, এতদিন পর দিদির কথা মনে পড়ল!”
“আসব-আসব করে আসা হয় না। আজ ছুটির দিন দেখে জোর করে চলে এলাম,” বহু যত্নে সাজানো কথাগুলো বলল বাপি।
প্লাস্টিকের টুল টেনে শিবেনদা বসল বাপির সামনে, “স্বপ্না বলছিল, তুমি নাকি দুপুরে খাবে না বলেছ?”
দিদির তৎপরতা দেখে অবাক হয়ে যায় বাপি, এর মধ্যেই নিজের ইচ্ছেটা শিবেনদার কানে তুলে দিয়েছে! বাপি সায় দিয়ে বলল, “দুপুরের খাওয়ার কথা মাকে বলা নেই। অপেক্ষা করবে।”
“সমস্যা তো মাকে নিয়ে নয়, বউকে নিয়ে। ডলিকে সঙ্গে নিয়ে এলে পারতে।”
মিথ্যে করে লজ্জা পাওয়ার হাসি হাসল বাপি, “এসেছি অনেক আগে। আপনার সঙ্গে দেখা করব বলে বসে আছি।”
কপালে ঠিক দু’টো ভাঁজ পড়ল শিবেনদার। সতর্ক গলায় জানতে চাইল, “কোনও বিশেষ দরকার?”
ঘুরপথে প্রসঙ্গে আসার চেষ্টা করল বাপি, “একটা ব্যাপার খুব অবাক লেগেছে। কারণটা মা-দিদির কাছে জানতে চাইনি। আপনার কাছেই শুনব।”
“কোন ব্যাপারটা বলো তো?” অবাক হয়ে জানতে চাইল শিবেনদা।
“সেদিন হঠাৎ কী হল, দিদিকে নিয়ে চলে এলেন? একদিন পরেও তো নিয়ে আসা যেত। আমি যখন অফিস গেলাম, তখনও কিছু বললেন না!”
শিবেনদা মাথা নিচু করে আছে। বাপি বুঝতে পারল, জামাইবাবু ভাবছে, সঠিক কারণটা বলা উচিত হবে কি না!
“তোমার দিদি এমনভাবে ধরল, বলল, আজই আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলো।”
পরিষ্কার দিদির কোর্টে বল ঠেলে দিল শিবেনদা। জামাইবাবুকে আর একটু উসকে দেওয়ার জন্য বাপি বলল, “দিদি বলছিল, এবার থেকে ভাড়াবাড়িতে থাকবে। মাকে আনিয়ে নেবে ও বাড়ি থেকে। এটা কি ঠিক হচ্ছে শিবেনদা? মা হঠাৎ নিজের জায়গা ছাড়তে যাবে কেন?”
শিবেনদা হাত দু’টো তুলে বলল, “দেখো ভাই, মা তোমাদের। তোমরা ভাই-বোন মিলে মীমাংসা করে নাও। আমি এসবের মধ্যে নেই। স্বপ্না আমাকে ঘর দেখে দিতে বলেছে, দিয়েছি।”
বড় একটা শ্বাস ফেলে বাপি শিবেনের দিকে তাকাল, “আমার বিয়ে করাটাই বোধ হয় ভুল

হয়ে গেল।”
অল্প হেসে শিবেন জিজ্ঞেস করল, “কেন একথা বলছ? বিয়ে তো একদিন করতেই হত।”
“তা হত। কিন্তু ডলিকে বিয়ে করাটা ঠিক হয়নি।”
কথার পিঠে কোনও উত্তর করল না শিবেনদা। খানিক চুপ থাকার পর, প্রসঙ্গ বদলে বলল, “তুমি তা হলে দুপুরে খাচ্ছ না?”
অনির্দিষ্ট দৃষ্টি নিয়ে মাথা নাড়ে বাপি।
“চলো, তা হলে উঠে পড়া যাক। কারণ, আর দেরি করলে মা তোমাকে খাইয়ে ছাড়বে।”
বাপি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জামাইবাবুকে বলল, “আপনার সঙ্গে আরও কয়েকটা ব্যাপারে পরামর্শ করার ছিল।”
“রাস্তায় যেতে-যেতে হবে,” দরজার দিকে এগোল শিবেন।
বাপি অনুসরণ করল।
বাড়ি থেকে বেরিয়ে গলি ধরে হেঁটে যাচ্ছে শালা, জামাইবাবু। কেউ কোনও কথা বলছে না। বড় রাস্তা এসে যাচ্ছে দেখে বাপি বলে উঠল, “রথতলা কলোনি সম্বন্ধে আমাকে আর কিছু খবর দিতে পারবেন?”
দাঁড়িয়ে পড়ল শিবেন। বাপির মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে বলল, “আজ হঠাৎ তোমাকে আসতে দেখেই মনে হয়েছিল, রথতলা কলোনির ব্যাপারেই জানতে এসেছ। পাড়াটা বদনামী পাড়া। আমি না বললেও, অন্য সোর্সে কিছু কথা তোমার কানে আসবেই। রথতলা কলোনি একসময় রেড লাইট এলাকা ছিল!”
বাপির হাঁটুতে হঠাৎ কে যেন কাতান চালিয়ে দিল! পা'টা নেই মনে হচ্ছে। খাঁ-খাঁ করে ওঠে বুক। জামাইবাবু আরও কিছু বলে যাচ্ছিল, কথাগুলো কানে ঢুকছিল না বাপির। আপ্রাণ চেষ্টা করল শোনার। অল্প-অল্প কানে এল। যেন মাঝনদীতে ভাসা নৌকার যাত্রী ঘাটের মানুষকে কিছু বলছে...“তোমাদের বাড়ি থেকে ফেরার পর রথতলা কলোনি সম্বন্ধে খোঁজ নিলাম। এখন অনেক পাল্টে গিয়েছে। নতুন ফ্যামিলি এসেছে প্রচুর। এমনিতে এলাকাটা আনরেজিস্টার্ড ছিল। প্রায়ই রেড করত পুলিশ। এখন বোধ হয় আর ওসব কাজ-কারবার চলে না।”
বাপির ইচ্ছে করে জিজ্ঞেস করতে, ‘বোধ হয়’ কেন বলছেন? খবর যখন নিয়েছেন, ভাল করেই নিতে পারতেন। কিন্তু ভাবনা কথা হয়ে বেরোয় না। জামাইবাবু ফের বলল, “ওসব চিন্তা মাথা থেকে তাড়াও, ডলিদের ফ্যামিলি হয়তো ওপাড়ায় পরে এসেছে। এখন এসব ভেবে আর লাভ নেই। ডলি এখন তোমাদের বাড়ির মেয়ে, তোমার বউ। তোমাদের পাড়াটাই ওর পাড়া। মানিয়ে-গুছিয়ে নিজের মতো করে নাও।”
‘চলি’ বা ‘আসি’ কিছু না বলেই বাপি বড় রাস্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে হাঁটতে শুরু করল। হাঁটছে না ভাসছে, নিজেই বুঝে উঠতে পারছে না। পায়ের সাড় এখনও ফিরে আসেনি!
কানাইপুর থেকে ট্রেনে বীরনগর এসে পৌঁছল বাপি। শীতের রবিবার বলে কথা, স্টেশনে রঙিন পোশাকের মানুষ। ছুটির মেজাজ। ভিড়ের মধ্যে একা-একা মুখ শুকিয়ে ঘুরছে বাপি। প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে রথতলা কলোনি যাওয়ার ইচ্ছে

ডলিদের ফ্যামিলি হয়তো ও পাড়ায় পরে এসেছে। এখন ভেবে লাভ নেই। ডলি এখন তোমার বউ।

থাকলেও, সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। ডলির বাবার সঙ্গে হয়তো দেখা হয়ে গেল, কী বলবে তখন? আপ-এ দু'টো লোকাল চলে গিয়েছে। প্ল্যাটফর্ম এখন ফাঁকা-ফাঁকা। তিনপেয়ে একটা কুকুর লেংচে-লেংচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আন্ডারগ্রাউন্ড সিঁড়ির পাশে সিগারেট গুমটিতে চোখ পড়ে বাপির। দোকানদারের চেহারাটা ভালমানুষ গোছের। সামনে কোনও কাস্টমার নেই। এই সুযোগে দোকানটা গোছগাছ করে নিচ্ছে। পায়ে-পায়ে সামনে গিয়ে দাঁড়ায় বাপি। সিগারেটের নেশা নেই, তবু একটা উইলস ফ্লেক চায়। দড়ি বাঁধা লাইটারে সিগারেট ধরিয়ে লম্বা টান মারে। মাথাটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। ধোঁয়া ছেড়ে বাপি দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল, “দাদা, এখানে রথতলা কলোনিটা কোথায়?”
ওর মুখটা ভাল করে দেখে দোকানদার আঙুল তুলল সঠিক দিকে।
সিগারেটে আর একটা টান দিল বাপি। নার্ভাস ভাবটা একটু যেন কাটছে। যে-কোনও খারাপ কথা শোনার জন্য সে এখন প্রস্তুত। ফের জানতে চাইল, “ওটা কি খারাপ পাড়া, দাদা?”
মাথা নিচু রেখে, ঘাড় উপর-নীচ করে দোকানদার।
বাপির পরের প্রশ্ন, “পাড়াটা কতটা জুড়ে?”
“ওসব চালাঘরের যত বাড়ি দেখছেন, টোটালটা। তবে কাজ-কারবার যা কিছু হয়, সব রাতে। সরকারি পারমিশন নেই তো!”
বাপির আর কিছুই জানার নেই। পাথরের মতো শরীরটা নিয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। চোখ রথতলা কলোনির দিকে।
দোকানি এতক্ষণে জিজ্ঞেস করল, “আপনাদের কেউ হারিয়ে গিয়েছে নাকি?”
“মানে!” জিজ্ঞেস করল বাপি।
লোকটা বলল, “পাড়ার বা আত্মীয়র মধ্যে কোনও মেয়ে? পুলিশের কাছে গিয়েও কোনও লাভ হবে না। এপাড়া থেকে প্রচুর টাকা যায়

MASOLIN HERBAL
শুধু মুখের সৌন্দর্যের কথা ভাবেন?
আমরা ভাবি আরও কিছু...

HERBAL MASOLIN®
MULTIPURPOSE
BREAST CARE OIL & CAPSULE
মোহময়ী সৌন্দর্য
হার্বাল ম্যাসোলিন মাল্টিপারপাস বক্ষ মালিশের তৈল ও ক্যাপসুল আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তোলে আর আপনাকে করে পরিপূর্ণা
নতুন উন্নত ফর্মুলা
সকল ঋতুর জন্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াহীন
Unique 5 in 1 Action
নারীর সমস্যা অনেক কিন্তু সমাধান একটাই

MASOLIN-M®
Uterine Tonic
ম্যাসোলিন- এম টনিক মাসের সেই সব বিশেষ দিনগুলোয় সমস্যার সমাধান করে। এখন আপনার প্রতিটি দিন হয়ে উঠুক চিন্তামুক্ত আর আনন্দের।
অনিয়মিত ও অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ, রক্তাল্পতা, সুস্বাস্থ্য গঠন, জরায়ু সংক্রান্ত সমস্যা থেকে মুক্তি দেয়।
ম্যাসোলিন এম টনিক-এর সেবনবিধি : ২ চামচ করে দিনে ২ থেকে ৩ বার, ১-৩ মাস
সকল দোকানে পাওয়া যায়
TRADE HELPLINE :033-2243 5035
e mail: masolinresponse@gmail.com
*For information to Medical Professionals only

থানায়। সেরকম বুঝলে পার্টির দাদাদের...”
বাপির মাথায় আর কোনও কথাই ঢুকছিল না। তবু ভাল, দোকানি তাকে খদ্দের ভাবেনি! ভেবেছে, কোনও হারিয়ে যাওয়া মেয়ের খোঁজে এসেছে। এখানকার একটা মেয়ে যে চলে গিয়েছে বাপিদের বাড়িতে, লোকটা জানে না। বাপি আর কিছুই ভাবতে পারছে না। সিগারেট শেষ হয়েছে অনেকক্ষণ। ভোমরার গোঁ-গোঁ শব্দ চলে এল মাথার চারপাশে। কোথা থেকে এল? দু’-চারবার কালো ভোমরাটাকে দেখল চোখের সামনে উড়ে যেতে। ওটাকে এড়াতে বাপি এগিয়ে গেল আন্ডারগ্রাউন্ড সিঁড়ির দিকে। ডাউন প্ল্যাটফর্মে গিয়ে বাড়ি ফেরার গাড়ি ধরবে।

দুপুর তিনটে। পাড়ায় ফিরে এল বাপি। শীতের বেলা এর মধ্যেই মরে এসেছে। এখনও ভাত খাওয়া হয়নি। খিদের বোধও নেই। ভোমরাটা পিছু ছাড়েনি, ঘুরে যাচ্ছে মাথার চারপাশে। পোকাটার জন্য আগে কিছু ভাবতে পারছে না। থেমে গিয়েছে চিন্তা।
বাড়ি ঢুকতেই মা বলল, “এত বেলা হল! দিদির বাড়ি খেয়ে এলি?”
কোনও উত্তর না দিয়ে ঘরের কোণে চটি ছাড়ল বাপি।
ছেলের চেহারায় চোখ বুলিয়ে সরমা রুক্ষ ভাবটা টের পেয়েছে, “চান করিসনি নাকি?”
কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না বাপির। বাড়ি ঢোকার পর ভোমরার আওয়াজটা একটু যেন কমেছে। বিছানায় গিয়ে বসল বাপি।
একটু দূরত্ব রেখে মুখোমুখি দাঁড়াল সরমা, “খাওয়াও হয়নি মনে হচ্ছে? কোথায় ছিলি এতক্ষণ? স্বপ্না তো না খাইয়ে ছাড়বে না!”
হঠাৎ মুখ তুলে বাপি জানতে চাইল, “ডলি কোথায় গো?”
সরমা বলল, “অনেকক্ষণ বসেছিল তোর অপেক্ষায়। আধ ঘণ্টা হল, খেয়েদেয়ে শুতে গিয়েছে।”
“তুমি খেয়েছ?”
“না, তুই চান করে আয়, একসঙ্গে খেয়ে নেব।”
খিদে পাচ্ছে না। মায়ের জন্যই বিছানা ছেড়ে উঠে স্নান করতে গেল বাপি। কতক্ষণ না খেয়ে বসে থাকবে মা!

চাকরিটা হল না অমিতেশের। ইন্টারভিউ বোর্ড থেকে এই মাত্র বেরিয়ে এসেছে। এখনও ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না! প্রায় মাঝবয়সে এসে এভাবে ফেল করতে হবে, ভাবেনি। পদটার জন্য যে যোগ্যতার দরকার, সারা ভারত খুঁজলে সেরকম যোগ্যতাওয়ালা লোক পঁচিশটার বেশি পাওয়া যাবে না। এদের সবাই যে চাকরিটার জন্য আগ্রহী হবে, তা-ও নয়। চল্লিশের পর মানুষ যে-কোনও একটা চাকরিতে সেট্‌লও করে যায়। খুব বড় কোনও অফার পেলে আলাদা কথা। সেরকম আকর্ষক অফার এই কলেজ দেয়নি। দেওয়ার কথাও নয়, সরকারি কলেজ, বাঁধা মাইনে। অমিতেশ ধরেই নিয়েছিল, এই পোস্টের জন্য পাঁচজনের বেশি ক্যান্ডিডেট এরা পাবে না। যোগ্যতার নিরিখে তারা থাকবে অমিতেশের অনেক নীচে। অমিতেশ তো বিশেষ একটা তাগিদ থেকে এই অল্প মাইনের চাকরিটা করতে চেয়েছে। অন্য সুযোগ-সুবিধেও বিশেষ কিছু নেই। এর চেয়ে অনেক দামি চাকরিতে অমিতেশ এখন কর্মরত। মনে করলে আরও দামি চাকরি পেতে পারে। বেশ ক’টা কোম্পানি সেরকম অফার তাকে দিয়ে রেখেছে। অমিতেশ আন্তরিকভাবে চেয়েছিল কলেজে পড়াতে। তাকে যে নেওয়াই হবে না, ভাবতে পারেনি! বেশ একটা ফুর্তি নিয়ে ইন্টারভিউ রুমে ঢুকে ছিল অমিতেশ। ধরে নিয়েছিল বোর্ডে চেনা কেউ থাকবেই, আর্ট কলেজের কোনও বন্ধু অথবা প্রোফেসর। চেনা-জানা কোনও শিল্পীর সঙ্গেও দেখা হয়ে যেতে পারে। স্পেশালাইজ়ডদের ওয়র্ল্ড তো ক্রমশ ছোট হয়ে আসে। অচেনা প্রায় কেউই থাকে না। ঘরে ঢুকে থমকে গিয়েছিল, বোর্ডের ছ’জনই অপরিচিত! আগে কখনও দেখেনি। তবু আশায় বুক বেঁধেছিল, এরা হয়তো তাকে চেনে। অথবা জানে অমিতেশের সম্বন্ধে। না, সেরকম কোনও সম্ভাষণ সে পায়নি। গম্ভীর মুখে তাদের একজন ওকে চেয়ার দেখিয়েছিল। অমিতেশ বসল। নিজের সি ভি বের করে অফিশিয়ালদের দিল। কলকাতার আলসে আবহাওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তারা নিল সেটা। অত্যন্ত অনাগ্রহের সঙ্গে ফাইলটা উল্টাতে থাকল। অমিতেশের তখনই সন্দেহ হয়েছিল, গাড়ি ঠিক লাইনে গড়াচ্ছে না! তারপর যেসব প্রশ্ন আসতে লাগল, নেহাতই দায়সারা। ওল্ড মাস্টার্সদের মধ্যে কার ছবি তার সবচেয়ে ভাল লাগে এবং কেন? সাম্প্রতিক চিত্রকলা নিয়ে অমিতেশের কী মন? মিক্সড মিডিয়ামকে অমিতেশ কী চোখে দেখে? উত্তরগুলো আর্ট নিয়ে সামান্য পড়াশোনা লোকমাত্রই দিতে পারবে। অচিরেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল অমিতেশ। ওরাও বোধ হয় সেটা বুঝতে পারল। তখন প্রশ্নোত্তরের আভাসে বুঝিয়ে দিল, কেন তাকে এই পদে নেওয়া হবে না।
“আপনি অত বড় চাকরি ছেড়ে, এই সামান্য স্যালারিতে কেন আসবেন বুঝতে পারছি না!”
“শিক্ষকতা করা আমার বহুদিনের ইচ্ছে। টাকাটা ফ্যাক্টর নয়।”
“তাই যদি হবে, এতদিন অ্যাড এজেন্সিতে কাটালেন কেন? যাঁরা টিচিংয়ে থাকবেন বলে ঠিক করেছিলেন, তাঁরা অন্য চাকরি না নিয়ে কলকাতার প্রাইভেট কলেজে পড়ান। অ্যাকাডেমিকালি আর্টের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ বেশি। আপনার বায়োডেটায় সেটারই অভাব।”
অমিতেশের বলতে ইচ্ছে করছিল, তাদের মধ্যে ক’জন ফাইন আর্টসে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট? কে তার মতো ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড উইনার? এসব যোগ্যতা কি শিক্ষকতার জন্য যথেষ্ট নয়...জিজ্ঞেস করেনি। এসব কথা তো সি ভি-তেই উল্লেখ করা আছে।
পেপারস গুছিয়ে চেয়ারের পাশে রাখা নিজের লাগেজ ব্যাগে ঢুকিয়েছিল অমিতেশ। তখন একজন জিজ্ঞেস করল, “আপনি কি স্ট্রেট এয়ারপোর্ট থেকে এখানে এলেন?”
“না। ট্রেনে এসেছি।”
“নিশ্চয়ই রাজধানী। আজই ফিরবেন, নাকি এখানে কোনও রিলেটিভের বাড়িতে...”
“কলকাতার কাছেই আমার বাড়ি। চাকরিটা হলে ভাল হত। অনেকদিন বাড়িছাড়া হয়ে আছি।”
ছ’জনের মধ্যে কোনও ভাববিকার দেখা গেল না। কোনও ভাস্করের গড়া ছ’টি মূর্তি যেন তারা! ব্যাগ তুলে বেরিয়ে এসেছিল অমিতেশ। ভীষণ কনফিউজ়ড লাগছিল, কেন তাকে নেওয়া হল না ফাইন আর্টসের ডিপার্টমেন্টাল হেড হিসেবে? কনফিউশন এখনও কাটেনি। না নেওয়ার কোনও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে না। বরং বলা যেতে পারে তার মতো ক্যান্ডিডেট পেয়ে এই কলেজের বর্তে যাওয়া উচিত! তবু নেওয়া হল না। একেবারে শিওর হয়ে দিল্লি থেকে গাড়ি ধরেছিল অমিতেশ। এই কলেজে অ্যাপ্লাই করার আগে নবারুণদার সঙ্গে ফোনে আলোচনা করেছিল। এখন

কলকাতায় তিনজন নামী শিল্পীর মধ্যে নবারুণদা একজন। অমিতেশ কলকাতার কলেজে পড়াতে চায় শুনে, ভীষণ উচ্ছ্বাসে বলেছিল, "অ্যাপ্লাই করে দে। তোকে পাওয়া তো যে-কোনও আর্ট কলেজের গর্ব। তা ছাড়া তুই ফিরে আসছিস, এটা কলকাতার শিল্পীমহলের কাছে বিরাট খবর।" কিন্তু কোথায় কী, এরা তো পাত্তাই দিল না! কলেজ থেকে বেরিয়ে বড় করে হাঁফ ছাড়ল অমিতেশ। দমটা যেন ধরে রেখেছিল দিল্লি থেকে। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ভাবল, কোথায় যাবে এখন? দিল্লি থেকে ট্রেন ধরার আগে পর্যন্ত ঠিক ছিল না কলকাতায় এসে কোথায় উঠবে। তখন শুধু মাথায় একটাই চিন্তা, ভিন্ন পরিবেশ, নতুন চাকরি। ইন্টারভিউ উতরোতে পারবে না, একবারের জন্যও ভাবেনি। ভেবেছিল, চাকরিটা কলকাতায় থেকে করবে, নাকি কানাইপুরের বাড়ি থেকে ডেলি-প্যাসেঞ্জারি? সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না। সেই কারণেই কানাইপুরের বাড়িতে জানায়নি কলকাতায় আসছে। বাড়ির লোক আশা করে বসে থাকত, ছেলে যখন পশ্চিমবঙ্গেই ফিরছে, নিশ্চয়ই বাড়িতে থাকবে। তারপর আসত অমোঘ প্রশ্ন, ছেলের বউ এবং দুই পুত্রসন্তান কেন থাকবে দিল্লিতে? ওরাও চলে আসুক। সে যে প্রোফেসরির জন্য কলকাতার কলেজে দরখাস্ত করেছে, স্ত্রী নন্দাকে তা জানায়নি অমিতেশ। পোস্টে আসা ইন্টারভিউয়ের চিঠি হাতে দিয়ে নন্দা জানতে চেয়েছিল, "তুমি অন্য কোথাও জয়েন করবে নাকি? এজেন্সির চাকরিটা ছেড়ে দেবে?" উত্তর না দিয়ে খাম খুলতে ব্যস্ত হয়ে গিয়েছিল অমিতেশ।

নন্দার পরের প্রশ্ন ছিল, "হঠাৎ এরকম একটা ডিসিশন নিচ্ছ, আমায় তো কিছু বললে না! অফিসে কোনও প্রবলেম?"

"সেরকম কিছু নয়। আর ভাল লাগছে না অ্যাডের কাজ করতে!"

অমিতেশের সংক্ষিপ্ত উত্তরে হয়তো উপেক্ষার আভাস পেয়েছিল নন্দা। তাই আর কথা বাড়ায়নি। বস্তুত অমিতেশের উদ্দেশ্য তা ছিল না। ইদানীং সে বড় ক্লান্তি বোধ করে কথা বলতে। ভাবতে তেমন ক্লান্ত হয় না। ক্রমশ অন্তরমুখী হয়ে উঠছে সে। হয়তো একঘেয়ে জীবনযাপনই এর কারণ। নন্দার যে অভিমান হয়েছিল, বোঝা গেল কাল। লাগেজ প্যাক করে দেওয়ার সময় একবার শুধু

ইদানীং অমিতেশ কথা বলতে ক্লান্তি বোধ করে। ভাবতে ক্লান্ত হয় না। অন্তরমুখী হয়ে উঠছে সে।

জানতে চাইল, সে কতদিনের জন্য কলকাতায় যাচ্ছে? অমিতেশ বলেছিল, দিনচারেকের মতো। কোথায় গিয়ে উঠবে অমিতেশ, জিজ্ঞেস করেনি নন্দা। কানাইপুরে নন্দারও বাপের বাড়ি, বাবা-মাকে কিছু বলা বা দেওয়ার কোনও নির্দেশ দিল না। শ্বশুরবাড়ির সম্বন্ধেও একটা কথা তুলল না। এমনিতে অমিতেশের বাবা, মা, দিদির সঙ্গে নন্দার সম্পর্ক যথেষ্ট শীতল। সবচেয়ে জরুরি যে পয়েন্টটা নিয়ে কথা বলা উচিত, কলকাতার চাকরিটা যদি হয়ে যায়, দিল্লির পাট কি চুকিয়ে ফেলা হবে? ফ্ল্যাটটা যদিও ভাড়ার, কিন্তু দুই ছেলের স্কুল, ওখানকার লাইফস্টাইলের সঙ্গে নন্দার অভ্যস্ত থাকা, সব কি হুট করে ছেড়ে আসা যাবে?

প্রসঙ্গ যখন তোলেনি নন্দা, অমিতেশও ভাবনাটা এড়িয়ে গিয়েছে। ট্রেনে বসে নিজেকে নিয়েই ভেবেছে বেশি। মোটামুটি ঠিক করে নিয়েছিল, বছরদু'য়েক কলকাতায় সে একাই থাকবে। মাঝে-মধ্যে যাবে দিল্লি। এখনই নন্দাদের এখানে আনবে না। অমিতেশ আসলে একটু একলা হতে চেয়েছিল। ইন্টারভিউতে এসে বোঝা গেল, আপাতত সেটা হচ্ছে না। একটা জিনিস কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না, যদি না-ই নেবে, কলেজ কর্তৃপক্ষ তাকে ডাকল কেন? ফুটপাথ ধরে হাঁটতে-হাঁটতে লিন্ডসে স্ট্রিটে এসে পৌঁছল অমিতেশ। এতক্ষণ রাস্তাটা ছায়া-ছায়া ঠেকছিল, একটু যেন অচেনা। জওহরলাল নেহরু রোডের উপর নতুন ফ্লাইওভার এই প্রথম দেখল। লিন্ডসেতে এসে শেষ হয়েছে ফ্লাইওভার। এখন চারিদিকে আগের মতোই আলো। ভীষণ চেনা এই পাড়াটা। ছাত্রজীবনে, তারপরও কী হারে সিনেমা দেখেছে এখানে এসে! নতুন শার্ট, প্যান্ট, জুতো কেনার থাকলে, নিউ মার্কেট থেকেই কিনেছে। বান্ধবীদের খাওয়াতে হলে নিয়ে এসেছে এই পাড়ায়। বলতে গেলে, মফস্বলের অমিতেশ কলকাতায় এই এলাকায় এসেই সবচেয়ে বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করত। লিন্ডসে স্ট্রিট ধরে এগোতে-এগোতে দোকানপাট লক্ষ করছে অমিতেশ, ফ্রন্টেজ একটু-আধটু বদলে গেলেও, সব আগের মতোই আছে। শীতের বিকেল ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। নস্ট্যালজিক হয়ে পড়ছে সে। ইন্টারভিউয়ের ব্যর্থতা কখন যেন খসে পড়েছে গা থেকে। মনে পড়ছে, কলেজ ছাত্রী নন্দার কথা। অমিতেশ তখন দু'বছর হল আর্ট কলেজ থেকে বেরিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করছে। কানাইপুরে 'সোনার তরী' আর্ট স্কুলে আঁকা শেখাচ্ছে। পাস কোর্সের পড়ুয়া নন্দা এসেছিল ছবি আঁকা শিখতে। ওর আঁকার হাত দেখে অবাক হয়ে অমিতেশ বলেছিল, "তুমি কেন জেনারেল লাইনে আছ? তোমার তো আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়া উচিত।"

"পাব, চান্স?" দ্বিধান্বিত গলায় জানতে চেয়েছিল নন্দা।

"নিশ্চয়ই পাবে। অ্যাডমিশন টেস্টের সমস্ত প্রিপারেশন আমি করে দিচ্ছি, তুমি পরীক্ষাটা দাও।"

"জেনারেল কোর্সে গ্রাজুয়েশনের কী হবে?"

"কোনও একসময় প্রাইভেটে দিয়ে দিও। না দিলেও চলে। লক্ষ-লক্ষ স্টুডেন্ট জেনারেল লাইনে গ্রাজুয়েট হচ্ছে প্রতি বছর। কী ভবিষ্যৎ আছে তাদের?"

"আর্ট কলেজের স্টুডেন্টদের তো আরও খারাপ ফিউচার শুনেছি!"

ক্রমশ

অলঙ্করণ: নির্মলেন্দু মণ্ডল

চিত্রপট

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

"ভুল শুনেছ। আর কিছু তারা না পাক,

পর্ব ৫

শিল্পী হওয়ার স্বীকৃতি তো পাচ্ছে। তোমার হাতে যখন আঁকা আছে, কেন জেনারেল স্ট্রিমে গিয়ে সেটাকে নষ্ট করবে?"

অমিতেশ উঠে-পড়ে লেগেছিল নন্দাকে অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য তৈরি করতে। তখন যেভাবে পরীক্ষা নেওয়া হত, এখনও হয়তো হয়, স্টিল লাইফ, কম্পোজিশন...দিনের পর দিন তা প্র্যাকটিস করিয়ে গিয়েছে। পড়িয়েছে চিত্রকলার ইতিহাস। অনায়াসে নন্দা অ্যাডমিশন পেয়েছিল গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে। ওর বাবা-মা খুব খুশি। অমিতেশকে খাওয়াল-দাওয়াল। নিউ মার্কেটের একটা দোকান থেকে দামি ব্রান্ডেড শার্ট গিফ্‌ট করেছিল নন্দা। তখনকার দিনে দাম পড়েছিল তিনশো টাকা। পরের দিন গা থেকে শার্টটা খুলে নিয়ে কুনাল গেল প্রেম করতে। চায়ের দাগ লাগিয়ে ফিরল। প্রায় কান্না পেয়ে গিয়েছিল অমিতেশের। বিজন ছিল ঠান্ডা মাথার সাংসারিক গুণসম্পন্ন ছেলে। বলেছিল, "শার্টটা দে, ঠিক দাগ তুলে দেব।"

তুলে দিয়েওছিল বিজন। এসব স্মৃতি কি মনে পড়ে ওদের? মনে হয় পড়ে না। ওরা তো নিজের জায়গা ছেড়ে প্রবাসী হয়নি। অমিতেশই চলে গিয়েছে দূরে, স্মৃতি তাই এত প্রাঞ্জল।

নিউ মার্কেটে ঢুকে পড়েছে অমিতেশ। কিছুই বদলায়নি ভিতরের পরিবেশ। সময় যেন থমকে আছে এখানে! কেক, ফুল, কাঁচা মাংস মেশানো চাপা গন্ধটাও থম মেরে আছে বাতাসে। অনির্দিষ্ট পায়চারি করতে-করতে একটা শাড়ির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে অমিতেশ। শো-কেসে ঝোলানো আছে চারটে শাড়ি। একটা খুব চোখ টানছে। দামি কোনও সিল্ক। মেরুন আর ইয়েলো আধাআধি শাড়িটায়। শাড়িজুড়ে সোনালি জরির কাজ। নন্দার জন্য কিনবে কি? খুব অবাক হয়ে যাবে ও। শপিংয়ের ব্যাপারে একেবারেই তালকানা অমিতেশ। কেনাকাটা সব নন্দাই করে। ওর জন্মদিনের দিন, নতুন একটা শাড়ি পরে এসে বলে, "দ্যাখো মশাই, বার্থ-ডে'তে তুমি এই শাড়িটা আমায় দিলে।" "বাঃ, বেশ ভাল শাড়ি দিয়েছি তো!" কপট উচ্ছ্বাসে বলে অমিতেশ। নন্দা একটা আদুরে চাঁটি মেরে সরে যায়। আনন্দের এরকম মৃদু কম্পনের রেশ নিয়ে বয়ে যাচ্ছে তাদের দাম্পত্য। এই শাড়িটা কিনে নন্দাকে যদি দেয়, বড় একটা ঢেউ উঠবে তাদের সম্পর্কের মধ্যে। বিস্মিত নন্দার সামনে অমিতেশ বলবে, 'সেই নিউ মার্কেট, যেখান থেকে তুমি আমার জন্য প্রথম গিফ্‌ট কিনেছিলে। সেখান থেকেই নিয়ে এলাম শাড়িটা...' এ ধরনের আবেগঘন কথা মনে-মনেই উচ্চারণ করা যায়! পনেরো বছর পাশাপাশি থাকার পর মুখে বলা কেমন বোকা-ন্যাকা শোনায়!

আপাতত বেশ খিদেও পাচ্ছে অমিতেশের। ট্রেনে লাঞ্চ করার পর কিছুই খায়নি। মাথায় ইন্টারভিউয়ের চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছিল। এখানে থেকে যাওয়ার মতো জিনিসপত্র আনেনি। তারপরের চিন্তা বাসস্থান। কানাইপুরে যদি না থাকে, কলকাতায় থাকার জায়গা খুঁজতে হবে। এই ব্যাপারে হেল্প করতে পারবে কুনাল। ও থাকে নাকতলায়। কিন্তু খুব দ্রুত কি কলকাতায় বাসা পাওয়া সম্ভব? যদি বা পাওয়া গেল, কত বড় ফ্ল্যাট নেবে অমিতেশ? সে ঠিক করেছে, বছরদু'য়েক একা থাকবে। নিজেকে একা পাওয়াটা ভীষণভাবে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কিন্তু নন্দা যদি

অমিতেশের সিদ্ধান্তে রাজি না হয়? ছেলেদের নিয়ে চলে আসতে চায় কলকাতায়...তখন কী করবে? নন্দাকে বোঝাতে পারবে কি একা থাকার ইচ্ছেটা কেন তার হয়েছে? সবচেয়ে বড় সমস্যা, যে চাকরিটা ছেড়ে দেবে ঠিক করেছে অমিতেশ, স্যালারি প্রায় পঁয়ষট্টি হাজারের মতো! কলেজে জয়েন করলে পেত ম্যাক্সিমাম তিরিশ। এত কম মাইনেতে কেন সে অন্য চাকরিতে যাচ্ছিল, নন্দা চেপে ধরলে তার কোনও সদুত্তর দিয়ে উঠতে পারত না। একটাই সুবিধে, নন্দা কখনওই সেভাবে অমিতেশের কোনও কাজের এক্সপ্ল্যানেশন চায় না! বিয়ের এই পনেরো বছরের মধ্যে বেশ কয়েকবার চাকরি ছেড়েছে-ধরেছে অমিতেশ। মাঝের কয়েক মাস বেকার থেকেছে, নন্দার চোখে-মুখে কখনওই বিপন্নতার ছাপ দেখা যায়নি। শুধু একটু গম্ভীর থাকত। ঠান্ডা মাথায় ম্যানেজ করে নিত সব। কিছুদিন নিজেও চাকরি করেছে অ্যাড হাউজে। অমিতেশ যখনই থিতু হয়েছে রোজগারে চাকরি ছেড়ে দিয়েছে নন্দা। চাকরি করার মানসিকতা ওর একেবারেই নেই। অজুহাত হিসেবে বলে, 'আমি বাইরে থাকলে ছেলেদু'টো মানুষ হবে না।' স্বভাবে নন্দা ঘোরতর সংসারী মেয়ে। তবে নিজের আঁকাটা চালিয়ে যাচ্ছে। এগজিবিশনে ছবিও পাঠায়। অমিতেশের চাকরি ধরা-ছাড়া জীবনের সঙ্গে নন্দা অ্যাডজাস্ট করে নিলেও, আলাদা থাকা কতটা মেনে নেবে, সেই নিয়ে সন্দেহ আছে।

এখনকার চাকরিটা ছাড়ার একটা মজবুত কারণ অমিতেশ ভেবেছিল। সমস্যা হচ্ছে, বাবা-মা, এমনকী, নন্দাকেও হয়তো সেটা বুঝিয়ে ওঠা যাবে না। বিষয়টা এতটাই ব্যক্তিগত। অফিসে ঘটা ছোট্ট একটা ঘটনা তাকে বাধ্য করেছে সিদ্ধান্তটা নিতে। ঘটনায় নতুনত্ব কিছু নেই। হামেশাই ওই পরিস্থিতিতে পড়ে অমিতেশ। কিন্তু সেদিন ওর মনের অবস্থা ছিল একদম অন্যরকম। বহুদিন পর মাথায় ফ্ল্যাশ দিয়ে উঠছিল ছবি। অমিতেশের সৃষ্টির প্রাক মুহূর্তটা হচ্ছে, অন্তরদৃষ্টিতে একটা ছবি বিদ্যুৎগতিতে দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। আবারও দেখা দিতে পারে। কতক্ষণ পরে দেবে, আগে থেকে বোঝা মুশকিল। মধ্যবর্তী সময়টুকু নিশ্চল শিকারির মতো একাগ্র থাকে অমিতেশ! সেদিন অফিসে ঢুকে এমনটাই হচ্ছিল। কোনও কাজে হাত না দিয়ে নিজের চেয়ারে চোখ বুজে বসেছিল অমিতেশ, মাথায় ঝলক দিয়ে উঠছিল পাহাড়তলির এক রাত। চিনার গাছের ফাঁকে ফালি চাঁদ। তারারা ফুটেছে ঠিকই, তবে একটু নিষ্প্রভ। তিনটে দোতলা কাঠের কটেজ নিয়ে ছোট্ট রিসর্ট। উঠোনে পুলবোর্ড। এক সাহেব গভীর একাগ্রতায় স্টিক হাতে বোর্ডের একটা বল তাক করেছে। রিসর্টের কেয়ারটেকার ভারতীয়, বারান্দায় মোড়ার উপর বসে কাঠের খুঁটিতে মাথা হেলিয়ে ঘুমোচ্ছে। দোতলা কটেজের সিঁড়িতে বসে আছে নগ্নিকা মেম। ভঙ্গিটা প্রতীক্ষাক্লান্ত। গোটা ছবির আলোর সোর্স হচ্ছে, পুলবোর্ডের ওপর ঝোলানো ল্যাম্পটি। ঘুম, প্রতীক্ষা, একাগ্রতার উপর আশ্চর্য আলোকসম্পাত! ছবিটা কী যেন বলতে চাইছে! ছবিটা যখন মাথায় পুরোপুরি বসে গিয়েছে, রং নিয়ে ভাবতেও শুরু করেছে অমিতেশ, ঠিক সেই সময় ফোন এল টেবিলে। ভেঙে গেল মনঃসংযোগ। ফোন তুলতে ডিরেক্টরের গলা পাওয়া গেল, 'আর বি এন্টারপ্রাইজকে পাঠিয়েছি। ঠিকঠাক ডিল কোরো। অর্ডারটা হেলদি।' ফোন নামাতে না-নামাতে সিটের সামনে ক্লায়েন্ট। বড় একটা ক্যারি ব্যাগ থেকে কীসব প্যাকেট বের করে টেবিলে রাখল। একটু খেয়াল করতে দেখা গেল, মহিলাদের অন্তর্বাসের প্যাকেট। বিদেশি

অনেকদিন পর অমিতেশ আঁকতে বসছে! তবে আঁচড়ও কাটতে পারল না। সাদা ক্যানভাসের দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

ব্র্যান্ড। আমদানি করা এই সব প্রোডাক্ট নতুন প্যাকেজে বাজারে ছাড়া হবে। এর অ্যাড এবং নতুন প্যাকেট তৈরির বরাত দেওয়া হচ্ছে তাদের কোম্পানিকে। তারা চায়, এর লে-আউট অমিতেশ নিজে করুক। কারণ, তার করা এই কোম্পানির পোট্যাটো চিপ্‌সের প্যাকেটের লে-আউট বাজার মাত করেছে। পার্টি চলে যাওয়ার পর প্যাকেটগুলোর দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টি ফেলে রেখে বসেছিল অমিতেশ। মাথার ছবিটা পুরো ঘেঁটে গিয়েছে। কে যেন ব্রাশ চালিয়ে দিয়েছে এলোপাথাড়ি! একটু পরে অফিসের মহিলা সহকর্মীরা একে-একে উঠে এল অমিতেশের টেবিলের সামনে। সৌজন্যমূলক অনুমতি চেয়ে, নিজেদের সাইজ অনুযায়ী ব্রা-প্যান্টির প্যাকেট তুলে নিতে লাগল। চানাচুরের প্যাকেট হলেও নিত। অফিসের এটাই রেওয়াজ। কিন্তু সেদিনের ঘটনায় তীব্র রি-অ্যাকশন হচ্ছিল অমিতেশের। যে প্রতীক্ষারত নগ্নিকার ছবি সে আঁকতে চাইছিল, মনে হচ্ছিল, অফিসের মহিলা সহকর্মীরা তাকে অন্তর্বাস পরিয়েই ছাড়বে!

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছিল অমিতেশ। গাড়ি নিয়ে সোজা বাড়ি। ড্রাইভ করতে-করতে মনে করার চেষ্টা করেছে হারিয়ে যাওয়া ছবিটা। সব তালগোল পাকিয়ে গিয়েছে। বাড়িতে এসেই স্টুডিয়োতে ঢুকেছিল। যে স্টুডিয়োতে গত দু' বছর কোনও কাজ করেনি অমিতেশ। নন্দা কিন্তু করে গিয়েছে। সেদিন স্টুডিয়োর দরজা খুলে দেখল, তিনটে ক্যানভাসে নন্দার অসম্পূর্ণ কাজ। একসঙ্গে তিন চারটে কাজ করার অভ্যেস নন্দার আছে। কাছাকাছি সময় নিশ্চয়ই কোনও এগজিবিশন হবে। ওর ছবি মোটামুটি বিক্রিও হয়ে যায়।

নন্দার তৈরি করা সাদা ক্যানভাস ইজেলে লাগিয়েছিল অমিতেশ। নন্দা হাসি-হাসি মুখে কফি নিয়ে ঢুকল স্টুডিয়োতে। ও খুশি হয়েছিল, অনেকদিন পর অমিতেশ আঁকতে বসছে! কিন্তু অমিতেশ একটা আঁচড়ও কাটতে পারল না। সাদা ক্যানভাসের দিকে তাকিয়ে বসে রইল দীর্ঘক্ষণ। সাদা ক্যানভাসের কাপড়টাকে ব্রা, প্যান্টির কাপড় ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছিল না!

তারপর অনেক চেষ্টা করেও কোনওভাবেই ছবিটা এঁকে উঠতে পারছিল না অমিতেশ। অফিস ডুব মেরে একলা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যেত এদিক-ওদিক। দিল্লির তুঘলকাবাদ ওর প্রিয় জায়গা। টুরিস্টের ভিড় হয় না। ভাঙা দুর্গ, প্রাসাদের মাঠে বসে থাকত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ছবিটা মাথায় ফিরে এলেও, শুরুটা কীভাবে করবে ভেবে পাচ্ছিল না। নন্দা টের পেয়েছিল ওর মনের অবস্থা। ক্যানভাসের সামনে অমিতেশকে ঠুঁটোর মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পরামর্শ দিয়েছিল, পেনসিল স্কেচ করে নিতে। অনেকদিন কাজের মধ্যে নেই, তাই হয়তো গোড়ায় একটু অসুবিধে হচ্ছে। কিন্তু ছাত্রজীবনেই স্কেচ মেরে পেন্টিং করা ছেড়েছে

অমিতেশ। নন্দা এখনও স্কেচ করে নেয়। ওর ড্রয়িংয়ে পরিকল্পনার ছাপটা বড্ড বেশি। চারদিনের মাথায় ডিরেক্টর অরণি সেনের ফোন এল, "কী ব্যাপার, প্রবলেমটা কী? কোনও খবর না দিয়ে ডুব মেরে বসে আছ!" "কিছু পার্সোনাল প্রবলেম চলছে। দিনদু'য়েকের ভিতর জয়েন করছি," বলেছিল অমিতেশ।

বস বলে, "ঠিক দু'দিন। ওই কাজটা তোমার জন্য পড়ে আছে। ওরা তাড়া মারছে খুব।" ইতিমধ্যে কলকাতার কলেজের বিজ্ঞাপনটা দেখে, ফ্যাক্সে অ্যাপ্লাই করে দিয়েছিল অমিতেশ। স্পিড পোস্টে ইন্টারভিউ লেটার চলে এল। এত তাড়াতাড়ি ডাকবে ভাবেনি, সেদিন অফিস গিয়েছিল হপ্তাদু'য়েকের ছুটির অ্যাপ্লিকেশন দিতে। চিঠিতে লেখা ছিল, 'বাবার শরীর খারাপ। কলকাতায় যেতে হবে।'

দুর্গাবাড়ির ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মিটিং শেষ করে ওয়র্কশপে ঢুকে এল বিজন। রায়দা অনেক আগেই এসে গিয়েছে। জ্বলজ্বলে দৃষ্টি নিয়ে নির্বাক বসেছিল মিটিংয়ে। ক্ষতিপূরণে রায়দার কোনও শেয়ার নেই, বিজনের অবস্থা ফিরলে, তার হয়তো একটু মাইনে বাড়বে। কিন্তু চোখ-মুখের উৎসাহ দেখলে মনে হবে, পুরো বাড়িটার মালিকানা পেতে যাচ্ছে! মিটিংয়ের উত্তেজনার রেশ এখনও রয়ে গিয়েছে রায়দার মধ্যে। অতি তৎপরতায় কাজ সাজাচ্ছে অফিস ঘরে। বিজন বসল কম্পিউটারের সামনে। গোটাচারেক ভিজিটিং কার্ড আর ফিনাইলের লেভেল ডিজ়াইনিং করতে হবে। ভ্যালেন্টাইন ডে কার্ডগুলোর ম্যাটার দেওয়া হয়নি। কম্পিউটার অন করে খুলে ফেলল ভ্যালেন্টাইন ডে-র কার্ডের ফোল্ডার। স্ক্রিনে এখন বিজনের ডিজ়াইন করা ছবি, সি-বিচের আকাশে রামধনু। সাতরঙের বদলে ছ'টা রং দেখা যাচ্ছে সেখানে। গোলাপি রংটা লেগে আছে সি বিচে

কম্পিউটারে বিজন ভ্যালেন্টাইন ডে-র কার্ডের ফোল্ডার খুলে ফেলল। স্ক্রিনে তাঁর ডিজ়াইন করা ছবি।

পড়ে থাকা দুটো পাথর খণ্ডে। পাথরদু'টির অবস্থান প্রেমিক-প্রেমিকার মতো ঘনিষ্ঠ। এর পরও যদি পাবলিক কার্ডের অর্থ না বোঝে, ডানদিকের কোণে দুটো হার্ট পেস্ট করেছিল বিজন। এখন ওটাই চোখে অসহ্য লাগছে! টুল ব্যবহার করে হার্টের লাইন বরাবর কাটতে থাকে বিজন। কিন্তু ম্যাটারের কী হবে? মৃদু ঢেউয়ের মতো একটা লাইন আসে মাথায়, 'দুটো মন যখন প্রকৃতই ছুঁয়ে ফেলে নিজেদের, চুরি যায় রামধনুর রং।' একটু হাই-ফাই হয়ে গেল কি? সাধারণ মানুষের মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে যাবে সম্ভবত। লাইনটা এই কার্ডের জন্য অ্যাপ্রোপিয়েট হয়েছে। কথাগুলো তাড়াতাড়ি টাইপ করতে থাকে বিজন, যদি ভুলে যায়! হঠাৎ এরকম রোম্যান্টিক লাইন তার মাথায় এল কী করে, ভেবে বেশ অবাক হচ্ছে!

কাজের ফাঁকে-ফাঁকে বারবার মনে পড়ছে বামুনবুড়ির কথা। মিটিংয়ে বসেই বোঝা যাচ্ছিল, বাড়ি বিক্রিতে বুড়ির সায় নেই। এদিকে কিছু করারও নেই তার। সে একা। বুড়ির জন্য খারাপ লাগে বিজনের। কতদিন ধরে এবাড়ি আগলে আছে। চোখের সামনে ভাঙা হবে। কষ্ট তো হবেই বেচারির। একপ্রকার নিরুপায় হয়েই বুড়ি আঁকড়ে ধরেছে বিজনকে। দায়িত্ব দিয়েছে দুর্গাবাড়ির ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার। কিন্তু সে যে ভবিতব্যের দিকে এগোচ্ছে, পছন্দ হচ্ছে না বুড়ির। বামুনবুড়িকে ভালভাবে বাস্তব পরিস্থিতিটা বোঝাতে হবে। কাজে মন বসছে না, উঠেই পড়ল বিজন।

রায়দা বলল, "কী হল, কোথায় চললেন?"

"আসছি এখনই," বিজন বাইরে আসে। ঠাকুরদালানে দাঁড়িয়ে উঠোনের ওপারে বামুনবুড়ির ঘরের দিকে তাকায়। দরজা হাটখোলা। ঘরে আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। ক'দিন আগেই এত বড় ঘটনা ঘটে গেল, কারা যেন বুড়ির সব মালপত্র টেনে নামিয়ে দিয়েছিল বাইরে...দরজা খোলা রেখে এখন কোথায় গেল বুড়ি? সাবধানতা বলে তো একটা ব্যাপার আছে। যদিও বামুনবাড়ির ঘর থেকে কিছু চুরি করার ধান্দা ওদের ছিল না। আছেটাই বা কী, যে চুরি করবে? এটা নেহাতই উচ্ছেদ করার প্রাথমিক হুমকি। কাদের দিয়ে পারিজাত এই কাজটা করাল, বোঝা যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই লোকাল ছেলে। বিজন এবাড়ির সকলকে বলে রেখেছে, ব্যাপারটা নিয়ে খোঁজখবর করতে। ওই তো বামুনবুড়ি দালান ধরে হেঁটে ঘরে ঢুকছে। পায়ে-পায়ে চলেছে দুটো বিড়াল। বিজন একটু সময় নেয়। বামুনবুড়ি ঘরে ঢুকে গেলে, পা বাড়ায়। বিছানায় বাবু হয়ে বসে বামুনবুড়িকে বই পড়তে দেখে অবাক হয় বিজন। খুঁটিয়ে লক্ষ করতে গিয়ে দেখে, পাঁজি!

বিজনের পায়ের শব্দে কনকলতা মুখ ফিরিয়েছে, চোখে আশানুরূপ খুশির আভাস দেখা গেল না। একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "আয়, বস।"

বিছানায় বসল বিজন। গলায় একটু হালকা হাসির সুর এনে বলল, "কী ব্যাপার, হঠাৎ পাঁজি দেখতে বসে গেলে! ঠাকুরদার কারবারটা শুরু করবে নাকি?"

বই মুড়ে পাশে রাখল কনকলতা। বিজনের ঠাট্টায় সুর না মিলিয়ে নিস্তেজ গলায় বলল, "বিধবাদের পাঁজি দেখেই চলতে হয়। পূর্ণিমা,

অমাবস্যা, একাদশী, কিছুই তো বোঝা যায় না বাইরে থেকে।"

"কেন, তোমার ঘরে বাংলা ক্যালেন্ডার নেই?"

"এবছর পাইনি। ক্যালেন্ডারে তিথির সময় দেওয়াও থাকে না।"

বিজন মনে-মনে নিজেকে শুধরে নেয়। সবাই জানে, বামুনবুড়ি পুজোআচ্চার নিয়মনীতির ব্যাপারে ভীষণ কড়া। বিজন নিজেই একবার খুব ভুগেছে। রায়দা, সুবলের বায়নাতে ওয়র্কশপে বিশ্বকর্মা পুজো শুরু করে। কিন্তু এলাকার কোনও পুরোহিত রাজি হয় না এবাড়িতে পুজো করতে। সকলের এক রা, ওরে বাবা, দুর্গাবাড়িতে পুজো করে কেউ, বামুনবুড়ি খুঁত ধরে মাথা খারাপ করে দেবে! অবশেষে রায়দাকে বামুনবাড়ির কাছে পাঠাল বিজন। বলল, 'বুড়িকেই বলুন ভাল পুরোহিত জোগান দিতে। ওর জন্যেই তো কেউ আসতে চাইছে না।' আশ্চর্য ব্যাপার! বামুনবুড়ি কিন্তু জোগাড় করে দিল। বৈঁচি গ্রাম থেকে এলেন এক থুরথুরে বুড়ো। বামুনবুড়ি কীভাবে খবর পাঠিয়েছিল, কে জানে! বুড়ো খুব নিষ্ঠার সঙ্গে পুজোপাঠ করলেন। পাশে বসে বামুনবুড়ি এগিয়ে দিল উপাচার। প্রণামী একটু বেশিই দিয়েছিল বিজন। কত দূর থেকে এসেছেন! যাওয়ার সময় বৃদ্ধ খুব আশীর্বাদ করে গেলেন। বললেন, "সুখী হও বাবা। তোমার কাছে আর কী প্রণামী নেব। তোমার ঠাকুরদার কাছে আমার অনেক ঋণ। পুজোপাঠ সব তিনিই হাতে ধরে শিখিয়ে ছিলেন।" বৃদ্ধর কথা শুনতে শুনতে খানিক আপসোস হচ্ছিল বিজনের, ইস, কৃষ্ণাটা যদি থাকত, শুনত তার বংশগরিমা! পরের বছর সেই বৃদ্ধকে আর পাওয়া যায়নি। মারা গিয়েছেন। এখন বিজনের স্কুলের বন্ধু সমু পুজো করে। খারাপ করে না। তবু বিজন হুমকি দিয়ে রেখেছে বামুনবুড়িকে, 'পুজোর সময় এসে একদম ডিস্টার্ব করবে না।' বুড়ি আসে না। এলাকাতেই থাকে না হয়তো।

"চুপ করে বসে রইলি যে। কিছু বলতে এসেছিস তো?"

সম্বিত ফেরে বিজনের। তবে তখনই মুখে কথাও এল না। সেভাবে তো কিছু ভেবেও আসেনি। একটু সময় নিয়ে বলল, "মিটিংটা ঠিকঠাক হয়েছে তো?"

বুড়ি বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মুখ নীচে করে বসে থাকল।

গলায় সহানুভূতি মিশিয়ে বিজন ফের বলল, "আমি জানি, তোমার কষ্ট হচ্ছে। সেই কবে থেকে আছ এই বাড়িতে। ভেঙে, পাল্টে ফেললে খারাপ তো লাগবেই। কিন্তু এটাও তো মানবে, আজ চারপাশে নতুন যা কিছু দেখছ, পুরনো ভেঙেই তো হয়েছে। সব যদি আগের অবস্থায় রেখে দিতে হত, গোরুর গাড়ি চলত কানাইপুরের রাস্তায়।"

একদমে বলে যাওয়া বিজনের কথাগুলো মুখ তুলে শুনল বামুনবুড়ি। একটু বিরতি নিয়ে বলল, "কষ্ট আমার বাড়ির জন্য হচ্ছে না। ভাবনা হচ্ছে এবাড়ির লোকগুলোর জন্য। আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে এবাড়িতে প্রথম আসি। কানাইপুরের জমিদার বরেন ঘোষাল থাকতে দিয়েছিলেন। তোর ঠাকুরদা, আমি আর তোর বাবা। বিশাল বাড়িতে মাত্র তিনজন। পুরো বাড়িটা

ইতিমধ্যে কলকাতার কলেজের বিজ্ঞাপনটা দেখে, অ্যাপ্লাই করে অমিতেশ। ইন্টারভিউ লেটার চলে এল।

যেন আমাদের তিনজনকে খেতে আসত! সার-সার ঘর, সব তালা মারা। শুধু এই ঘরে থাকতাম আমরা। ততদিনে দুর্গাপুজো বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবাড়িতে। জমিদারদের জ্ঞাতিগুষ্ঠির মধ্যে নানা মনোমালিন্য, মামলা হয়েছিল। পুজো হত মূল জমিদার বাড়িতে। এখান থেকে পুজো করতে যেতেন উনি। পুজো করায় মন ছিল না। আমিই ঠেলে-ঠেলে পাঠাতাম। এক সময় বরেন ঘোষাল কানাইপুরের পাট চুকিয়ে চলে গেল কলকাতায়। জমিদার বাড়িটা তো হাসপাতাল হয়েছে। সরকারকে দান করেছিলেন বরেন ঘোষাল। এবাড়িটার বিলি-বন্দোবস্ত করেনি। আমিই কলকাতায় গিয়ে তাড়া দিয়ে বলি, 'উইল করে রাখুন। আপনারা আশেপাশে নেই। পরে এবাড়ি নিয়ে অনেক ঝামেলায় পড়তে হবে।' বরেন ঘোষাল আমার কথা শুনলেন। উইল হওয়ার পর জানতে পারলাম, বাড়ি চার শরিকে ভাগ হয়েছে। তিনজন জমিদারের রক্তের সম্পর্কের। এক ভাগ আমাদের। উইলের কপি বরেন ঘোষাল আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমার বংশের কেউ ওবাড়ি গিয়ে থাকবে না। তুমিই বাড়িটা দেখভাল করো। চার ভাগের এক ভাগ অধিকারটা সেই জন্যই দেওয়া," দম নিতে থামল বুড়ি। একটু পরে ফের শুরু করল, "তারপর বুঝলি, এক ভাগ মালিকানা পেয়ে আমার সাহস গেল বেড়ে। তখন রাস্তাঘাটে গিজগিজ করছে বাঙাল। দেশভাগ হয়েছে কিছুদিন আগে। ভদ্র, ভালমানুষ গোছের পরিবার দেখলে, এবাড়িতে নিয়ে এসে থাকতে বলতাম। এবাড়ির সব ঘরের চাবি অনেকদিন আগে থেকেই জমিদার আমাদের কাছে দিয়ে রেখেছিল। এক-একটা করে ঘর খুলে দিই আর গৃহহীন মানুষদের ঢোকাই।"

"ভাড়া নিতে?"

"নিতাম অল্পস্বল্প।"

"সেটা তো বেআইনি। নিজের পোর্শনের ভাড়া নিচ্ছ, নাও। অন্যের ভাগে লোক বসিয়ে ভাড়া নেওয়া উচিত হয়নি।"

বামুনবুড়ি একটু রাগ দেখাল, "ও, তা বাড়ি পরিচর্যার বুঝি খরচ নেই? ভাড়ার টাকাতে সেসব করতাম। ভাড়াও ছিল নামমাত্র। তাই আদায় করতে ঘাম ছুটে যেত।"

বিজন টের পায়, বুড়ি একটু জল মেশাচ্ছে। খোঁচা মেরে জিজ্ঞেস করে, "ঠাকুরদা তো বলছ, পুজোপাঠ করতে চাইতেন না। তোমাদের সংসার চলত কীভাবে?"

"উনি ঠিকুজি, কোষ্ঠী বাড়িতে বসে করতেন। টুকটাক চিকিৎসাবিদ্যে জানা ছিল। এ ছাড়া আমিও রোজগার করতাম। এলাকার সবাই জানত, বামুনবুড়ি পুজো-পার্বণের ব্যাপারে খুঁটিনাটি জানে। তাই পুজো বা ব্রত থাকলেই ডাক পড়ত আমার। প্রণামী পেতাম ভালই। মোটামুটি চলে যেত। বেশ কিছু বাড়ির কোনও শুভ অনুষ্ঠান থাকলে, আমাদের সিধে পাঠিয়ে শুরু করত কাজ।"

বামুনবুড়ি আর বোধ হয় আসল প্রসঙ্গে ফিরবে না। তবে পুরনো দিনের গল্প শুনতে খারাপ লাগছিল না বিজনের। একদিন সময় করে এসে শুনতে হবে। আজ অনেক কাজ পড়ে আছে, ওঠার জন্য উসখুস করে বিজন।

তার অস্থিরতা টের পায় বুড়ি। প্রসঙ্গ থেকে সে যে ইচ্ছাকৃত সরে গিয়েছিল, বোঝা যায় পরের কথাটায়, "তো যা বলছিলাম, আমি যে দুর্গাবাড়িতে লোক ঢোকাচ্ছি, খবর গেল জমিদারের কলকাতার বাড়িতে। ওরা একটা বিহারি পাহারাদার পাঠাল এখানে। তখনও দুর্গাবাড়ির অনেক ঘর খালি পড়ে আছে। সেগুলো আগলানোর ভার পাহারাদারের উপর। সে লোকটি আমার চেয়েও সরেস। মাসছয়েক ধরে হাওয়াটা বুঝে নিল। দেখল, তার মাসোহারা পাঠিয়ে দেওয়া ছাড়া কলকাতার বাবুরা এ বাড়ির সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ রাখে না। তখন বাকি ফাঁকা ঘরগুলোতে টাকা নিয়ে লোক ঢোকাতে লাগল সে। আমি ভেবে দেখলাম, কলকাতায় গিয়ে বাবুকে অভিযোগ জানিয়ে কোনও লাভ নেই। বাবু বলবেন, 'তুমি তো একই অপরাধ করছ। তুমি মাসে-মাসে টাকা নিচ্ছ। আর সে নিচ্ছে একবারে।' অন্য বুদ্ধি খাটালাম। আমার ভাড়াটের সংখ্যা অনেক। তাদের জড়ো করে পিছনে লাগালাম বিহারি পাহারাদারের। পালিয়ে যেতে বাধ্য হল সে। বলা যায়, ঠিক সেই সময় থেকেই বাড়িটা জবরদখল হয়ে গেল। ভাড়াটেরা বুঝে গেল, ভাড়া বন্ধ করে দিলে আমার তেমন কিছু করার নেই। কারণ, বাকি তিন শরিকের সঙ্গে সদ্ভাব নেই আমার। নিত্যদিন ঝগড়া কাজিয়া করে ভাড়া ঠিকই তুলতাম। তখনকার লোকগুলো এখনকার মতো এত বদ ছিল না। কিছু ভাড়াটের অবস্থা ফিরতে, অন্য জায়গায় বাড়ি করে উঠে গেল। কিন্তু এখানকার ঘর ছাড়ল না। দিয়ে গেল ছ্যাঁচড়া, হাড়হাভাতে কোনও আত্মীয়, বন্ধুকে। এভাবেই আস্তে-আস্তে এবাড়ি থেকে ভদ্রলোকেরা উধাও হয়ে গেল। এখন যারা পড়ে আছে, সবক'টা অকম্মার ঢেঁকি, কুঁড়ে, কুচুটে। রোজগারপাতির ঠিক ঠিকানা নেই। বালাই নেই

চরিত্রের। আজ বউ পালায়, তো কাল মেয়ে পালায়! মাঝে-মধ্যেই হাঁড়ি চড়ে না অনেক ঘরে। এদের সম্বল বলতে এই বাড়িটা। এটা যদি বিক্রি হয়ে যায়, ক্ষতিপূরণের টাকা উড়িয়ে দিতে চার দিনও লাগবে না ওদের। তখন কি ওরা রাস্তায় থাকবে?"

এতক্ষণে বামুনবুড়ি ফিরে এল মেন পয়েন্টে। অবশ্যই সঙ্গে একটা প্রশ্ন নিয়ে। বিজন বলল, "ওদের নিয়ে তোমার এত চিন্তা কিসের? তুমি নিজের মুখেই বলছ, ওরা লোক ভাল নয়। আর সবচেয়ে বড় কথা হল, ওরা নিজেরাই চাইছে বাড়িটা বিক্রি হোক। যদি বিপদে পড়ে, তার দায়িত্ব ওদের, তোমার নয়।"

"চোখের সামনে এতগুলো চেনা মানুষ নিঃস্ব হয়ে যাবে, এটা সহ্য করার ক্ষমতা আমার নেই। এরা বোকার হদ্দ বলেই বাড়ি বিক্রিতে সায় দিচ্ছে। তুই এদের ঘরে ঘরে গিয়ে খোঁজ নে, কারও বউ বাড়ি বিক্রিতে রাজি নয়।"

"তা হলে আজকের মিটিংয়ে সেকথা বলল না কেন? সকলেই তো ছিল," জানতে চাইল বিজন।

বামুনবুড়ি বলল, "বউগুলো বলেনি স্বামীর ভয়ে। যা পাষণ্ড সব! মদ গিলে এসে বউ ঠেঙাতে বসবে!"

"এই অসভ্য লোকগুলোর উপর তোমার এত মায়া কেন, সেটা তো বুঝতে পারছি না!"

বিজনের অবাক দৃষ্টির সামনে বুড়ি মজা পাওয়া হাসি হাসল, "এবাড়িতে আমি মাঝে-মধ্যে দোষ দেখার চোখটা বুজে রাখি! তখনই সব ঘর মিলিয়ে গোটা একটা পরিবার বলে মনে হয়! আর সত্যিই তো, এদের মধ্যে অনেক গুণও আছে। কারও ঘরে তেমন বিপদ-আপদ হলে, সবাই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কেউ মরে গেলে অনেকের কাঁধ পায়। ঘরে হাঁড়ি না চড়লে, অন্য ঘর থেকে কিছু অন্তত দিয়ে যায়। এরকম একটা যৌথ পরিবার তুই আর কোথায় পাবি? এরা যদি ভেঙে ছড়িয়ে যায়, একেবারে শেষ হয়ে যাবে!" কথা শেষে গলাটা একটু যেন ভেঙে গেল বামুনবুড়ির, চোখের কোণটাও চিক-চিক করছে।

এই বামুনবুড়িকে বিজন চেনে না। হয়তো কেউই চেনে না এবাড়ির। বুড়ি এক-একা অভিভাবকের ব্রত পালন করে যাচ্ছে। একটু সময়

এই বামুনবুড়িকে বিজন চেনে না। হয়তো কেউই চেনে না এ বাড়ির। বুড়ি এক-একা অভিভাবকের ব্রত পালন করে যাচ্ছে।

নিয়ে, ছোট্ট করে কেশে বিজন বলল, "তুমি যদি বলো, আমি আর এগোব না। দুটো ব্যাপারে আমার একটু ভয় হচ্ছে। এক, তোমার ঘরের মালপত্র ফেলা দেখে মনে হচ্ছে প্রোমোটার মরিয়া। সই করানোর জন্য আরও অত্যাচার করবে তোমার উপর। দ্বিতীয়টা হচ্ছে, এবাড়ি কিন্তু সত্যিই ধীরে-ধীরে ভেঙে পড়বে।"

কনকলতা তাকিয়ে ছিল নাতির দিকে। চোখদুটো হঠাৎ জ্বল-জ্বল করে উঠল, "আচ্ছা, একটা কাজ করলে হয় না, প্রোমোটারকে যদি বলি, একতলাটা দুর্গাবাড়ির লোকেদের দিয়ে দিতে, রাজি হবে না?"

"রাজি না হওয়ারই কথা। আগের মতো এই বিজনেসে এখন আর লাভ নেই। গ্রাউন্ড ফ্লোর মিউনিসিপ্যালিটি নিয়ম অনুযায়ী গ্যারেজের জন্য রাখতে হবে। তার উপরের তলা যদি আমাদের দেয়, বাকি চার তলা সে তুলতে পারবে। তার চেয়ে বেশি পারমিশন দেবে না মিউনিসিপ্যালিটি। মাত্র চার তলা বিক্রি করে লাভ করতে পারবে না প্রোমোটার।"

বুড়ির পোষা কুকুরটা দোরগোড়ায় এসে ডাকতে শুরু করল হঠাৎ। বামুনবুড়ি তাতে কান না দিয়ে বিজনকে বলল, "তুই যা ভাল বুঝিস, করিস। আমার বয়স হয়েছে, মায়ার ভার তো বাড়বেই। একটু লক্ষ রাখিস এবাড়ির হাঁদাবোকা মানুষগুলোর উপর। একেবারে জলে গিয়ে না পড়ে। এত নোংরা এদের মন, মুখের ভাষা, ভগবানও এদের দেখা ছেড়ে দিয়েছেন!"

বুড়ির মনোভাব বুঝতে গিয়ে একটা জায়গায় এসে বারে-বারে হোঁচট খাচ্ছে বিজন। দুর্গাবাড়ির বাসিন্দাদের গালাগালি দিতে ছাড়ছে না বামুনবুড়ি, আবার ওদের জন্য ভেবেও আকুল হচ্ছে! বিছানা থেকে নেমে এল বিজন। রায়দা এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়, "দাদা, আপনার এক বন্ধু এসেছেন দেখা করতে।"

বিজন একটু অবাক হয়। এই অবেলায় বন্ধু? "কী নাম বলল?"

"সেটা তো জিজ্ঞেস করিনি।"

কুকুরটা দরজার সামনে থেকে সরে গিয়েছে। বন্ধু আসার খবরটা কি রায়দার আগে বুড়ির পুষ্যি দিতে এসেছিল? বামুনবুড়ির ঘর থেকে বেরিয়ে বিজন ওয়র্কশপের দিকে গেল। ঘরে ঢুকে যাকে দেখল, কষ্ট কল্পনা করেও তাকে এখানে ভাবা যায় না! রিভলভিং চেয়ারে দোল খাচ্ছে অমিতেশ। বিধ্বস্ত চেহারা, মুখে সেই কবেকার হাসি। মেঝেতে রাখা আছে ছোট একটা লাগেজ।

বিজন বলল, "কী রে শালা, তুই হঠাৎ!"

"বাদাম খাবি?"

"না," একটু ধাঁঝিয়ে রিফিউজ করল প্রতাপ। এমনটাই স্বাভাবিক। গা করল না বাপি। হকারকে এক প্যাকেট মিষ্টি বাদাম দিতে বলল। অনেকক্ষণ ধরে গাল ফুলিয়ে বসে আছে প্রতাপ, এখন মুখ ঘুরিয়ে নিল চলন্ত ট্রেনের জানলার বাইরে। বাপি চাইছে, প্রতাপের সঙ্গে ব্যবহারটা সহজ করে নিতে। নেওয়াটা ভীষণ জরুরি। কিন্তু প্রতাপ কিছুতেই স্বাভাবিক হচ্ছে না। গোঁসা টাইপের ভাব করে আছে। আসলে কিন্তু ভয় পাচ্ছে বাপিকে। পাওয়ারই কথা। সকালের শিফ্‌টে ডিউটি ছিল দু'জনের। ছুটি দুপুর আড়াইটে। কাজের ফাঁকে বাপি প্রতাপকে বলে রেখেছিল, ছুটির পর একসঙ্গে ফিরব। কথা আছে। তারপর জোর করে, স্প্রিংওয়ালা ছুরির ভয় দেখিয়ে প্রতাপকে নিয়ে এখন যাচ্ছে ডলির বাপের বাড়িতে। প্রতাপ অবশ্য বলেছে, সে নাকি জানত না, ডলিদের বাড়িটা খারাপ পাড়ায়। বাপি বিশ্বাস করেনি! বাসে আসতে-আসতেও প্রতাপ বিড়বিড় করছিল, "এত বড় ভুল হল আমার? সেই কোন ছোটবেলা থেকে মাসির বাড়ি যাচ্ছি!" পাশে হ্যান্ডেল ধরে ঝুলে থাকা বাপি বলেছিল, "টাকা খেয়ে মানুষ ভুলভাল কাজই করে থাকে। তবে তোর সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছে আমাকে গাণ্ডু ভাবা!" বাপির দিকে একবার তাকিয়ে সেই যে গুম মেরেছে প্রতাপ, আর একটা কথাও বলেনি। যত সময় যাচ্ছে, মুখটা অভিমানী হয়ে উঠছে ওর। শালা, অ্যাক্টিং জানে খুব! বাপি কিন্তু এখনও জানে না, ডলিদের বাড়িতে গিয়ে কী বলবে। যাওয়াটা প্রয়োজন। পরে পরিস্থিতি বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

কানাইপুরে থেমে এগিয়ে চলল ট্রেন। বাপির নামা হল না। কখনও কখনও মনে হচ্ছে, যা কিছু ঘটছে, সব খারাপ স্বপ্ন! অল্প বয়সে যেমন দেখত, রেজাল্ট বেরিয়েছে, বাপি ফেল! মার্কশিট নিয়ে ভয়ে বাড়ি ফিরছে না বাপি। চলে গিয়েছে অন্য পাড়ায়। একেবারে অচেনা সেই পাড়া।

অলঙ্করণ: নির্মলেন্দু মণ্ডল

চিত্রপট

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

রাস্তা ভুল হয়ে যাচ্ছে। সন্ধে হয়-হয়।

পর্ব ৬

বাড়ির কথা মনে পড়ছে খুব। মা অপেক্ষা করছে দোরগোড়ায়। বাবা বেরিয়ে পড়েছে সাইকেল নিয়ে। দিদির মন বসছে না পড়ায়। ছলছলে চোখ নিয়ে জানলায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বাপিও চাইছে বাড়ি ফিরতে, পারছে না। রাস্তা, মাঠঘাট সব অচেনা...তখনই ভেঙে যেত ঘুমটা। ঘোর কাটার পর খেয়াল হত, রেজ়াল্ট বেরবে কাল! ডলির পাড়ার ব্যাপারটা যদি সেরকমই হয়, এসবই আসলে দুঃস্বপ্ন। এখনই ভেঙে যাবে ঘুম...

বীরনগরের আগের স্টেশন চলে গেল। দুপুরবেলার ট্রেন মোটামুটি ফাঁকাই। সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বাপি, "চল।"

"ও বাড়িতে গিয়ে মাথা ঠান্ডা রাখিস। দুম করে ছুরি-ফুরি দেখিয়ে ফেলিস না। কেস পুরো ঘুরে যাবে।"

প্রতাপের দিকে খর চোখে তাকাল বাপি, "তুই কি আমায় পুলিশের ভয় দেখাচ্ছিস?"

"ভয় নয়। যা বলছি, তোর ভালর জন্যই বলছি।"

বীরনগরে ঢুকে পড়েছে ট্রেন। প্যান্টের পকেটে হাত বুলিয়ে ছুরিটার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চত হয়ে নিল বাপি। ট্রেন থামতেই নেমে পড়ে দু'জনে। রথতলা কলোনিতে ঢোকার পর আশাপাশটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল বাপি। এর আগে যে ক'বার এসেছে, এভাবে দেখেনি। ভদ্রপাড়ার সঙ্গে এপাড়ার তফাত ঠিক কোথায়? যেহেতু ব্যবসা করার লাইসেন্স নেই এপাড়ার, মাঝ বিকেলে বাড়ির রকে, দরজায় সাজগোজ করা মেয়ে দেখা যাচ্ছে না। একটু অন্ধকার নামলে হয়তো বেরবে। এরকমই এক বিকেলে ডলিরা চার-পাঁচজন মিলে বসেছিল সিমেন্টের চাতালে! ওরা কি কাস্টমারের টোপ হয়ে অপেক্ষা করছিল? মনে হয় না। কেউ খুব একটা চড়া সাজগোজ করেনি। ওই সাজ একবার চোখে পড়লেই চরিত্র বোঝা যায়...কথাটা ভেবেই একটু হোঁচট খায় বাপি। আজ এই মুহূর্তে বাপি তো খুনির সাজে সেজেছে। পকেটে ছ' ইঞ্চির ছুরি। যেটা দেখিয়ে প্রতাপকে বাধ্য করেছে এ পাড়ায় আসতে। বাপিকে বাইরে থেকে দেখলে কি কিছু বোঝা যাবে? যে-কোনও লাইনে বেশ ক'দিন কাটানোর পর চেহারায় ছাপ পড়ে। ডলি আদৌ লাইনে নেমেছিল কি না, সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন। ছুরি দেখালেই কি ডলির বাবা সেটা স্বীকার করবে? কে জানে! ডলি তো এতটুকু নার্ভাস হয়নি ছুরিটা দেখে। কাল ওর চোখের সামনেই শানওয়ালার কাছে ছুরিটা ধার করিয়েছে বাপি। একটাও প্রশ্ন করেনি ডলি। মা বরং আশঙ্কার গলায় জানতে চেয়েছিল, "হঠাৎ ওটা ধার করাচ্ছিস কেন, মাথায় কোনও বদ মতলব নেই তো?"

"না, না। জং ধরেছিল, তাই একটু শান দিয়ে নিলাম।"

বছর পাঁচেক আগে বাপি চড়কের মেলায় ছুরিটা কিনেছিল। নেহাত শখ করেই। বাপি যখন ছুরিটা শান দেওয়াচ্ছিল, ডলি এসে দাঁড়িয়েছিল জানলায়। দেখল অনেকক্ষণ ধরে। ওর চোখমুখে ভয় বা আতঙ্কের কোনও ছায়া দেখা যায়নি। এমনিতে ডলির সঙ্গে গত ক'দিন ধরে কথাবার্তা প্রায় বন্ধ। বাপিই বলছে না। কোনও হেলদোল নেই ডলির। প্রয়োজনমতো ছুঁড়ে দিচ্ছে একটা-দুটো কথা। বাপির হঠাৎ পরিবর্তনের কারণটা জানার আগ্রহই নেই ডলির। বাপি আজকাল বাড়িতেও থাকে কম। পাড়ার ক্লাবে অন্যমনস্কভাবে ক্যারম পেটায়। ডলি

কতটা খারাপ, এখনও নিশ্চিতভাবে জানা হয়নি বাপির। এই ব্যাপারে সবচেয়ে ঠিক খবরটা দিতে পারে ডলির বাড়ির লোক। বাপি জানে, একা ডলির বাড়ি গিয়ে জানতে পারবে না। প্রতাপকে দরকার। ওর সূত্রেই এবাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ। মাঝে চারদিন প্রতাপ অফিসে আসেনি। ছটফট করেছে বাপি। রোজ ছুরিটা নিয়ে ডিউটিতে গিয়েছে, ফিরে এসেছে। এমন কথাও মাথায় এল, প্রতাপ বুঝি ছেড়েই দিল চাকরি। ডলিদের বাড়ি থেকে টাকা খেয়ে পকেট এখন ভারী। বাপি কিছু একটা সন্দেহ করছে, আগে একবার টের পেয়েছে প্রতাপ। তাই ঝুঁকি না নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। আজ যদি ডিউটিতে না আসত প্রতাপ, বাপি ওর বাড়ি চলে যেত। মুদিখানাটা এসে গেল। গলিটা বাঁক নিয়েছে এখানে এসে। একটু এগোলেই ডলিদের বাড়ি। দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে বাপি।

প্রতাপ বলল, "কী হল, দাঁড়িয়ে পড়লি!"

"সিগারেট কিনব," বাপি দোকানের সামনে সিমেন্টের স্ল্যাবে উঠে দাঁড়ায়। দোকানিকে এক প্যাকেট সিগারেট দিতে বলে। ঠিক করে সিগারেটটা হাতে নিয়েই ঢুকবে ডলিদের বাড়ি!

ওদের বাড়ির সদর দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ।

"ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করল কে?" এগিয়ে গেল বাপি। হাতের সিগারেট ফেলে, দরজার উপর থেকে ঝুলে থাকা শিকলে সজোরে চাপড় মারতে থাকে। পাশের বাড়ির জানলা খুলে যায়। উঁকি দেয় মাঝবয়সি মহিলার মুখ। হয়তো কিছু জিজ্ঞেস করত, তার আগেই খুলে যায় দরজা, অবাক চোখ নিয়ে ডলির মা দাঁড়িয়ে আছে সামনে। পরনে সাত বাসি কোঁচকানো শাড়ি, উলোঝুলো চুল।

প্রতাপ বলল, "কী গো, কোথায় ছিলে? সেই থেকে দরজা ধাক্কাচ্ছি।"

"ভিতরের দিকে ছিলাম রে। শুনেছি আওয়াজ। ভাবছি, কে এল এই সময়।"

তার মানে ভয়ে দরজা খুলছিল না ডলির মা। গম্ভীর মুখে বাপি শাশুড়ির উদ্দেশে বলল, "উনি নেই?"

ডলির মা বুঝতে পারল, ডলির বাবার কথা বলছে বাপি। উত্তর দিল, "আছে, আশেপাশেই আছে। তোমরা ঘরে গিয়ে বসো। আমি খবর পাঠাচ্ছি।"

বিয়ের সময় পরিষ্কার করা উঠোন আবার আগাছায় ভরে গিয়েছে। কুয়োপাড়ে আগের মতোই শেওলা। টালির চালে বসে আছে একটা কাক। বারান্দার দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে বাপি খেয়াল করল পাশে প্রতাপ নেই। পিছন ফিরে দেখে, প্রতাপ দাঁড়িয়ে পড়ে তার মাসির সঙ্গে গুজুর-ফুসুর করছে। বাপি রীতিমতো হাঁক দিয়ে উঠল, "কী হল, দাঁড়িয়ে পড়লি কেন? আয়।"

প্রতাপ তড়িঘড়ি পায়ে এগিয়ে এল, ডলির মা চলে যায় সদরের দিকে। ঘরে এসে খাটে বসেছে দুই বন্ধু। বাপি ফের একটা সিগারেট ধরিয়েছে। মনে-মনে দেখে নিচ্ছে, এইমাত্র ফেলে আসা রথতলা কলোনির রাস্তাঘাট। দিনের বেলা তো কিছু বোঝাই গেল না। একটু যেন ফাঁকা-ফাঁকা,

বাপি কিছু একটা সন্দেহ করছে, আগে একবার টের পেয়েছে প্রতাপ। তাই ঝুঁকি না নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে।

এই যা। বাপির স্বচক্ষে দেখা কোনও প্রমাণ নেই। কী করে ডলির বাবাকে বলবে, আপনাদের পাড়াটা খারাপ? চালে বসে থাকা কাকটা বোধ হয় নেমে এসেছিল বারান্দায়। লাফাচ্ছে কিছুক্ষণ অন্তর। শানবাঁধানো বারান্দা থেকে উঠে আসছে নখের আওয়াজ, আরও নির্জন হয়ে উঠেছে পাড়াটা। অসহ্য নির্জনতা কাটাতে বাপি প্রতাপকে জিজ্ঞেস করল, "তোর মাসি তো একবারও জানতে চাইল না, কেন হঠাৎ এলাম?"

উত্তর দিতে পারল না প্রতাপ। কারণ, ঘরে ঢুকে পড়েছে ডলির বাবা। চেহারায় ঘুম-ঘুম ভাব। যেন হঠাৎ ডেকে তুলে নিয়ে আসা হয়েছে। পরনে লুঙ্গি আর ছেঁড়া স্যান্ডো গেঞ্জি। শশব্যস্ত হয়ে বলল, "হ্যাঁ, বলো বাবা। হঠাৎ কোনও খবর না দিয়ে, কী ব্যাপার?"

"আপনি বসুন, বলছি।"

মেঝেতেই বসে পড়ল ডলির বাবা। অস্বস্তি হচ্ছে বাপির। সে কিন্তু কিছুতেই নীচে গিয়ে বসবে না। আজ উপরেই থাকতে চায়। প্রতাপ বাপির ভয়ে খাটের যেখানে বসেছিল, সেখান থেকে নড়ছে না। ডলির বাবার বসে থাকার ধরনটা আগেকার দিনের গরিব প্রজার মতো। সারা ঘরে মদের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। খুব সম্ভবত চুল্লুর। ডলির বাবা খেয়ে এসেছে তার মানে। দু'বার নাক টেনে প্রতাপের দিকে তাকাল বাপি। মাথা নিচু করে নিল প্রতাপ। জামাই কী বুঝল না-বুঝল, নেশার ঝোঁকে খেয়াল করল না ডলির বাবা। একটু বেশি উদ্বেগে জানতে চাইল, "ডলি কোনও গোলমাল পাকায়নি তো?"

এতক্ষণে মেয়ের কথা জানতে চাইল। ডলির মা-ও আছে কাছাকাছি, দরজার পাশে ভিতু কাঠবিড়ালির মতো দাঁড়িয়ে। বাপি মাথা নেড়ে একটু সময় নিয়ে বলল, "একটা দরকারি কথা জানতে এসেছি আপনাদের কাছে। আপনাদের এলাকাটার বদনাম আছে। এটা রেড লাইট এরিয়া। এই কথাটা আমার কাছে চেপে

গিয়েছিলেন কেন?"

বাপি ভেবেছিল, প্রথমেই অভিযোগটা অস্বীকার করে যাবে ডলির বাবা। কথা কাটাকাটিতে নামতে হবে বাপিকে। হচ্ছে না। ডলির বাবা শিবকালী মণ্ডল চোখের পলক না ফেলে অসহায় দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে বাপির দিকে। বাপি কোথায় চোখ রাখবে, ঠিক করে উঠতে পারছে না। এমন সময় লক্ষ করে, শিবকালী মণ্ডলের পলকহীন চোখ দিয়ে জল নেমে আসছে। মানুষটা থরথর করে কাঁপছে। মুখে হাত চাপা না দিয়েই হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল। বাপি ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে। উঠে গিয়ে সান্ত্বনা দেবে কি? এতটা নরম মনোভাব দেখানো ঠিক হবে না। এরা তাকে ঠকিয়েছে। হিসেব নেওয়ার এখনও অনেক বাকি। ডলির মা এসে পিঠে হাত বোলাচ্ছে স্বামীর। তাতেও শিবকালীর কান্না থামছে না। কাঁদতে-কাঁদতেই বলল, "তুমি বাবা আমাদের ক্ষমা করে দাও। পাড়ার বদনামটা চেপে গিয়েছি বাধ্য হয়ে। নইলে বিয়ে হত না মেয়ের। এখানে যখন ভাড়া আসি, আমিও জানতাম না যে, পাড়াটা খারাপ।"

"জানার পরও থেকে গেলেন কেন?" জিজ্ঞেস করল বাপি।

"খুব সস্তায় ভাড়া পেয়েছিলাম বাড়িটা। গরিব মানুষ। রাজমিস্ত্রির কাজ বছরে তিন-চার মাসের বেশি থাকে না। বেশি ভাড়ায় অন্য জায়গায় উঠে যাওয়ার ক্ষমতা আমার ছিল না। তুমি বিশ্বাস করো বাবা, মেয়েকে আমি ভীষণ আগলে আগলে মানুষ করেছি। স্বভাবচরিত্র খারাপ হতে দিইনি। যত বড় হচ্ছিল, ভয় পাচ্ছিলাম। তাই পাড়ার কথাটা চেপে গিয়ে বিয়েটা দিই..."

আরও কত কী বলে যাচ্ছে ডলির বাবা। বাপি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। চোখে ভাসছে সেই দিনটা, প্রথম যেবার এসেছিল এবাড়িতে... "একটু চা চাপাই? লুচি, পরোটা কিছু করব? খিদে পেয়েছে তো!"

ডলির মায়ের কথায় বর্তমানে ফিরে এল বাপি।

> বাপি বলল, "একটা কথা জানতে এসেছি। আপনাদের এলাকাটার বদনাম আছে। এটা রেড লাইট এরিয়া।

দেখল, ঘরের আবহাওয়া এখন অনেক শান্ত। ডলির বাবা অনেকটাই সামলে নিয়েছে নিজেকে। "না, ভারী কিছু করতে হবে না। খিদে নেই। আপনি বরং একটু চা-ই দিন," বাপি আগের গাম্ভীর্য ফিরিয়ে এনে বলল, "আপনাকে আরও কয়েকটা কথা বলার আছে।"

'জো হুজুর' ভঙ্গিতে সামনে দাঁড়াল ডলির বাবা। চুল্লুর গন্ধটা আরও বেশি করে নাকে এসে লাগছে। মদের গন্ধে নাক সিঁটকানোর ছেলে বাপি নয়। নিজে অনেকবার খেয়েছে। পাড়ার কিছু বন্ধু তো রেগুলার ক্যান্ডিডেট। তবে শ্বশুরের মুখ গন্ধ পাওয়াটা একটু কেমন-কেমন লাগে। অস্বস্তিটা আপাতত সরিয়ে রেখে বাপি বলল, "প্রতাপ কি জানত, এ পাড়াটা খারাপ? সত্যিটাই বলবেন কিন্তু!"

"না, ও জানত না। বছরে এক-দু'বার আসে। তাও দিনের বেলা। তুমিও এলে কয়েকবার। বুঝতে পারলে কিছু?"

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বাপি পরের কথায় গেল, "আপনি মেয়ের হয়ে যতই সার্টিফিকেট দিন, ও কিন্তু আমাদের বাড়ির সঙ্গে মানাতে পারছে না। ইতিমধ্যেই ওর ব্যবহারে দিদি আলাদা হয়ে গিয়েছে। মা-ও হয়তো দিদির বাড়ি চলে যাবে।"

"দু' ঘা দাও না কেন? পুরুষমানুষ হয়েছে, মেয়েছেলেকে তাঁবে রাখতে গেলে মাঝে-মধ্যে দু'-চার ঘা দিতে হবে বই কি!"

বাবা নিজের মুখে মেয়েকে মারতে বলছে! এতেই বোঝা যায়, কী শিক্ষা পেয়ে এখান থেকে গিয়েছে ডলি। বাপির আর কোনও প্রশ্ন নেই। চুপচাপ বসে আছে। যে সমস্যা নিয়ে এখানে এসেছিল, তার কতটা সমাধান হল বুঝে উঠতে পারছে না। তবে প্রতাপের কাছে মাথা হেঁট হল তো বটেই। বাপি মুখ নিচু করে বসে থাকে। পকেটের ছুরিটা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। বরফের মতো ছেঁকা লাগছে থাইয়ে!

বাপির বাড়ি ফিরতে সন্ধে হয়ে গেল। কড়া নাড়ার শব্দ শুনে বিছানা থেকে উঠতে যাচ্ছিল সরমা, দরজা খুলে দেওয়ার শব্দ পেল। ডলি গিয়ে খুলল তার মানে। ঘটনাটা একটু অবাক হওয়ার মতো। স্বপ্না চলে যাওয়ার পর দোর খোলা-বন্ধর দায়িত্ব সরমার। ডলি কোনওদিনই যায় না। আজ যাওয়ার কারণ হয়তো বরের কানে আগে থেকেই নিজের দোষঘাটের অজুহাত দিয়ে রাখা। কিন্তু বাপি কি ওর কথা বিশ্বাস করবে? মনে হয় না। বউয়ের সঙ্গে ইদানীং কথাই বলে না প্রায়। বিয়েটা ভাল হল না বাপির। সবই অদৃষ্ট।

বাপির বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন, সরমাদের পৃথিবীটা সত্যিই অন্যরকম ছিল। উনি চলে যাওয়ার পর থেকে শুরু হল যত ঝামেলা। স্বপ্না ফেরত এল বাপের বাড়ি। বাপির বউটাও সুবিধের হল না। তা হলে কি সরমার কোনও দোষে এ বাড়িতে নেমে এসেছে ভাগ্য বিপর্যয়? সরমার আচার-আচরণে কোথাও কি কোনও ভুল থেকে যাচ্ছে? বিছানায় উঠে বসে সরমা। ডলি বাপিকে চা-জল দিল কি না, কে জানে! বিছানা থেকে নামতে গিয়ে চোখে পড়ে দেওয়ালে টাঙানো কর্তার ছবিতে, হাসছেন উনি। যেন বলছেন, সংসার নিয়ে একটু বেশিই আহ্লাদ ছিল তোমার, এখন বোঝো।

"কী গো, শরীর খারাপ নাকি, ঘরে বসে আছ!"

বাপি এসে দাঁড়িয়েছে। বিছানা থেকে নামতে গিয়েও নামল না সরমা। প্রশ্ন এড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "চা, জল দিয়েছে বউমা?"

"নাঃ। জানে তুমি আছ," বাপি বসে পড়ল মায়ের পাশে।

"তোর এত দেরি হল!"

"ওভারটাইম করতে হয়েছে। বেশ চাপ আছে কাজের।"

মিথ্যে বলল বাপি! আশ্চর্য, ও কিন্তু সত্যি কথাটাই বলতে এসেছিল এ ঘরে। নিজের কাউকে তো বলতে হবে।

"আগে তো ওভারটাইম থাকলে বাড়িওয়ালার ঘরে ফোন করে দিতিস। আজ করলি না কেন?"

"কাজের ঘোরে একদম খেয়াল ছিল না মা।"

"দুপুরে কী খেলি?"

"খেয়েছি, ভাত। অফিসের গলিতে একটা নতুন হোটেল..." বলতে বলতে থেমে গেল বাপি, "তুমি খেয়েছ তো। নাকি আমি আসছি না দেখে খাওয়াই হয়নি?"

"খেয়েছি। অনেক বেলা করে।"

"এটাই তুমি ভুল করো। এই করে শরীর খারাপ করবে। কেন এসব নিয়ম এখনও ধরে বসে আছ? তোমার বউমাকে দেখছ না, কখনও ওয়েট করে আমার জন্য?"

এবারও ছেলের কথা কানে নিল না সরমা। আজকের বিশেষ খবরটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছেলের কানে দিতে হবে। একটু দম নিয়ে সরমা বলল, "ডলির এক পিসতুতো দাদা এসেছিল আজ।"

"জানি, ডলি বলেছে," নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল বাপি।

হতাশ হয় সরমা। দাদাটি কীরকম বস্তু, তা নিশ্চয়ই ডলি বলেনি, "এমন সময় এল, ঘরে কিছু নেই যে দেব।"

"তুমি মিষ্টির দোকানে গিয়েছিলে, তা-ও শুনলাম। দাদাকে প্লেটে মিষ্টি বেড়ে দাওনি, সেকথাও বলেছে।"

"ও, তার মানে সব কথাই শোনা হয়ে গিয়েছে তোমার। তা হলে আবার মায়ের কাছে এসে বসে আছ কেন? বউয়ের হয়ে কথা শোনাতে এসেছ?" সরমা গলায় পুরনো তেজ।

বাপির কোনও হেলদোল নেই। ভাবুক সন্ন্যাসীর মতো বসে আছে। সরমার খটকা লাগে। ছেলে এরকম চুপচাপ হয়ে আছে কেন? কোনও অপ্রিয় কথা বলতে পাঠিয়েছে কি ডলি? বেচারা বলতে পারছে না মায়ের মুখের উপর। সরমা খোঁচাল, "বউমার দাদাকে খাতির করিনি বলে, কিছু বললি না তো!"

অন্যমনস্ক গলায় বাপি বলল, "কী বলব, লোকটাকে নিশ্চয়ই তোমার ভাল লাগেনি। তুমি তো কারও সঙ্গে চট করে খারাপ ব্যবহার করো না।"

"কেন ভাল লাগেনি, সেটা তো জানতে চাইবি?" সরমার গলায় অধৈর্যের স্বর।

বাপি বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ায়। দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বলল, "ডলিদের ফ্যামিলির সঙ্গে আমাদের আচার ব্যবহার মেলে না, সে তো

সরমা মুশকিলে পড়েছে খুব! ডলির দাদা ঠিক কতটা অভদ্র, সেটা জানা দরকার তাঁর ছেলে বাপির।

জানি। পিসতুতো দাদা আর কত ভাল হবে!"

সরমা পড়েছে মুশকিলে! ডলির দাদা ঠিক কতটা অভদ্র, সেটা জানা দরকার বাপির। কিন্তু ছেলে যে বলার সুযোগই দিচ্ছে না। তারপর আছে দরজা-জানলা বন্ধ করে দাদার সঙ্গে ডলির গল্প। মিষ্টি নিয়ে ফেরার পর সরমা দেখেছিল, ডলির আলুথালু চেহারা। যা দেখে অনেক খারাপ ভাবনা মাথায় আসে, এদিকে প্রমাণ করা যায় না কিছুই। ছেলেকে কথার হাবে-ভাবে আশঙ্কাটা বোঝাতে চাইছিল সরমা, সম্ভব হচ্ছে না। বোঝা যাচ্ছে না বাপি কেন এত অন্যমনস্ক! পরিস্থিতি অনুকূলে নয় দেখে সরমা বলল, "যাই, তোর জন্য চা চাপাই। মুড়ি-টুড়ি কিছু খাবি তো?"

বাপি কোনও উত্তর না দিয়ে মায়ের দিকে একবার তাকাল। ওর চাউনিতে অন্য কোনও অব্যক্ত কথা, সরমা টের পায় না।

বাপি ধীর লয়ে পায়চারি করে ঘরে। ডলির পাড়ার আসল পরিচয়টা মা'কে বলতে এসেছিল, পারল না। ডলিকেও জানাতে পারেনি, গিয়েছিল বীরনগরে। ওর বাবা স্বীকার করেছে, পাড়ার বদনাম। আজ না হয় কাল ডলি জানতে পারবে, বাপি তাকে না জানিয়ে বীরনগর ঘুরে এসেছে। ডলি তারপর কী মূর্তি ধরবে, বাপির অজানা। আজকের ঘটনাটা ডলিকে শুনিয়ে রাখাই ভাল। কিন্তু বাপি পারছে না। বুকে দপচাপা কথা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাউকে না বলা পর্যন্ত স্বস্তি পাবে না। বাড়ির সামনে আলো-অন্ধকার রাস্তার দিকে চেয়ে থাকে বাপি। সরস্বতী পুজোর আগের দিন বাবা ঠাকুর নিয়ে রিকশায় চেপে বাড়ি ফিরত। পুঁচকে ঠাকুর, কিন্তু কী সুন্দর দেখতে! রিকশার আওয়াজ শুনে বাপি আর দিদি ছুটে যেত বাইরে...ছবিটা ফিরে একঝলক দেখতে পেল বাপি। অচিরেই বাবা, রিকশা, ঠাকুর, দিদি, বাপি সন্ধের অন্ধকারে হারিয়ে গেল। শুধু পুজোর গন্ধমাখা হাওয়াটা বইছে বাইরে।

পাঁচ কাঠা জমির মাঝে অমিতেশদের একতলা বাড়ি। কাঠা দু'য়েক জুড়ে বাড়িটা। চারপাশে খোলা জায়গা। অনিয়মিত পরিচর্যার বাগান। বাবা রেলের বড় অফিসার ছিলেন। বদলির চাকরি করেছেন সারা জীবন ধরে। ছেলে-মেয়ে বড় হতে কানাইপুরে জমি কিনে পরিবারকে থিতু করেন। অবিকল রেলের বড় কর্তার বাংলোর আদলে বানালেন বাড়িটা। এতটাই মিল, এলাকার লোক এখনও বাড়িটাকে 'রেলবাড়ি' বলেই ডাকে। চাকরিতে থাকাকালীন বাবা বাগানের খুব যত্ন নিতেন। রিটায়ারমেন্টের পর থেকে একটু ঢিলে পড়েছে। ঝোপজঙ্গল মতো হয়ে আছে বাগানটা। বাড়ির পোড়া লালচে রঙটাও কালচে মেরে গিয়েছে। গত দু' বছর আগে অফিশিয়াল কাজে অমিতেশ এসেছিল কলকাতায়। দু' রাত কানাইপুরের বাড়িতে ছিল। টের পেয়েছিলে, বাড়িটা পুরনো হয়ে আসছে, রেনোভেশনের খরচ এত বেড়ে গিয়েছে, পেনশনের টাকায় বাবা হয়তো সামলে উঠতে পারছেন না। টাকা দিতে চেয়েছিল অমিতেশ। কিন্তু বাবা বলেছিলেন, "কী দরকার এতগুলো টাকা খরচ করার? বেশ তো চলে যাচ্ছে। তেমন প্রয়োজন হলে তোমাকে বলব।" অমিতেশ আর জোর করেনি। এ বাড়িতে না থাকার কারণে সেই অধিকারে সামান্য ঢিলে পড়েছে। বাবা অরাজি হওয়ার দুটো কারণ সে আবিষ্কার করে। প্রথমত, বাবার অহঙ্কার, ছেলের কাছে হাত পাতব না। পরের কারণটা বেশ মজার, বাড়ির রং বাবা পাল্টাবে না! রেলের পোড়া লালচে রং বাবার মজ্জায় ঢুকে গিয়েছে। ছোটবেলায় অমিতেশ, খুকু আলোচনা করত, বাবা তো রেলের অনেক ভাল-ভাল বাংলো দেখেছে, কোনও একটা পছন্দ হয়েছিল খুব। সেই বাংলোর আদলেই এই বাড়িটা বানিয়েছে। সেটা যে কত কাজের হয়েছে, এবার কানাইপুরে এসে হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছে অমিতেশ। আগের বার যখন এসেছিল, নিজের এলাকার উপর সেভাবে নজর দেয়নি। মন পড়েছিল অফিসের কাজে। এবার আছে ছুটিতে। কানাইপুর ভীষণ ঘিঞ্জি হয়ে গিয়েছে। তবু তাদের বাড়িতে আলোর অভাব নেই। অনেকটা জমির মাঝে বাড়ি করার সুবিধেটা এখন বোঝা যাচ্ছে। বাড়ির পুরনো ভাবটা মন্দ লাগছে না অমিতেশের। পুরনো তো সে-ও হয়েছে। মাঝের তিনদিন বাড়িতে শুয়ে-বসে কাটিয়েছিল অমিতেশ। যেদিন এসেছিল, রাতের দিকে নন্দার বাবা, মা'র সঙ্গে দেখা করেছিল। কানাইপুরে আসার কারণটা বাড়িতে যা বলেছি, একই কথা বলেছি তাঁদেরও। বাড়ির লোকের মতো তাঁরাও আশান্বিত হয়ে জানতে চেয়েছিলেন, তা হলে কি এবার সংসার নিয়ে কানাইপুরে চলে আসবে অমিতেশ? উত্তরে অমিতেশ বলেছিল, সেটা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। পুরো গল্পটাই বানানো। কলেজের ইন্টারভিউটা ছাড়া আর কোথাও যায়নি অমিতেশ। কোনও খোঁজখবরও নেয়নি। বাড়িতে বসে-বসে দাড়িগোঁফ বাড়িয়েছে।

ক্রমশ

অলঙ্করণ: নির্মলেন্দু মণ্ডল

অমিতেশ এখন দাড়ি কাটতেই বসেছে নিজের

পর্ব ৭

ঘরের বড় আয়নার সামনে। ঘরে থই থই করছে সকালবেলার আলো। আলোর বয়স হয় না। ছোটবেলার মতোই লাগছে সকালটা। ক্লাস সিক্স থেকে এই ঘরটা তার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল। একা থাকতে এতটুকু ভয় পেত না অমিতেশ। বাবা-মা'র তা নিয়ে একটু গর্বও ছিল। বন্ধু-পরিজনদের শোনাত, 'আমাদের অমুর কোনও ঝামেলা নেই। দিব্যি একা-একা থাকতে পারে। খুকুকে নিয়েই বড্ড সমস্যা। কোনও না-কোনও রোগে ভুগছে। সব সময় তোলা-তোলা করে রাখতে হয়।' সত্যিই খুকু ভীষণ ভুগত। সামান্য ঠান্ডা হাওয়া-বৃষ্টিতেই জ্বর, সর্দি। একদম খেতে চাইত না। মামস, পক্স, হাম, জন্ডিস বারবার হয়েছে ওর। অবশেষে কোনও একটা মেয়েলি রোগ স্থায়ী হয়ে যায়। তাই খুকুর বিয়ে দেওয়া যায়নি। রোগটা ঠিক কী, আজও জানে না অমিতেশ। জানতে চায়ও না। বোনটার জন্য কষ্ট হয়। কিন্তু কী-ই বা করার আছে। বিয়ে না হওয়া নিয়ে খুকুর কোনও দুঃখ আছে কি না, বোঝা যায় না। গানটা ভাল গায়। সময় কাটায় গানের টিউশনি করে। প্রচুর স্টুডেন্ট হয়েছে ওর।

ইন্টারভিউ দিয়ে কলকাতার হোটেলে এক রাত কাটিয়ে অমিতেশ প্রথমে বিজনের ওয়র্কশপে যায়। বিজন আকাশ থেকে পড়ে জিজ্ঞেস করেছিল, "বাড়ি ঢুকিসনি! সঙ্গে ব্যাগ-ফ্যাগ কেন?"

"বলছি। এক গ্লাস জল খাওয়া আগে।"

বিজনের ফোকলা হেল্পার জলের বোতল এনে দিয়েছিল। জল খেয়ে ধাতস্ত হয়ে অমিতেশ বলল, "কানাইপুর স্টেশনে নেমেই তোর কথা ভীষণ মনে পড়ল। ভাবলাম যাই, দেখা করে আসি আগে। বাড়ি গেলেই তো আত্মীয়স্বজনের ঘেরাটোপে পড়ে যাব।"

মিথ্যেটা অবলীলায় বিশ্বাস করে গেল বিজন। বরাবরই সোজাসাপটা ছেলে। অমিতেশের বিজনের কাছে যাওয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল, ওকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে ঢোকা। একা যদি ঢুকত অমিতেশ, অনেক বিস্ময় মেশানো প্রশ্ন ধেয়ে আসত। যার নির্দিষ্ট কোনও উত্তর ছিল না ওর কাছে। বিজনকে নিয়ে ঢুকলে প্রশ্নগুলো সহসা আছড়ে পড়বে না। যতই হোক, বিজন পরিবারের বাইরের লোক। ইতিমধ্যে অমিতেশ নিজেকে গুছিয়ে নিতে পারবে। কৌতূহলও খানিক আলগা হয়ে যাবে অন্যদের। প্ল্যানটা খেটে গিয়েছিল অমিতেশের। বিজনের উপস্থিতিতে প্রশ্নগুলো সেভাবে ওঠেনি। অস্বস্তি ঢাকতে বাড়ি ঢুকেই বিজন গলা তুলল, "খুকু দ্যাখ, কাকে নিয়ে এসেছি। আমি এলে এমনি-এমনি আসি না। এ বাড়ির সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটা নিয়ে আসি।"

অমিতেশকে দেখে ততক্ষণে বাবা, মা, বোনের চোখে আনন্দ, বিস্ময় একসঙ্গে! বিজনের কথার সূত্রে খুকু বলল, "বাজে কথা বোলো না। বন্ধু না থাকলে তো টিকিটিও দেখা যায় না।"

মা বিজনের হয়ে বলল, "ওদের আর দোষ কী বল? এখন তো আর সেই বেকার ছেলে নেই। আড্ডা মারার সময় কোথায়? সবারই সংসারধর্ম রয়েছে।"

আধ ঘণ্টা থেকে হইচই করে বিজন চলে গেল। যাওয়ার আগে বলেছিল, "কাল তা হলে চলে আয় ওয়র্কশপে।"

"কাল-পরশু হয়তো হবে না। কাজের খোঁজ যেতে হবে কলকাতায়। পরের দিন যাচ্ছি।"

কলকাতায় যাওয়া হয়নি। এখনও অবধি কোনও প্রশ্ন করেনি বাড়ির লোক। কেন করছে না, সেই নিয়ে বেশ চিন্তায় আছে অমিতেশ। ইনফ্যাক্ট, তার হঠাৎ আসার কারণটা জানতে চাইছে না বাড়ির কেউই। অমিতেশ যতটুকু বলেছে, শুনে বসে আছে। ওরা হয়তো ভাবতেই পারছে না, ও দিল্লি ছেড়ে এখানে এসে থাকতে পারে। অথবা এরা চায় না, অমিতেশ এখানে এসে থাকুক। অমিতেশ অর্থে, ওর পুরো সংসার। নন্দাকে এ বাড়ির কারওরই তেমন পছন্দ নয়। কারণটা অতি তুচ্ছ। যদি একসঙ্গে থাকা হত, ধীরে-ধীরে মিটে যেত সমস্যাটা। থাকল না অমিতেশ। চলে গেল দিল্লি। নন্দা স্বস্তি পেয়েছিল। মন দিয়ে নিজের সংসার গুছিয়েছে। বেচারি জানেই না, সেই দিল্লিতে এখন আর একদম ফেরার ইচ্ছে নেই অমিতেশের!

দাড়ি কাটা হয়ে গিয়েছে। গালে আফটার শেভ লোশন লাগাতে লাগাতে অমিতেশ আবিষ্কার করল, তাকে এখনও সুন্দর দেখতে! জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই শুনে আসছে, সে সুন্দর। ছোটবেলায় পাড়ার দিদিরা গাল টিপে শেষ করে দিত। বড় হতে-হতে গোলগাল চেহারা ভেঙে বেরিয়ে এল এক সুপুরুষ। স্কুল, কলেজের সহপাঠীরা ঈর্ষাহীনভাবে মেনে নিত অমিতেশের সৌন্দর্য। একমাত্র ও নিজেই এই ব্যাপারটাকে পাত্তা দিত না। পোশাকআসাক, চুলের যত্ন নিয়ে তার আলাদা কোনও নজর ছিল না। ভাল দেখতে হওয়া ব্যাপারটা, কিছুটা মেয়েলি মনে হত তার। তখন সিনেমায় লালটুমার্কা নায়কের দিন শেষ। অমিতাভ বচ্চন মধ্য গগনে। 'দিওয়ার' সিনেমার ডায়লগ গড়গড় করে বলতে পারত অমিতেশ। কুনাল বলত, "আমি সিনেমা করলে তোকে নায়ক করবই!" স্কুলের শেষ আর কলেজের গোড়ায় এরকমই একটা ঘোরের মধ্যে থাকত অমিতেশরা। ক্রমশ রুচি বদলাতে লাগল তাদের। ততদিনে হিন্দি সিনেমায় বদল এনে দিয়েছে পরের পর বাস্তবধর্মী শিল্পসম্মত ছবি। সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন ছবি করছেন। মঞ্চে ফিরে এসেছেন শম্ভু মিত্র। অমিতেশরা টের পেল, তারা এসে পড়েছে বিশাল এক শিল্প-অঙ্গনে। বিকাশ ভট্টাচার্য, গণেশ পাইনের ছবি দেখে চমকে উঠছে। বুঝতে শিখছে সোমনাথ হোড়ের কাজ। কার্তিক সেজে মেয়ে পটানোর আগ্রহ তখন খুব খারাপ চোখে দেখত অমিতেশরা...

বাংলা কাগজটা উল্টাতে থাকল অমিতেশ। গত তিনদিনের কাগজ মন দিয়ে পড়েছে। এই কাগজটা দিল্লির বাড়িতেও নেওয়া হয়। কাগজ আসতে আসতে দুপুর। রাতে ফেরার পর কাগজ দেখার ইচ্ছে আর থাকে না। নন্দা নিয়মিত পড়ে। অমিতেশের আগ্রহ থাকতে পারে, সেরকম নিউজগুলো খাবার টেবিলে শুনিয়ে দেয়। বাংলা অক্ষর অনেকদিন সেভাবে পড়া হয় না। এবার বাড়িতে এসে খুব পড়েছে অমিতেশ। বাংলা গল্প, উপন্যাস, কবিতা, চিত্রকলা নিয়ে প্রবন্ধ... বইগুলো একসময় নিজেই কিনেছিল। কিছু বই দিল্লি নিয়ে গিয়েছে, বাকি রয়ে গিয়েছিল এখানেই। বইগুলোর মধ্যে সহজেই ঢুকে পড়তে পেরেছে, নিউজপেপারটাই ক'দিন ধরে ভীষণ অনাত্মীয় ঠেকছে। বিজ্ঞাপন বাদ দিয়ে যে সামান্য খবর ছাপা হচ্ছে, বেশিরভাগটাই রাজনীতির। আর্ট অ্যান্ড কালচারের নিউজ প্রায় নেই বললেই চলে। পলিটিক্সের প্যাঁচ-পয়জারগুলোও ঠিক বুঝে উঠছিল না অমিতেশ।

একথালা লুচি-তরকারি নিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল মা। মেনুটা আগেই আন্দাজ করেছিল অমিতেশ। বাড়ি জুড়ে লুচির গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল, "এত ক'টা দিয়েছ কেন! আমি ভাজাভুজি এখন এত খাই না।"

"খা তো, কিছু হবে না। দিন-দিন চেহারাটা দড়ি পাকিয়ে যাচ্ছে," অমিতেশের সামনে থালা রেখে টেবিলের অপর প্রান্তে বসল মা।

খেতে শুরু করল অমিতেশ। মায়ের হাতের রান্না খুবই ভাল। খ্যাতি আছে পরিজনদের মধ্যে। দেখতেও অন্নপূর্ণা টাইপ। আচরণে কোনও অহংকার নেই। বরং সবসময় একটা সসংকোচ ভাব। অথচ নন্দার বক্তব্য, মা নাকি আকারে-প্রকারে জানিয়েছে, তার রাজপুত্রের মতো ছেলের কুরূপা পুত্রবধূ পছন্দ হয়নি! অমিতেশ একথা বিশ্বাস করে না। কারণ, দেখতে সুন্দর নিয়ে মায়ের কোনওদিনই কোনও আদিখ্যেতা ছিল না।

"কোথায় বেরবি এখন?"

মায়ের প্রশ্নে মুখ তুলল অমিতেশ, "যাই, একটু এদিক-ওদিক ঘুরে আসি। এসে থেকে তো বাড়িতেই আছি।"

" হ্যাঁ, তাই তো দেখছি। এদিকে তুই যে বললি, দু'-একটা ইন্টারভিউ দিবি, তার কী হল?"

উত্তর না দিয়ে খাওয়া শেষ করছিল অমিতেশ।

যথাসম্ভব উদ্বেগ গোপন করে মা ফের বলল, "হ্যাঁ রে, তুই কি কোনও অশান্তিতে আছিস?"

গ্রাসটা গলায় গিয়ে আটকে গেল। মায়ের পক্ষে আন্দাজ করা অসম্ভব, কী নিয়ে বিমর্ষ হয়ে আছে অমিতেশ। তবু প্রশ্নটা ভীষণ হৃদয়স্পর্শী। ঢোঁক গিলে বলল অমিতেশ, "সেরকম কিছু নয় তো!"

"কিন্তু কেন যেন, তোকে এবার একটু মনমরা লাগছে।"

মিথ্যে হাসে অমিতেশ, "আসলে এক ধরনের চাকরি করতে করতে টায়ার্ড হয়ে গিয়েছি। কাজটা বদলাতে পারলে ভাল হত।"

"বদলে নে। তুই তো স্টুডেন্ট হিসেবে যথেষ্ট ভাল। যে কেউ লুফে নেবে।"

"নিল না তো। আর্ট কলেজে ইন্টারভিউ তো দিতে গিয়েছিলাম।"

"শুনেছি। বাবাকে যখন বলছিলি, আমি কাছেই ছিলাম। মনে হয়, ওদের লোক ঠিক করাই ছিল। তুই অন্য জায়গায় চেষ্টা কর।"

একথালা লুচি-তরকারি নিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল মা। বাড়ি জুড়ে লুচির গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল, "এত ক'টা দিয়েছ কেন!"

সরল মানুষের সহজ সমাধান! অমিতেশের সমস্যা, মানে, ছবি আঁকতে না পারাটা মাকে চট করে বোঝানো যাবে না। খাওয়া শেষ হয়ে এসেছে। অমিতেশ বলল, "চা দেবে তো?"

"হ্যাঁ দিচ্ছি। করাই আছে ফ্লাস্কে।"

টেবিলে রাখা আছে ফ্লাস্ক। মা চা ঢালছে কাপে। উঠে দাঁড়ায় অমিতেশ, "বাবা এখনও ফিরল না!"

"এমনিতেই বাজারে গিয়ে দেরি করে, এখন তো তুই এসেছিস। কালই বলছিল, অমুকে কাজলি মাছ খাওয়াতে হবে। ওখানে তো এসব মাছ পায় না। দেখ, হয়তো সেই মাছওয়ালার জন্য বসে আছে।"

রাশভারী চেহারার বাবা, ছেলের জন্য মাছ আনবে বলে বাজারে অধীর অপেক্ষা করছে, দৃশ্যটা কল্পনা করা শক্ত! তবু এটাই সত্যি। অমিতেশ নিজে বাবা হওয়ার পর সেটা বুঝেছে। চা শেষ। বাড়ির বাইরে যাওয়ার আগে বহু সময় ধরে চেপে রাখা প্রশ্নটা অমিতেশ করেই ফেলল, "আচ্ছা মা, আমি এবার কতদিনের জন্য থাকব,

তোমরা তো একবারও জানতে চাইছ না?”

“জানি তো। বউমা ফোন করে বলেছে তোর বাবাকে।”

রীতিমতো চমকাল অমিতেশ, “নন্দা ফোন করেছিল, তোমরা আমায় বলোনি তো?”

“আমি ভাবলাম, তুই জানিস।”

পায়ে-পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল অমিতেশ। মা বোধ হয় ধরেই নিল, নন্দার সঙ্গে ঝগড়া করে অমিতেশ এ বাড়ি এসেছে। ধারণাটা না হয় পরে শুধরে দেওয়া যাবে। কিন্তু একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল, অমিতেশ যতই ভাবুক, সে ক’দিন একটু নিজের মতো কাটাবে, তা হওয়ার নয়। নন্দা ঠিকই নজরদারি জারি রেখেছে। বাড়ির গেট খুলে রাস্তায় এসে পড়েছে অমিতেশ। মায়ের কাছে জানা হল না, অমিতেশের এ বাড়ি থাকার মেয়াদ ক’দিন ঘোষণা করেছে নন্দা। একই সঙ্গে এটাও মনে পড়ছে না, এখানে আসার আগে নন্দাকে কতদিনের কথা বলে এসেছে সে। হাঁটতে-হাঁটতে পাঞ্জাবির পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে। স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে ভাবে, নন্দাকে একটা ফোন করবে কি? পৌঁছনোর সংবাদ পর্যন্ত দেয়নি। মেয়েটা কী মনে করছে, কে জানে! যদিও এই ঘটনা আগেও ঘটেছে। সে ক্ষেত্রে নন্দা নিজেই ফোন করে নেয়। এবার করেনি, বাপেরবাড়ি, শ্বশুরবাড়িতে ফোন করে অমিতেশের খবর পেয়ে গিয়েছে। অমিতেশেরই এখন ফোন করা উচিত। কিন্তু ইচ্ছেটা তেমন জোরালো হচ্ছে না। নন্দা ফোন ধরার পরই ছেলে দু’টোর সঙ্গে কথা বলাবে। ওরা এখনও স্কুলে বেরয়নি। ছেলেরা জানতে চাইবে, কবে ফিরবে বাবা? কিছুই ঠিক করা নেই। টিকিটও কাটেনি অমিতেশ। কী উত্তর দেবে? এখনও পর্যন্ত মনস্থির করতে পারেনি, অ্যাড কম্পানির কাজটা ছেড়ে, কী ধরনের কাজ করবে। কারও সঙ্গে যোগাযোগও করা হয়নি। ফোনটা পকেটেই রেখে দেয় অমিতেশ। দুই ছেলের ডাক সে অগ্রাহ্য করতে পারবে না।

> কৃষ্ণা প্রাইম টাইমে খোলা মনে হাসছে! প্রেমিকের উপস্থিত ছাড়া এই পরিস্থিতি কল্পনাই করা যায় না।

আবার ফিরতে হবে পুরনো চাকরিতে। কিন্তু অমিতেশকে যে করেই হোক নিজস্ব আঁকার জগতে ঢুকতেই হবে। এতদিনের অনভ্যেস, সময় একটু লাগবেই।

ফ্ল্যাটে বসবাস বিজনের একেবারেই পছন্দ নয়। কৃষ্ণার ইচ্ছেতেই থাকতে হচ্ছে। প্রতিবেশীর সঙ্গে গা ঘেঁষে থাকা অসহ্য লাগে। কোনও প্রিভেসি নেই। নিজের ঘরে নীরবে বসে থাকাও এখানে ঝুঁকির! হয় তুমি পাশের ফ্ল্যাটের দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাবে অথবা শীৎকার। আরও নানা অবাঞ্ছিত শব্দও শুনতে হতে পারে। কিছুই করার নেই। সবাই যে যার অংশের মালিক। কানাইপুর থেকে দু’ কিলোমিটার দূরেই আকডাঙা। সেখানে ফাঁকা জমি কত সস্তায় পাওয়া যাচ্ছিল। বিজন কৃষ্ণাকে প্রস্তাব দিয়েছিল, আকডাঙায় জমি কিনে ছিমছাম একতলা বাড়ি করার। রাজি হয়নি কৃষ্ণা। ওর বক্তব্য, আকডাঙা পঞ্চায়েত এলাকা। কোনও স্ট্যান্ডার্ড লোক থাকে না। আত্মীয়-বন্ধুকে ডাকা যাবে না ও বাড়িতে। মেয়েটা অমানুষ তৈরি হবে ওই খারাপ পরিবেশে। তা এখানকার পরিস্থিতি কী এমন ভাল! মদ খেয়ে বউ পেটানো, ভিত কাঁপিয়ে সিডি প্লেয়ার চালানো...বন্ধ রাখা ফ্ল্যাট খুলে যায় সপ্তাহান্তে। কলকাতা থেকে ফুর্তির আসর বসাতে আসে ফ্ল্যাটের মালিক। এসবের মধ্যেই বড় হচ্ছে বুলান। মানুষ কতটা হচ্ছে, কে জানে!

তবে ফ্ল্যাটবাড়ির সব বাসিন্দাই যে খারাপ, তা নয়। ভাল লোকও আছে। একে-অপরের বিপদে এগিয়ে আসে। যেচে খবর নেয় লোকবলহীন নিঃসঙ্গ ফ্ল্যাট বাসিন্দার। প্লেট ঢাকা দেওয়া তরকারির বাটি পাশের ফ্ল্যাটে যায়। এসব স্বভাব তাদেরই আছে, একসময় যারা একটা পরিবারতুল্য পাড়ায় বসবাস করেছে। অনেকটা বিজনের মতোই। বিজনদের একটাই মস্ত বড় সুবিধে, তাদের ফ্ল্যাটটা গ্রাউন্ড ফ্লোরে। সামনের দিকে দোকান। পাশের সরু প্যাসেজ দিয়ে এগোলে প্রথম ফ্ল্যাটটাই ওদের। এই অ্যাপার্টমেন্টের অন্য বাসিন্দার সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার সম্ভবনা কম। জোর করে হাসার ব্যাপার নেই। সিঁড়ি, লিফ্‌ট যেহেতু ব্যবহার করতে হয় না, ঢোকা-বেরনোটা নিজের বাড়ির মতোই।

সকালের বাজার সেরে প্যাসেজে ঢুকল বিজন। গ্রিল ঢাকা বারান্দার সামনে একটু থমকে দাঁড়াল। অল্প ফাঁক করা দরজা গলে হাসির শব্দ ভেসে আসছে। মহিলাকণ্ঠ। আর একটু মন দিয়ে শোনার পর গলাটাও চেনা গেল। কৃষ্ণার হাসি। অনেকদিন এরকম প্রাণ খুলে হাসতে শোনা যায়নি কৃষ্ণাকে। তাই সময় লাগল চিনতে। কিন্তু কার সামনে এত হাসছে কৃষ্ণা? ডি এম চলে এল কি ফ্ল্যাটে? আসতেই পারে, তবে সময়টা মোটেই সুবিধেজনক নয়। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কৃষ্ণার অফিস বেরনোর কথা। তারপরই বুলান যাবে স্কুলে। এই টাইমে বাড়ি যুদ্ধক্ষেত্রের টেন্টের মতো নীরব থাকে। কৃষ্ণাকে যতটুকু চেনে বিজন, ‘কামাই’ শব্দটা ওর অভিধানে নেই! বিছানায় শুয়ে না পড়া পর্যন্ত অফিস যাবেই। মেয়েকেও স্কুলে ডুব মারতে দেয় না। সেই কৃষ্ণা নাকি এরকম একটা প্রাইম টাইমে খোলা মনে হাসছে! একমাত্র প্রেমিকের উপস্থিত ছাড়া এই পরিস্থিতি কল্পনাই করা যায় না।

ক্রমশ

অলঙ্করণ: নির্মলেন্দু মণ্ডল

গ্রিল গেটে আওয়াজ না করে বিজন সাইকেলটা

আট পর্ব

তুলল বারান্দায়। সাইকেল স্ট্যান্ড করে সামান্য পাল্লা খোলা দরজার সামনে দাঁড়াল বিজন। ঘরের ভিতরটা দেখা যাচ্ছে না, পর্দা টানা। নক করবে কি? সেটা যেন কেমন লাগে! দরজা খোলা থাকতেও নিজেদের বাড়িতে কড়া নাড়া! ঘরে যখন মেয়ে, বউ রয়েছে। কৃষ্ণার অতিথিই বা কী মনে করবে? এদিকে ভিতরে হইহল্লা খুবই প্রাণোচ্ছল। এই সময় ঢোকাটাও কেমন যেন ট্রেসপাসার মনে হচ্ছে। সাইকেলের ঘণ্টি বাজাবে কি একবার, যদি ওরা কেউ বেরিয়ে আসে চেনা আওয়াজ শুনে? আসবে না। মেয়েটা যখন ছোট ছিল, তখন আসত।

এই সময় দরজা খুলে গেল হাট করে। সামনে কৃষ্ণা, "কী হল, ঢুকেছ তো অনেকক্ষণ। সাইকেলের আওয়াজ পেলাম। ঘরে ঢুকছ না কেন? ভিতরে এসো। দেখ কে এসেছে!" পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে যায় কৃষ্ণা। বিজন অতি সঙ্কোচে অনুসরণ করে। ড্রইংরুমে পা রাখতেই মাথাটা হালকা হয়ে গেল! ডি এম নয়। অমিতেশ বসে আছে।

"কী রে, ওয়র্কশপে না গিয়ে এখানে চলে এসেছিস?"

মানে বুঝতে না পেরে অমিতেশ ঘাড় ঘোরায় কৃষ্ণার দিকে।

বিজনের হাত থেকে বাজারের থলি নিয়ে কৃষ্ণা বলল, "ছোটবেলার বন্ধু বাড়িতে না এসে কাজের জায়গায় দেখা করতে যাবে কেন!"

কৃষ্ণার সমর্থনে বিগলিত হেসে সোফায় বসে বিজন। কৃষ্ণা ভাল করেই জানে, এই ফ্ল্যাটটার চেয়ে ওয়র্কশপটাকেই নিজের জায়গা বলে মনে করে বিজন। বন্ধু-পরিজনরা ওখানেই যায় দেখা করতে। কৃষ্ণা তাতে স্বস্তিই বোধ করে। অমিতেশের সামনে পাল্টি খেল। হাত থেকে বাজারের ব্যাগ নেওয়াটাও ফলস জেসচার। অন্যদিন কিচেনে গিয়ে ব্যাগ রেখে আসতে হয় বিজনকে। কৃষ্ণা কেন এমন করছে, বোঝা যাচ্ছে না। তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক যে খুব একটা ভাল অবস্থায় নেই, সেটা কারও সামনেই গোপন করে না কৃষ্ণা। অমিতেশের সামনে কেন করছে? মুখটা হাসি-হাসি করে রাখলেও, কপালে একটা ভাঁজ পড়ে গেছে বিজনের। তা দেখে নিজের মতো মানে করে অমিতেশ জানতে চায়, "কী ব্যাপার, ফ্ল্যাটে এসে ভুল করলাম নাকি?"

বিজন যেন লজ্জা পায়, "না না, ভুল কেন হবে! আসলে ওয়র্কশপেই তো দিনের বেশি সময়টা থাকি। সবাই ওটাকেই আমার ঠিকানা ভাবে! যাক গে, চল ওয়র্কশপেই যাই।"

অমিতেশ একটু অবাক হলেও উঠে পড়ে। তারপর গলা তোলে ভিতরের ঘরের উদ্দেশে, "কৃষ্ণা, এগোলাম।"

বুলান এসে দাঁড়াল দরজায়, "মা বাথরুমে ঢুকেছে। তুমি আবার আসবে কিন্তু কাকু। সন্ধেবেলায়। এই সময় এলে ভাল করে কথা বলা যায় না।"

"আসব," বলে ঘর থেকে বিজনের সঙ্গে বেরিয়ে গেল অমিতেশ।

কানাইপুরের রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছে দুই বন্ধু। বিজন পাশে সাইকেলটা গড়িয়ে নিয়ে চলেছে। পিচের রাস্তা হলেও, তেমন মসৃণ নয়। সওয়ারিহীন সাইকেল লাফাচ্ছে। আওয়াজ উঠছে ঝনঝন। মাথা নিচু করে হেঁটে যাচ্ছিল

অমিতেশ। কিছু ভাবছে। সাইকেলের ঝনঝনানিতে বিরক্ত হল, "সাইকেলটা আবার নিলি কেন? আমরা তো হেঁটেই যাব।"

"তুই তো আর সারাদিন আমার সঙ্গে থাকবি না। বাহনটাকে কাছে রাখতে হবে। বিজ়নেসের কাজে সারাদিনই এলাকায় চক্কর কাটতে হয়।"

"স্কুটার কিনিস না কেন?"

"আমার বিজ়নেসে যা লাভ, তেলের খরচ পোষাতে পারব না। তা ছাড়া সাইকেলেই বেশ কমফর্টেব্‌ল ফিল করি।"

"লাভ নেই যখন, সেই ব্যবসা করে যাচ্ছিস কেন?"

"সুট করে গিয়েছে। এই বয়সে নতুন করে একটা ব্যবসার ঝক্কি নেওয়া বেশ কঠিন। পুঁজির ব্যাপার আছে...হ্যাঁ রে, জলখাবার খেয়ে বেরিয়েছিস তো? আমার ফ্ল্যাটে এখন এমন তাড়াহুড়ো, তোকে অফার করা হল না!"

কথাটা যেন শুনতেই পেল না অমিতেশ। একটু পরে মুখ তুলে বলল, "তোর ব্যবসা যেমনই চলুক, তুই তো অভাবে নেই। কৃষ্ণা চাকরি করে। স্কুটার তুই অনায়াসে কিনতে পারিস।"

হেসে ফেলল বিজন, "তোর কী হল বল তো, স্কুটার-সাইকেলের পিছনে পড়ে গেলি?"

নাক দিয়ে কানাইপুরের কিছুটা হাওয়া বুকে পুরে অমিতেশ বলল, "তুই বদলালি না। চুল, দাড়ি, সাইকেল, পাঞ্জাবি, সব এক!"

"তাতে অসুবিধেটা কোথায়?" হাসিমুখে জানতে চাইল বিজন।

"আছে, গভীর অসুবিধে!" প্যান্টের পকেট থেকে দামি ব্র্যান্ডের সিগারেটের প্যাকেট বের করল অমিতেশ। নিজে একটা ধরিয়ে বিজনকে বলল, "খাবি?"

বিজন মাথা নাড়ল। সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল অমিতেশ। বিজন ওর ভঙ্গিটা মন দিয়ে দেখল। আগের চেয়ে আরও ভাল দেখতে হয়েছে অমিতেশকে। রাস্তার লোকজনের চোখ থমকাচ্ছে ওর উপর। যুবক বয়সেও অমিতেশ নজর কেড়ে নিত আশপাশের লোকের। অদ্ভুত একটা ক্লাসিক টাইপ রূপ ছিল। যেন গ্রিক যুবরাজ। এখন একটা অন্য উজ্জ্বলতা ঘিরে রয়েছে ওকে। এটা হয়তো অতি স্বচ্ছল জীবন-যাপনের প্রতিফলন।

দ্বিতীয়বার ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে অমিতেশ জানতে চাইল, "আমাদের মধ্যে কুনালেরও গাড়ি আছে না?"

"বোধ হয় আছে।"

"বোধ হয় কেন? বছরদশেক আগে থেকেই তো ওকে গাড়ি নিয়ে চলাফেরা করতে দেখেছি কলকাতায়।"

"এই দশ বছরে কতবার যে গাড়ি বিক্রি করেছে, কিনেছে, হিসেব রাখা কঠিন! কানাইপুরে যতবার এসেছে, প্রতিবারই অন্য গাড়ি। এই নিয়ে বলতে গেলে, শালা বলে কী জানিস, 'তোরা তো আমায় চিনিস, কোনও কিছুর সঙ্গেই আমি একটানা লেগে থাকতে পারি না। বদলানো স্বভাবটা বাড়ি, গাড়ির উপর দিয়ে যাচ্ছে, একদিকে ভাল। বউটা তো এক রেখে দিয়েছি।'"

"শালা শুয়োর, তোকে যে তুলিকা সারাজীবন ধরে সহ্য করে যাচ্ছে, সেটা দেখলি না?" কুনালের উদ্দেশে বলল অমিতেশ।

"তা যা বলেছিস! তবে এটাও মানতে হবে, তুলিকাকে বিয়ে করার পর কুনাল পুরোপুরি সতী হয়ে গেল। ওর মতো ভয়ঙ্কর মেয়েবাজ ছেলের এরকম বদল, ভাবাই যায় না। বাকি বদ অভ্যেসগুলো কিন্তু রয়ে গিয়েছে। কোনও কাজে লেগে থাকতে পারে না। প্রায়ই ঝগড়া বাধিয়ে ফেলে ওর কাজের জগতে। স্থায়ী কোনও রোজগার নেই," বলতে-বলতে ভাবনায় তলিয়ে গেল বিজন, অনেকদিন দেখা হয় না কুনালের সঙ্গে।

"অর্কর কী খবর রে? চিঠি বা ফোন কিছু পেয়েছিস রিসেন্টলি?"

উত্তর দিতে গিয়েও দিল না বিজন। অর্কর নামটাই শুনল বুঝি এক যুগ পর। কোনও সূত্রেই আজকাল ওর কথা মনে পড়ে না। স্কুলে চার বন্ধু একসঙ্গে থাকলেও, হায়ার সেকেন্ডারির পর অর্ক জয়েন্টে চান্স পেয়ে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়। হস্টেলে থাকত। ছুটিছাটায় আসত কানাইপুরে। দেখাসাক্ষাৎ কমে গেলেও চার বন্ধুর সম্পর্ক ছিল অটুট। অর্ক চাকরি পেল কানপুরে।

সেখানে দু'বছর কাটিয়ে চলে গেল আমেরিকা। বছরে একবার অন্তত আসত দেশে। হঠাৎই বাবা মারা গেল ওর। অর্কর ভাই সূর্য তখন চাকরি সূত্রে মুম্বইতে। কানাইপুরের বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে মাকে নিয়ে চলে গেল সেখানে। তারপর থেকে অর্ক আর কানাইপুরে আসেনি। দু'বার লম্বা চিঠি লিখেছিল বিজনকে। মাত্র একটা চিঠির উত্তর দিয়ে উঠতে পেরেছিল বিজন। সম্পর্কটা এভাবেই আলগা হয়ে গিয়েছে। অর্ক বিয়ে করেছে গুজরাতি মেয়েকে। নাম রোহিণী। রোহিণীরা আমেরিকারই অভিবাসী। অর্কর কোনও ছেলেমেয়ে আছে কি না, মনে করতে পারে না বিজন। কিন্তু অমিতেশ হঠাৎ পুরনো বন্ধুদের খোঁজখবর নিচ্ছে কেন, বোঝা যাচ্ছে না। বিজন জিজ্ঞেস করল, "এখন অর্কর কথা মাথায় এল কেন? কোনও যোগাযোগ হয়েছে তোর সঙ্গে?"

মাথা নাড়ল অমিতেশ। সিগারেটে শেষ টান মেরে কাউন্টার ফেলে দিল, "বছরদু'য়েক আগেও কয়েক লাইনের ই-মেল পাঠাত। এখন আর পাঠায় না। খোঁজ নেওয়া হয় না আমারও। লাস্ট সিচুয়েশন যত দূর জানিয়েছে, ডালাসে ছোট একটা বাড়ি কিনেছে। দামি গাড়ি আছে একটা। উইক এন্ডে লং ড্রাইভে বেরিয়ে যায়।"

"আচ্ছা, ওর ছেলে না মেয়ে রে?"

"দু'টো মেয়ে," অমিতেশ চিন্তাচ্ছন্ন হয়ে হাঁটতে শুরু করল। কী যে ভাবছে, কে জানে!

ওর অন্যমনস্কতা কাটাতে বিজন বলল,"কথা কিন্তু হচ্ছিল আমার একইরকম থেকে যাওয়া নিয়ে। তাতে নাকি তোর বিরাট অসুবিধে। মাঝখান থেকে এসে গেল কুনাল, অর্কর প্রসঙ্গ..."

"ওদের কথা প্রয়োজনেই তুলেছি," একটু থামল অমিতেশ। ফের শুরু করল, "তুই বাদে আমরা সবাই বদলে গিয়েছি। কম-বেশি গ্রেট লিভিং করছি। তাতে কি আমরা সুখী হতে পেরেছি খুব? আরাম আর নিরাপত্তার কারণে আমি, অর্ক, কুনাল কতগুলো বছর অপচয় করে ফেললাম। আর তুই তোর সমস্ত স্মৃতির সঙ্গে রয়ে গেলি কানাইপুরে। অনেকটা গাছের মতো!"

"তার মানে! আমার বয়স বাড়ল না নাকি?" বলল বিজন।

"বেড়েছে। কিন্তু কোনও ক্ষয় হয়নি। গাছ যেমন নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে সবক'টা ঋতুর স্পর্শ পায়। সময়মতো ফুল, ফল দেয়। ঝরে যায় পাতা। আবার গজায়। আপাত অর্থে কোনও ক্ষয় নেই!"

> অমিতেশ বলল, "তুই বাদে সবাই বদলে গিয়েছি। গ্রেট লিভিং করছি। তাতে কি সুখী হতে পেরেছি খুব?"

এবার যেন অমিতেশের কথা কিছুটা অনুধাবন করতে পারল বিজন, "আর অর্জন? এতদিন বেঁচে কী অর্জন করতে পারলাম আমি?"

"তুই তো কিছু পেতে চাসনি। যেমন গাছেরা চায় না। চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকে একটা জায়গায়। কত ঝড়-বাদলা সহ্য করে। অজান্তে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে চলে।"

এমনিতে বিজন একটু কোলকুঁজো হয়ে হাঁটে। অমিতেশের কথায় মনে-মনে পিঠ টান করে নিল। রাস্তার একটা মোড় ঘুরে গেছে ওরা। খানিক দূরে দেখা যাচ্ছে চৌরাস্তা। রোদে ঝলমল করছে। চারপাশ। তাপ নেই তেমন। শীত এবার জমিয়ে পড়ছেই না।

কথায় পেয়েছে অমিতেশকে, "কানাইপুর থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমরা কী করেছি? আমি একটা কোম্পানিকে আরও বড় হতে সাহায্য করছি। অর্কর ব্রেন ড্রেন হয়ে আমেরিকার উপকারে লাগছে। কুনাল সিনেমা শিল্পের কোনও কাজেই লাগল না!"

হতাশা চাপা দিতে তৎপর হল বিজন, "কুনাল কিন্তু ডকুমেন্টারি করে প্রাইজ় পেয়েছে।"

"সে তো আমিও পেয়েছি। ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড। জানবি, সে সবই কানাইপুরের হ্যাংওভার! এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর আলাদা একটা এনথু ছিল। কানাইপুরের রসদ ছিল মাথায়। ভাল-ভাল কিছু কাজ করতে পেরেছিলাম সে সময়। তারপর ফুরিয়ে গেলাম। পরিবার, পরিজন ছেড়ে শুধু নিজের বউ-বাচ্চা নিয়ে নির্বান্ধব অবস্থায় কাটাচ্ছি!"

সব মনে পড়ে গেল বিজনের। অমিতেশের স্মৃতিকে আর একটু এগিয়ে দিতে সে বলল, "তুই ছিলি শান্ত আর দিব্যকান্তি। মা আশা করত, পপুলার ঋষি-টিষি হবি! কুনাল ছিল হই-হট্টগোল করা ছেলে, হাত-মুখ না ধুয়ে ঢুকে যেত আমাদের রান্নাঘরে। মা তখন হয়তো রুটি সেঁকছে। নিজেই থালা পেড়ে নিয়ে মাকে বলত, 'ভীষণ খিদে পেয়েছে কাকিমা, বিজনের আগে আমাকে দিন।' কুনাল সম্বন্ধে মা বলত, ও একদিন দেশের নেতা-টেতা হবেই। আর অর্কর বিষয়ে মায়ের ধারণা ছিল, পয়সাওয়ালা হবে খুব। আমাকে বলত, 'দেখবি, অর্ক একদিন টাটা-বিড়লার কাছাকাছি বিজ়নেসম্যান হবে। বড়-সড় গাড়ি নিয়ে দেখা করতে আসবে তোর সঙ্গে।' আমার সম্বন্ধে কিন্তু কোনও ভবিষ্যৎবাণী করত না! আমিও কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পেতাম না। আসলে আমাদের এই দাঁত বের করা ভাড়া বাড়ি, বাবা কারখানার মিস্ত্রি, এসব ঘরের ছেলে আর কত বড় হবে!"

"কিন্তু হয়ও তো। এরকম উদাহরণ ভূরি-ভূরি আছে। তা ছাড়া তুই তো পড়াশোনায় আমাদের চেয়ে খারাপ ছিলি না। তোকে নিয়ে বড়-সড় স্বপ্ন অনায়াসে দেখা যেতে পারত।"

সাইকেল গড়িয়ে নিয়ে যেতে-যেতে বিজন হাসল। হাসিটা অতীত জীবনের উদ্দেশে, "তোর নিশ্চয়ই মনে আছে, মা নিচু জাতের মেয়ে। ব্রাহ্মণের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হওয়া মায়ের কাছে স্বপ্নের চেয়ে বেশি ছিল! এর চেয়ে অতিরিক্ত স্বপ্ন দেখতে সাহস পেত না মা! আমিও হয়তো মায়ের সংস্কারে আচ্ছন্ন ছিলাম। তারপর কখন যেন স্বপ্ন দেখার বয়সটাই চলে গেল!"

বিজনের কথার পিঠে কিছুই বলল না অমিতেশ। পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে রিকশা, সাইকেল, পথচারী। এই মুহূর্তে দুই বন্ধুর দূরত্ব এক হাতের বেশি নয়। তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগেও এভাবেই ওরা পাশাপাশি হেঁটে যেত। কখন যে এতগুলো বছর পেরিয়ে এসেছে, ভাল করে ঠাহর করা হয়নি। অমিতেশ দিল্লি চলে যাওয়ার পর মাঝের পনেরো বছর দেখা হয়েছে খুব কম। তবু বন্ধুত্বের দূরত্ব কিন্তু বাড়েনি। কুনাল, অর্ক কি এখনও এতটাই বন্ধু হয়ে আছে? দেখা না হলে বোঝা যাবে না। অর্কর সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রায় অসম্ভব। অমিতেশের খুব ইচ্ছে করছে কুনাল তাদের দু'জনের মাঝে এসে যোগ দিক।

বিজনকে বলে, "কুনালকে একটা ফোন করি, কী বলিস? দেখি, ব্যাটার হাত যদি ফাঁকা থাকে কানাইপুরে চলে আসতে বলব।"

"করে দ্যাখ," বলল বিজন। বলার মধ্যে তেমন উৎসাহ নেই।

বিজন জানে, কুনাল এখন আর তত আবেগপ্রবণ নয়, কাজ ছাড়া শুধুমাত্র বন্ধুত্বের টানে ও কানাইপুরে আসবে না।

ক্রমশ

অলঙ্করণ: নির্মলেন্দু মণ্ডল

চিত্রপট

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

অমিতেশ হাঁটতে-হাঁটতে সেলফোন

১ পর্ব

বের করে ডায়াল করছে। কানে নিল ফোনটা। বিজনের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচিয়ে বলল, "জর্জ বিশ্বাসের গান। কলার টিউনটা জোগাড় করেছে ভালই।"

ও প্রান্তে ফোন ধরল কুনাল। অমিতেশ বলল, "অমিতেশ বলছি, কোথা থেকে বলত?" কুনাল কী উত্তর দিল জানল না বিজন। ফোনে অমিতেশ অবাক গলায় বলল, "কী করে বুঝলি?" জায়গাটা সম্ভবত ঠিক বলে দিয়েছে কুনাল। কীভাবে আন্দাজ করেছে, সেটা হয়তো এখন বলছে। ওর বলা শেষ হতে অমিতেশ বলল, "হ্যাঁ, আমার সঙ্গেই আছে। কথা বলবি?" অপর প্রান্ত কী বলল, জানা গেল না। অমিতেশ সেটটা বিজনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, "কথা বল।"

ফোন কানে নিয়ে বিজন বলল, "কেমন আছিস রে? অনেকদিন আসিসনি।"

"আছি ভালই। দু'-একদিনের মধ্যেই তোর কাছে যেতাম। দরকার আছে। তুই এখন আছিস তো কানাইপুরে, এই ক'দিনের মধ্যে বাইরে কোথাও যাওয়ার প্রোগ্রাম নেই তো?"

"কানাইপুরের বাইরে খুব কমই যাই। তুই আসছিস কবে?"

"ডেট বলতে পারব না। তবে তাড়াতাড়ি। অমিতেশ ক'দিনের ছুটি নিয়ে এসেছে?"

"ও তো একেবারেই চলে এসেছে।"

বিজনের কথা বিশ্বাস হল না কুনালের। ও প্রান্ত থেকে বলল, "ভ্যাট, বাজে কথা বলিস না। ও শালা পুরো দিল্লিওয়ালা হয়ে গিয়েছে। এখানে সাতদিনের বেশি থাকতে পারবে না। যাক গে, এখন রাখছি," বলে হঠাৎ লাইন কেটে দিল কুনাল।

বিজন ভাবছিল জিজ্ঞেস করবে, তুলিকা, ওদের ছেলে কেমন আছে? কুনাল সে সুযোগই দিল না। শেষের দিকে ওর গলাটা বিষণ্ণ লাগল একটু।

পাশে হাঁটতে থাকা অমিতেশ জানতে চাইল, "তোর সঙ্গে দরকারটা কী নিয়ে কিছু বলল?"

বিজন মলিন হেসে বলল, "আমি কী এমন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ, ওর হয়তো সাধারণ কোনও দরকার আছে। ও পরে জানলেও চলবে।"

দু'জনে হাঁটতে-হাঁটতে দুর্গাবাড়ির কাছে চলে এসেছে। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে সদর, পাশে চায়ের দোকান। এমন সময় অমিতেশ বলে উঠল, "চল, তোর বাবা-মাকে আগে দেখে আসি। তারপর এখানে ঢুকব।"

একটু যেন ধৈর্য হারাল বিজন, "এত ইনডিসিশনে ভুগছিস কেন বল তো? আমরা তো প্রায় এসে গিয়েছি ওয়র্কশপে। আবার বাড়ির দিকে যেতে হবে।"

"চল না প্লিজ। সত্যিই তোদের পুরনো বাড়িটা একবার দেখতে ইচ্ছে করছে," হাঁটা থামিয়ে দিল অমিতেশ।

বিজন বলল, "তা হলে তুই এখানেই দাঁড়া, ওয়র্কশপে কাজটা বুঝিয়ে দিয়ে এখনই আসছি।"

সাইকেলে উঠে চলে গেল বিজন। অমিতেশ দাঁড়িয়ে রইল রাস্তার ধারে। কত লোকজন চলে যাচ্ছে সামনে দিয়ে, কেউ চেনে না অমিতেশকে। একসময় অনেকেই চিনত। সেই পরিচিত মুখগুলো গেল কোথায়? দিল্লির বদলে অমিতেশ যদি এখানে এসে থাকতে শুরু করে, সেই অপরিচিতদের মধ্যেই এসে পড়বে। ভৌগোলিক কিছু সাদৃশ্য ব্যতিরেকে কানাইপুর আর আগের মতো নেই। অথচ কুনালকে যখন জিজ্ঞেস করল অমিতেশ, 'কোথা থেকে বলছি বল তো?' এক চান্সে বলে দিল, 'কানাইপুর থেকে।' কীভাবে আন্দাজ করেছে, সেটাও বলেছে। অমিতেশের ফোনের ব্যাকগ্রাউন্ডে বাজছিল কানাইপুরের রিকশার হর্ন, সাইকেলের ঘণ্টি, আরও কিছু শব্দ। এসব আওয়াজ এই রাজ্যের অন্য কোনও মফস্‌সলেরও হতে পারত। কিন্তু কুনাল নিশ্চিত, অমিতেশ কানাইপুর থেকেই ফোন করেছে। এটা বিশ্বাস করতেই বোধ হয় ভাল লাগছিল কুনালের।

"চ, উঠে পড়," বিজন সাইকেলের ব্রেক টিপে দাঁড়াল সামনে।

"মাথা খারাপ নাকি! এই চেহারাটা সাইকেলে টানতে পারবি?"

"কেন পারব না। আগে টানিনি তোকে?"

"তখন বিশ কেজি ওজন কম ছিল!"

"এখনও পারব। ওঠ না তুই। অনেকটা হাঁটতে হবে না হলে!" পিছনে কেরিয়ার নেই। বিজনের জেদাজেদিতে অমিতেশকে উঠতে হল সাইকেলের সামনের রডে। অনায়াস ভঙ্গিতে প্যাডেল মারতে শুরু করল বিজন।

দরজার দিকে এগোতে যাবে বিজন, চৌকাঠে এসে দাঁড়ায় শিউলি। ঠোঁটে সেই বিশেষ হাসিটা।

বিজনদের বাড়ির পাঁচিলের কাছে চলে এসেছে দুই বন্ধু। চুন সুরকির গাঁথনির ইট বের করা পাঁচিল, এখন আরও কালচে হয়েছে। বাড়ি ঢোকার মুখে স্থায়ী কোনও গেট নেই। বিজন বলেছিল, রাতে বাঁশের বেড়া চাপা দেওয়া হয়। সাইকেলটা লক করে ঢুকে গেল বিজন। অমিতেশও এসে দাঁড়ায় উঠোনে। জামরুলগাছটা ঝাঁকালো হয়েছে। এ বাড়ির পরিবর্তন বলতে শুধু এটাই।

"মা, ও মা!" খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে হাঁক দিল বিজন। কোনও সাড়া এল না, "কোথায় গেল রে সব! সকালবেলা এত ফাঁকা-ফাঁকা!" দরজার দিকে এগোতে যাবে বিজন, চৌকাঠে এসে দাঁড়ায় শিউলি। ঠোঁটে সেই বিশেষ হাসিটা, একান্ত যেন বিজনের জন্যেই। বিজন লক্ষ করেছে ওর ঠোঁট যতটা না হাসে, চোখ হাসে বেশি। ওই দৃষ্টিটা বড্ড অস্বস্তিকর। বিজন জিজ্ঞেস করল, "মা কোথায়?"

বারান্দায় দাঁড়িয়ে শিউলি বলল, "জেঠা-জেঠি তো ঝুমাদের বাড়িতে গেল। বাড়ির ছেলে হয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি! চলো, ভিতরে চলো।"

যারপরনাই অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়েছে বিজন। সেটা ঢাকতে অমিতেশের দিকে তাকিয়ে হাসল। কিন্তু বুঝল, হাসিটা বড্ড বোকা-বোকা হয়ে গিয়েছে। ওই অবস্থাতেই বলল, "আয়, ভিতরে এসে বোস।"

অমিতেশ অনুসরণ করল বিজনদের। চোখে-মুখে বিস্মিত দ্বন্দ্ব।

খাটে এসে বসল দুই বন্ধু। অমিতেশ গোটা ঘরে দৃষ্টি বোলায়। দেখে আশ্চর্য হয়, ঘরটা এতটুকু বদলায়নি। কুড়ি-পঁচিশ বছর আগের মতোই রয়ে গিয়েছে। এমনকী, ক্যালেন্ডারের ছবিটাও চেনা-চেনা মনে হচ্ছে! রাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্তি। মেয়েটার পরিচয় এখনও অবধি আন্দাজ করতে পারেনি অমিতেশ, বিজনের অপ্রস্তুত ভাবটাও দৃষ্টি এড়াচ্ছে না। এত অস্বস্তিবোধ করার কারণটা কী? এটা কি বিজনের গোপন কোনও সম্পর্ক? খানিক আগে বউয়ের প্রেমিক নিয়ে খুব অভিমান দেখাচ্ছিল। এখন ফেঁসে গিয়েছে। নিজেরও যে একটা সাইড এপিসোড আছে, লুকোতে চাইছে সেটা। ও বোধ হয় জানত না মেয়েটা এই সময় বাড়ি পাহারা দেবে।

"এর নাম শিউলি, বুঝলি?" মেয়েটার দিকে হাত দেখিয়ে বলল বিজন। অমিতেশ আড়ষ্ট হাসি হাসল। বিজন এবার অমিতেশের পরিচয় দিল, "আমার বন্ধু। দিল্লিতে থাকে। খুব বড় আর্টিস্ট। ছবি আঁকে। চাকরিও করে উঁচু পোস্টে। বিজ্ঞাপন কোম্পানিতে।"

মেয়েটা কতটা কী বুঝল, কে জানে! বুঝবে না ধরে নিয়েই বোধ হয় বিজন মুখস্থ বলার মতো পরিচয়টা দিল। অমিতেশের হাসির মতোই অতি সঙ্কোচে হাত জোড় করে নমস্কার জানাল মেয়েটা। কিন্তু দৃষ্টি বেশ অন্তর্ভেদী। একটু হোঁচট খেল অমিতেশ। মেয়েটার শরীর জুড়ে একটা সহজ কাম আবেদন আছে। এই প্রথম বিজনের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়ল অমিতেশ, কতটা জড়িয়ে পড়েছে শিউলির সঙ্গে? শিউলি ওর কে হয়? আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কেউ? মেয়েটি আবার বিবাহিত... অমিতেশের ভাবনাকে থমকে দিয়ে শিউলি চোখের ইশারায় বিজনকে বাইরে ডাকে। বিজনও গুটি-গুটি পায়ে মেয়েটির সঙ্গে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। ওরা মুখোমুখি হয়ে কী নিয়ে যেন শলাপরামর্শ করছে। অমিতেশ চোখ সরিয়ে নেয়। মনটা একটু দমে গিয়েছে। এসেছিল বিজনের মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে। দেখত, কাকাবাবু, কাকিমাকে কতটা বয়স্ক দেখাচ্ছে। অমিতেশকে দেখে তাঁদের চোখ-মুখ নিশ্চয়ই স্নেহ-উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত। এসব উপভোগ করতেই এসেছিল অমিতেশ। তার বদলে নানা জটিল সব সম্পর্কের সমীকরণ ভেসে উঠছে সামনে। ক্যালেন্ডারের যুগলমূর্তির দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হওয়ার চেষ্টা করল অমিতেশ।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঘরে বসে থাকা অমিতেশকে একবার দেখে নিল বিজন, না এদিকে তাকিয়ে

নেই। এবার শিউলিকে এড়াতে চেয়ে বলল, "চা, মিষ্টি, খাতির-যত্ন, সবকিছু ও বাড়িতে হয়েছে। মা, বাবাকে আর বাড়িটা দেখতে এসেছিল অমিতেশ। বাবা, মাকে দেখা হল না, আবার কাল আসবে'খন। এখন আমরা চলি," শিউলিকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে ডাকল, "অমিতেশ চল। ওয়র্কশপে, যেতে হবে।"

বিছানা থেকে উঠে এল অমিতেশ।

পায়রার মতো গলা ফুলিয়ে শিউলি বলে উঠল, "ও বাড়িতে খাতির-যত্ন হলে তুমি কখনওই নিয়ে আসতে না এখানে। এদিকে আমি যে বউদির চেয়ে অনেক গুণ ভাল, সেটাও বন্ধুর সামনে প্রমাণ হোক, চাও না।"

অমিতেশ চলে এসেছে বারান্দায়। বিজন প্রায় দৌড়ে গিয়ে গাছতলা থেকে সাইকেলটা নিল। শিউলির কথাগুলো যেন তাকে তাড়া করছে। আধো জ্ঞান হওয়ার বয়স থেকেই সে সাপ আর পাগলির প্রতি একটু বেশিই আতঙ্কিত! কেন, তা জানে না। তবে শিউলির মতো পাগলি নয়, সে ভয় পায় রাস্তায় ঘোরা, মাটিতে আঁচল লোটানো, চুলে জট পড়া পাগলিদের। শিউলির কথাগুলো যে সেই অপ্রকৃতিস্থতাকেও হার মানিয়ে দিচ্ছিল!

রাস্তায় চলে এসেছে দুই বন্ধু। শিউলির বিষয়ে ভাবতে-ভাবতে বিজন খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে, অমিতেশ ডাকল, "কী রে, এত তাড়াতাড়ি হাঁটছিস কেন?"

সাইকেলসুদ্ধু দাঁড়িয়ে পড়ল বিজন। বোঝা যায়, কিছুক্ষণের জন্য সম্বিত হারিয়েছিল। অমিতেশ পাশে এলে ফের হাঁটতে থাকল দু'জনে। রাস্তায় এখন প্রচুর স্কুল ড্রেস পরা মেয়ে। নীল-সাদা স্কার্ট, শাড়ি। সামনেই কানাইপুর গার্লস স্কুল। মেয়েদের ভিড় কাটিয়ে ছিপছিপে যুবকরা তড়িৎ বেগে সাইকেল চালিয়ে আসছে। যেমন আসত অমিতেশদের তরুণ বয়সে। তখন কিন্তু আরও অনেক বেশি ছেলে দেখা যেত, এখন কেন কমে গেল? প্রশ্নটা মাথায় নিয়ে অমিতেশ অন্য একটা প্রশ্ন করল বিজনকে, "মেয়েটা কে রে?"

উত্তর দেওয়ার জন্য যেন তৈরিই ছিল বিজন, "আর বলিস না। মেয়েটা পুরো পাগলি। এমন সব কথা বলে না..."

মেয়েটার শরীর জুড়ে একটা সহজ কাম আবেদন আছে। বিজন কতটা জড়িয়ে পড়েছে শিউলির সঙ্গে?

"'পাগলি' একটা মেয়ের পুরো পরিচয় হতে পারে না। তোদের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্কটা কী, বিশেষ করে তোর সঙ্গে? বেশ ইন্টিমেট রিলেশনই তো দেখলাম।"

অমিতেশের কটাক্ষের উত্তরে হতাশভাবে হাসল বিজন, "ওর প্রবলেমটা ওখানেই। শিউলি হচ্ছে আমাদের ভাড়াটের ছেলের বউ। মায়ের সঙ্গে ওর খুব ভাল রিলেশন। মেয়েটার সঙ্গে হার্ডলি তিন কি চারবার দেখা হয়েছে আমার। প্রথম দেখা থেকেই এমন ভাব করে, যেন কত দিনের চেনা!"

"বউটার কথা কৃষ্ণা জানে?"

অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে থতমত খেল বিজন, "হঠাৎ ওর কথা কৃষ্ণাকে বলতে যাব কেন? তা ছাড়া কৃষ্ণার সঙ্গে ইদানীং আমার দরকার ছাড়া কথাই হয় না।"

ঠোঁট মিটিমিটি হাসি নিয়ে হাঁটছিল অমিতেশ।

"অ্যাই, তুই ওরকম করে হাসছিস কেন রে?"

হাসিটা ছড়িয়ে পড়ল অমিতেশের মুখে।

বিজন অপ্রস্তুত হয়ে বলতে থাকল, "তুই যা ভাবছিস, তা কিন্তু নয়। শিউলি সত্যিই মেন্টাল পেশেন্ট। ভাড়াটের বড় ছেলে থাকে দুর্গাপুরে। বউকে ডাক্তার দেখাতে এখানে নিয়ে এসেছিল। আর নিয়ে যায়নি। রেখে গিয়েছে শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে।"

"তা-ও তুই কেন ভয় পাচ্ছিস ওর কথা কৃষ্ণাকে বলতে?"

"ভয়!" বিস্ময়ের সঙ্গে কথাটা রিপিট করে দাঁড়িয়ে পড়েছে বিজন।

অমিতেশ মিটিমিটি হেসেই যাচ্ছে। বিজন ভেবে পেল না, শিউলির ব্যাপারটা কীভাবে বোঝাবে অমিতেশকে। এখন যাই বলুক না কেন, অমিতেশ বিশ্বাস করবে না। অনেকদিন পর নিজেকে নিয়ে বেশ অসহায় বোধ করে বিজন। ভাষা হারিয়ে চেয়ে থাকল অমিতেশের দিকে। ওর হাসিতে কি যোগ দেবে বিজন? হেসে উঠবে এই ভেবে যে, জীবন কী মজাদার, চমকপ্রদ...হেসে ওঠার আগের মুহূর্তে বিজনের কানে ভেসে এল খিলখিল হাসির শব্দ। মহিলা কণ্ঠ! রোদ-বাতাসের আড়ালে যেন হেসে উঠল শিউলি। ভয় পেয়ে থমকে গেল বিজন। চুপচাপ হাঁটতে থাকল অমিতেশের সঙ্গে।

বাপিকে আজ প্রোমোশন দিতে চেয়েছে মালিক। অফারটা এতটাই অপ্রত্যাশিত, বাপি বেশ খানিকক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে ছিল পবনবাবুর দিকে! মালিক পবন তেওয়ারি বাপির ঘোর ভাঙিয়ে বলেছিল, "ম্যায়ঁ নে জো বোলা, ঠিকসে সমঝা তো?"

স্লো মোশনে ঘাড় হেলানোর ফাঁকে বাপি ভেবে নেয় মালিক প্রস্তাবটা হঠাৎ কেন দিচ্ছে, না বোঝা পর্যন্ত রাজি হওয়া ঠিক হবে না। তাই বলেছিল, "ঠিক আছে, বাড়িতে একটু আলোচনা করে নিই। মাকে বলি, দেখি কী বলে।"

সাধারণত চেম্বারে স্টাফদের ডাকে না মালিক। লোন দেওয়া, চাকরি থেকে তাড়ানো অথবা মাইনে বাড়ানোর সময় স্টাফদের চেম্বারে ঢোকানো হয়। কারখানার হলঘরের কোনায় চেয়ার, টেবিলে বসে পবনবাবু কাজের তদারকি করে। সেই কারণেই অফিস ঘরে ডাক পড়া স্টাফদের নিয়ে কৌতূহলী থাকে অন্য স্টাফরা। বাপি চেম্বার থেকে বেরতেই বিশ জোড়া চোখ ওর দিকে চেয়েছিল, পড়ে নিতে চাইছিল বাপির মুখের ভাব! হিসেবমতো বাপির মুখে খুশির ছাপ থাকার কথা। কিন্তু সে একেবারে নেতিয়েছিল। অবশ্য মনের ভিতরে অল্প হলেও বুড়বুড়ি কাটছিল আনন্দ। বাইরে প্রকাশ হচ্ছিল না। বি শিফ্‌টের কাজ শেষ করে বাপি ব্রিজ ধরে হাঁটতে-হাঁটতে চলেছে হাওড়া স্টেশনে। মর্নিং শিফ্‌টের শেষে বড় বাজার থেকে হাওড়া স্টেশন হামেশাই হেঁটে যায় বাপি। বি শিফ্‌টের ডিউটিতে তা করে না। রাতের দিকে ট্রেন কমে যায়, একটা মিস করলেই অনেক দেরি হয়ে যায় বাড়ি ফিরতে। ডলির তাতে কিছু যায় আসে না। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ে। মা থাকে জেগে। ইদানীং আবার জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। আগে এত টেনশন করত না। ডলির সঙ্গে মায়ের সম্পর্কটা যত খারাপ হচ্ছে, মা যেন আরও বেশি উতলা হচ্ছে বাপির জন্য। আজকের সুখবরটা মা-বউকে জানানোর পর বাড়ির পরিস্থিতি কি পাল্টাবে? কিছুটা উন্নতি আশা করাই যায়। এক ধাক্কায় হাজার টাকা মাইনে বেড়ে যাচ্ছে বাপির, যা ওদের মতো ফ্যামিলিতে একটা বিরাট খবর। বাপির চাকরিতে বছর গেলে একশো টাকা ইনক্রিমেন্ট। কারও কাজে খুশি থাকলে মালিক বড় জোর ওটা দেড়শো করে। বাপির

হাজার বাড়তে সাত, দশ বছর লেগে যেত। ঘণ্টাদু'য়েক হল বাপি সাত-দশ বছরের ব্যবধান মুছে ফেলতে পেরেছে। এখন তার বড়-বড় পা ফেলে খুশির খবরটা বাড়ি নিয়ে যাওয়া উচিত। বাস্তবে হাওড়া ব্রিজে সে সবার চেয়ে আস্তে হাঁটছে। দু' পাশ দিয়ে স্রোতের মতো হেঁটে যাচ্ছে ঘরমুখো পথচারী। এর মধ্যেই বেশ কয়েকবার ধাক্কা খেল বাপি। সে কিছুতেই ভেবে পাচ্ছে না, কেন এই প্রোমোশন। হঠাৎ কী এমন কাজ দেখাল বাপি? ওর মাথায় এসেছিল আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। তার হাতের কাজ যদি ভালই হয়, মালিক কেন তাকে বোকার মতো প্রোডাকশন থেকে সরিয়ে সুপারভাইজারিতে দিচ্ছে? এবার থেকে কোয়ালিটি কাজগুলো কে করবে? পবনবাবুর ভুলটা শুধরে দেয়নি বাপি। অনেকদিন ধরে এক ধরনের কাজ করে করে সে-ও বোর হয়ে গিয়েছে। এবার থেকে কাজ না করে, নজরদারি করতে তার ভালই লাগবে। সিল্ক স্ক্রিন প্রিন্টিংয়ের খুঁটিনাটি তার জানা। স্টাফেদের ওপর মাতব্বরি করতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। এত দূর অবধি পবনবাবুর প্রস্তাবটা ঠিকই ছিল। পরের শর্তগুলো একটু খটোমটো। পবনবাবু বলেছে, সুপারভাইজার হলে মাইনে যেমন হাজার টাকা বাড়বে, ডিউটি হয়ে যাবে বারো ঘণ্টার। সকাল আটটা থেকে রাত আটটা। বাপির ডেলি প্যাসেঞ্জারি করতে গিয়ে অনেকটা টাইম যায়। যদি মনে করে কলকাতায় থেকে ডিউটি করবে, সে ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। মানিকতলায় পবনবাবুর একটা ছোট ঘর আছে। ইচ্ছে করলে, বাপি মা-বউকে নিয়ে সেখানেই শিফ্‌ট করতে পারে। এমনকী, ভাড়াও দিতে হবে না! সব শুনে বাপি তো থ! এ তো প্রায় রাজকন্যার সঙ্গে অর্ধেক রাজত্ব! আকডাঙা ছেড়ে আসতে বাপির কষ্ট হবে। হোক না ভাড়ার বাড়ি, জন্ম থেকে ওখানেই আছে। বাড়িওয়ালা লোক ভাল। প্রায় আত্মীয়ের মতো। মা-ও চট করে রাজি হবে না আকডাঙার বাড়ি ছাড়তে। ডলিকে নিয়ে অবশ্য চিন্তা নেই, ও বাড়ির প্রতি এখনও মায়া জন্মায়নি ওর। পাড়াতেও কারওর সঙ্গে মেশে না। সব দিক ভেবে দেখতে গেলে আকডাঙা ছেড়ে আসাই ঠিক হবে মনে হয়। ডলির পক্ষে ও বাড়িটা বোধ হয় অপয়া। নতুন বাড়িতে গেলে হয়তো মানিয়ে নিতে পারবে মায়ের সঙ্গে...এসব ভাবনার চেয়েও যেটা জরুরি, মালিক এরকম একটা বড়সড় অফার করল কেন? পিছনের উদ্দেশ্যটা কী? বুদ্ধি ধরে এমন কারও সঙ্গে আলোচনা করতে পারলে ভাল হত।

যাক, এই নিয়ে ভাবা আপাতত কিছুদিন বন্ধ থাকুক। মালিকের ব্যবস্থামতো বাপিরা যদি কলকাতায় চলে আসে, তখন দেখা যাবে ডলির আচার-ব্যবহারে কোনও পরিবর্তন হয় কি না? হওয়ার চান্স কিন্তু আছে। কলকাতার জাঁকজমকে ডলি একটু ভড়কাবেই। মফস্বলের লোক মাত্রই ভড়কায়। এই যে সকাল থেকে ট্রেনে বাসে চেপে পিল-পিল করে গ্রাম-মফস্‌সলের মানুষ কাম-ধান্দায় কলকাতায় ঢোকে, বাপি লক্ষ করে দেখেছে, তাদের সবার মধ্যে অল্প আড়ষ্ট এবং ভয় পাওয়া ভাব আছে। তুলনায় কলকাতার লোকগুলো অনেক বেশি স্মার্ট। বাস আস্তে চালালে একটুও দেরি না করে, গলা তুলে খিস্তি মারে ড্রাইভার, কন্ডাক্টরকে। রাস্তার ছোটখাটো ক্যাচালে চট করে হাত-ফাত চালিয়ে দেয়, পুলিশের সঙ্গে চোখ রাঙিয়ে কথা বলে। পকেটে রেস্ত ছাড়াই হুটহাট বড় দোকানে ঢুকে পড়ে জিনিসের দর করে। বাপিদের কারখানায় যে ক'টা কলকাতার স্টাফ আছে, সবাই বেশ চালাক-চতুর। কেমন একটা ফুরফুরে ভাব আছে ওদের।

চার নম্বর প্ল্যাটফর্মে দিয়েছে বর্ধমান লোকাল। ইলেকট্রনিক বোর্ডে ফুটে উঠেছে লেখা। প্যাসেঞ্জাররা এতক্ষণ ভিড় করে বোর্ডের দিকে তাকিয়েছিল, এখন সবাই চলেছে চার নম্বরের দিকে। বাপিও পা চালিয়েছে ভিড়ের তালে। ট্রেন অবশ্য এখনও ঢোকেনি। যেতে-যেতে বাপি ভাবে, এই যে বাড়ি ফেরার জন্য এত রকম ছক, টাইমে ট্রেন ধরা, ফাঁকা কম্পার্টমেন্ট খোঁজা, কলকাতায় চলে এলে এসব থাকবে না। একটা বাসে চেপে বাড়ি যাও, বাড়ি থেকে বেরিয়েই বাস ধর। মিনিটকুড়ির মধ্যে অফিস। মানিকতলা তো খুব দূরে নয়। জীবন থেকে মুছে যাবে আকডাঙা, ছোটবেলার নানা স্মৃতি। মাত্র হাজার টাকা মাইনে বাড়ার বিনিময়ে! আকডাঙার জন্য মনটা বড় খারাপ করতে থাকে বাপির। প্রোমোশনের খবরটা কি চেপে যাবে বাড়িতে? মালিককে বলে দেবে, আমি যেমন আছি, তেমনই ভাল। প্রোমোশন চাই না। প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে ঠেলাঠেলি করে কামরায় উঠে পড়ে বাপি। সিটও পেয়ে যায়। তারপরই পাল্টায় সিদ্ধান্ত, না। প্রোমোশনটা তার জন্য না হলেও, ডলির পক্ষে খুব দরকার। আকডাঙা এবং বীরনগর জায়গা দুটোর মধ্যে কোনও তফাত নেই। একই টাইপের মফস্‌সল শহর। ডলির হয়তো স্বপ্ন ছিল বিয়ে হবে কলকাতার দিকে। অথবা দূর কোনও শহরে। ফিটফাট বর। ধবধবে সংসার। তার বদলে কাঁচা নর্দমা, ভাঙা রাস্তার আকডাঙা, ড্যাম্প ধরা ভাড়া বাড়ি। কী করে সন্তুষ্ট হবে সে? হতে পারে গরিব ঘর থেকে এসেছে। কিন্তু ও যা সুন্দরী, ঝাঁ-চকচকে বাড়িতেই মানায়। মনে-মনে হয়তো এরকমই স্বপ্ন ছিল বেচারির। মা, বাবা তড়িঘড়ি করে বিয়ে দিয়ে দিল ছোট কারখানায় কাজ করা বাপির সঙ্গে। বাপি দেখতেও যে খুব সুন্দর তা নয়, মোটামুটি চলে যায় গোছের। ভিড়ের মধ্যে আলাদা চোখে পড়বে না মোটেই।

হুইসল দিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিল। বাপি মনে-মনে চলে যায় পবনবাবুর অফার করা মানিকতলার বাড়িতে। ওটা এখনও দেখেনি বাপি। তবু কল্পনায় সাজাতে থাকে। দেওয়ালে সুন্দর করে রং করাবে। এ বাড়ির উঁচু খাটটা বিক্রি করে বক্স খাট কিনবে

একটা। ড্রেসিং টেবিলটা নতুন ডিজ়াইনের করাতে পারলে ভাল হয়। মায়ের জন্য খাট বদলানোর দরকার নেই, এতদিন ধরে ওতেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। এই বয়সে আর পাল্টাতে চাইবে না। মায়ের ঠাকুরগুলোর জন্য নতুন একটা সিংহাসন করে দেবে বাপি। ভাবনাগুলো বেশ গরম-গরম হয়ে যাচ্ছে। তার কারণটাও টের পেল বাপি। ট্রেন স্পিড নিয়েছে। ঠান্ডা হাওয়া আসছে জানলা দিয়ে। হাওয়াটা আসলে অতটা ঠান্ডা নয়, ট্রেনটা জোরে চলছে বলেই এরকম লাগছে। কলকাতায় সন্ধের দিকেও সোয়েটার লাগে না। শীত এবার ঠিক করে পড়লই না। বি শিফ্‌ট করলে বাপি কাঁধ ব্যাগে হাতকাটা সোয়েটার রাখে। ট্রেনে ওঠার আগে পরে নেয়। আজ অন্যমনস্ক ছিল বলে পরা হয়নি। ব্যাগ কোলের উপর নিয়ে সোয়েটার বের করতে গিয়ে মনে পড়ল দিদির কথা। ওরই বুনে দেওয়া সোয়েটার এটা। গত বছর বুনেছিল। বাপি কলকাতায় চলে এলে দিদি খুব অসুবিধেয় পড়ে যাবে। যদি আকডাঙায় আলাদা বাড়ি ভাড়া করে থাকেও, মনখারাপ করলে টুক করে মায়ের সঙ্গে দুটো কথা বলে যেতে পারবে। সে রাস্তাও বন্ধ হয়ে যাবে বাপিরা কলকাতায় চলে এলে। প্রোমোশনটা নিলে দিদি খুব সমস্যায় পড়ে যাবে। বড় একা হয়ে যাবে বেচারি...বাপি জানলার বাইরে তাকায়। কানাইপুরে ঢুকছে ট্রেন। বাঁ দিকের আবছা অন্ধকারে ইটভাটার চিমনি। তার মাথায় কুয়াশা মাখা চাঁদ।

বাড়ির কাছাকাছি এসে হাঁটা আস্তে করে নেয় বাপি। তাদের একতলার আলো জ্বলছে, সদর বন্ধ। দোতলা অন্ধকার। সদরে দাঁড়িয়ে কড়া নাড়ে বাপি। বাড়িতে ঢোকার আগে প্রতিবারই আশঙ্কা হয়, আজ মায়ের সঙ্গে ডলির কিছু একটা ঝামেলা হয়েছে। গুম মেরে আছে দু'জনেই। কেউ বেশি, কেউ বা একটু কম। নানা খুঁটিনাটি ব্যাপারে গন্ডগোল। দরজা খুলল মা। আজ মায়ের মুখটা গম্ভীর। বড় কোনও কিচাইন মনে হচ্ছে। ডলি কীরকম মুডে আছে, কে জানে! চটি ছেড়ে বাপি

মা বলল, "বউমার সঙ্গে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়, বুঝলি? তোরা আলাদাই থাক বাপি। ডলিও সেটাই চায়।"

চেয়ারে গিয়ে বসে। মা জল আনতে গেল। গরম লাগছে। সোয়েটার ছাড়ার পর বাপি দেখল, বড় কাঁসার গ্লাসে জল নিয়ে মা সামনে দাঁড়িয়ে আছে। শীতকাল। তবু কী তেষ্টা পেয়েছে বাপির! জলটা পুরোটাই খেয়ে ফেলল। গ্লাস মায়ের হাতে ফেরত দিয়ে বলল, "আজ কিছু হয়েছে মনে হচ্ছে?"

অনেকক্ষণ ধরে চেপে রাখা একটা শ্বাস ছেড়ে সরমা বলল, "কী আবার হবে!"

বাপি চেয়ার ছেড়ে ওঠে। বউটা আদৌ বাড়ি আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। কোনও সাড়াশব্দ নেই। পর্দা ফেলা ঘরটার দিকে একবার তাকায় বাপি। আলো নেভানো। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। ওঘরে এখন ঢোকার দরকারও নেই বাপির। মা লুঙ্গি, গামছা বাথরুমের সামনে দড়িতে গুছিয়ে রেখে দেয়। কলের জলে হাতমুখ ধুতে-ধুতে বাপি খেয়াল করে প্রোমোশনের ব্যাপারটা এখন কেমন যেন জলে ভেজা মুড়ির মতো নেতিয়ে গিয়েছে! বেশ বুঝতে পারে খবরটা মাকে কোনওভাবেই চাঙ্গা করতে পারবে না। বাড়িতে নিশ্চয়ই বড় কিছু একটা ঘটেছে। মা বলতে চাইছে না, গুমরোচ্ছে।

রান্নাঘরে খেতে বসে বাপি সরাসরি মায়ের মনের খবর নিল না। অফিসের প্রসঙ্গটা তুলল প্রথমে, "এবার তো আকডাঙার পাট উঠল আমাদের। কোম্পানি কলকাতায় থাকার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছে।"

একটু সময় নিল মা। মন খারাপের মধ্যেও অবাক গলায় বলল, "তোর কি এমন বড় অফিস, যে কলকাতায় কোয়ার্টার দেবে!"

"কোয়ার্টার নয়, এমনি ভাড়াবাড়ি। ভাড়াটা আমায় দিতে হবে না। মালিক দেবে। ডিউটি আওয়ার্স বাড়বে। মাইনেও বাড়বে কিছু।"

কোনও উত্তর না করে সরমা পাতের দিকে চেয়ে রইল।

বাপি বলল, "কী এবাড়ি ছেড়ে যাওয়ার কথা ভেবে মনখারাপ হচ্ছে?"

মাথা নাড়ল সরমা। বেশ খানিকটা বাতাস বুকে পুরে বলল, "আমি তোদের সঙ্গে যাব না।"

"মানে?" অবাক হয়ে জানতে চাইল বাপি, "মাইনে কিন্তু এমন বাড়েনি যে, কলকাতা আর এখানকার বাড়ির খরচ একসঙ্গে চালাতে পারব।"

সরমা বলল, "এবাড়ি ছেড়ে দে। আমি চলে যাব স্বপ্নার জন্য নেওয়া ভাড়া বাড়িতে। শিবেন এবার কাজের জায়গায় ফিরে যাওয়ার আগে তোর দিদির জন্য একটা বাড়ি ভাড়া করে রেখে গিয়েছে। স্বপ্না এখনও থাকা শুরু করেনি। শ্বশুরবাড়িতে অত্যাচার শুরু হলেই ওখানে গিয়ে থাকবে।"

মায়ের কথার পর বাপি চুপচাপ খেতে থাকল। খাবারগুলো গলা দিয়ে নামতে চাইছে না, অভিমান পথ আগলে দাঁড়াচ্ছে, দিদির কোনও খবরই আজকাল বাপিকে দেওয়া হয় না। মা-দিদি পর করে দিয়েছে বাপিকে। মাথাটা একটু গরম হল বাপির। বলল, "জামাইয়ের টাকায় ভাড়া করা বাড়িতে থাকতে তোমার অপমান হবে না?"

"ছেলের বাড়িতেই বা কী এমন সম্মান নিয়ে আছি!"

খাওয়া ছেড়ে উঠে যাবে কি না ভাবছে বাপি। গোটা বাড়িটা ভীষণ চুপচাপ। পাশে নমিতাদের বাড়ি থেকে টিভির আওয়াজ ভেসে আসছে, কোনও গানের কম্পিটিশন। গান শেষ হতেই বাজল রেকর্ড করা হাততালি।

"বউমার সঙ্গে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়, বুঝলি? তোরা আলাদাই থাক। ডলিও সেটাই চায়। আজ বিকেলবেলা ডলির তিন বন্ধু এসে হাজির। নিজেরাই খাবারদাবার কিনে এনেছিল। হাসতে-হাসতে সেসব খেল। ডলি চা করতে বলেছিল। দিলাম চার কাপ করে। একটা মেয়ে চায়ে চুমুক মেরেই ওয়াক তুলল। একজন মুখের চা কাপেই ফেলে দিল। বাকিজন আমাকে বলল, 'কী ব্যাপার মাসিমা, পণ পাননি বলে কি এরকম চা দিতে হবে? যাতে ডলির বাপের বাড়ির লোক না আসে?' এত অপমানিত লাগছিল, মনে হচ্ছিল মাটিতে মিশে যাই! মেয়েগুলোকে যে ঘুরিয়ে দু'কথা বলব, সে শক্তি ছিল না। তার উপর শুরু হল ডলির শাসানি, যাচ্ছেতাইভাবে কথা শোনাতে লাগল আমাকে। একথাও বলল, ওদের চপফপ থেকে যেহেতু আমায় কিছু দেওয়া হয়নি, তাই আমি ইচ্ছে করে চা'টা খারাপ করেছি। সেই সব শুনে দৌড়ে ঘর থেকে পালিয়ে বাঁচি!"

খাওয়া ছেড়ে উঠেই পড়ল বাপি। না, ডলির বাবা ঠিকই বলেছিল, এ মেয়েকে ঘা-কতক না দেওয়া অবধি সিধে হবে না।

ক্রমশ

অলঙ্করণ: নির্মলেন্দু মণ্ডল

স্ক্রিপট

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

নিজেকে মনে-মনে প্রস্তুত করল বাপি।

পর্ব ১০

মাকে জিজ্ঞেস করল, "মেয়েগুলোর নাম কী গো?"

"তা আমি কী করে বলব, ডলি আমার সঙ্গে ওদের আলাপ করানোর প্রয়োজন বোধ করেনি। তবে দু'টো মেয়েকে মনে হল বিয়েতে দেখেছি।"

বাপি হাত ধুতে কলঘরের দিকে পা বাড়ায়, দ্বিতীয় পা'টা আর বাড়ানো হয় না। তাদের একতলায় মোবাইল ফোনের রিং বেজে উঠছে। বাপির মুখ হাঁ! অবাক চোখে মায়ের দিকে তাকায়। মাও কিছু জানে না মনে হচ্ছে। মাথা নাড়ছে। চোখে বাপির মতোই আশ্চর্য হয়ে যাওয়া ভাব। কলঘরে না গিয়ে এঁটো হাতেই বাপি বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে। ফোনের শব্দ থেমেছে, আওয়াজ আসছিল বাপির শোওয়ার ঘর থেকে। পায়ে-পায়ে ঘরের দিকে এগোল বাপি। এখন আলো জ্বলছে। ছেলের পিছনে সরমাও চলেছে। বাপি পর্দা সরিয়ে ঘরের চৌকাঠে দাঁড়ায়। দেখে, মোবাইল কানে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ডলি কার সঙ্গে যেন হেসে-হেসে কথা বলছে। ওর কথা বলার ধরনটা একদম অচেনা। এ যেন অন্য ডলি। ও যে এত মিষ্টি করে কথা বলতে পারে, নিজের কানে না শুনলে বিশ্বাসই হত না বাপির। ডলির যেহেতু জানলার বাইরে চোখ, বাপি যে ঘরে এসেছে খেয়াল করেনি। কী বলছে ডলি, শোনার জন্য কান পাতল বাপি। স্পষ্ট করে কিছু শুনতে পেল না। কিন্তু কথাগুলোর গায়ে লেগে থাকা আদিখ্যেতার স্বরটা কানে বিঁধল। কথা বলতে-বলতে এবার ঘুরে দাঁড়াল ডলি। বাপিকে দেখে থমকাল, কিন্তু ঘাবড়াল না। ফোনের ব্যক্তিটির উদ্দেশে বলল, "এখন রাখছি, কাজ আছে।" সেটটা চোখের সামনে নিয়ে এসে সুইচ খুঁজে অফ করল ডলি। তারপর বোকা-বোকা হাসিসহ বাপির দিকে তাকাল।

বাপি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কোনও বন্ধু বুঝি ভুলে ফেলে গিয়েছে সেটটা? কারা সব এসেছিল, বলছিল মা।"

ডলি এসে বসল বিছানায়। মুঠোয় ধরে আছে ফোন, "হাতটা ধুয়ে এসো, সব বলছি।"

এঁটো হাতে উঠে এসেছে, ভুলেই গিয়েছিল বাপি। ডান হাতটা তুলে দেখে নিয়ে ঘরের বাইরে বেরতে গেল। মা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, চোখে অবাক ভাব মেশানো প্রশ্ন। বাথরুমের দিকে পা বাড়িয়ে বাপি বাঁ-হাত তুলে মাকে আশ্বস্ত করল, অর্থাৎ, সব জেনে পরে তোমায় বলব। হাত মুখ ধুয়ে শোওয়ার ঘরে ফিরে এল বাপি।

মোবাইল ফোনটা এখন বিছানার ঠিক মাঝখানে। জিনিসটা নতুন, দামও খারাপ হবে না মনে হচ্ছে। বাপির কারখানার বেশিরভাগ স্টাফদের মোবাইল আছে। ওসব ব্যাপারে আলোচনাও হয়। কানে আসে কিছু-কিছু। বাপি বড় একটা ভেড়ে না ওখানে। যদি কেনার ইচ্ছেটা চাগিয়ে ওঠে!

খাটের কোনে হাঁটু তুলে থুতনি রেখে বসে আছে ডলি। বাপি এবার সরাসরি জানতে চাইল, "কার ফোন?"

"আমার, বাবা পাঠিয়েছে," বলল ডলি।

"তোমার বাবা কিনে দিয়েছে!" বিস্ময় আর এক পর্দা চড়ে যায় বাপির গলায়।

ডলি বলল, "কিনে দিয়েছে তো বলিনি। বললেই বা তুমি বিশ্বাস করবে কেন? গরিব বাড়ি থেকে মেয়ে নিয়ে এসেছ। তাদের দেওয়া-থোয়ার ক্ষমতা তোমার জানা আছে। ফোনটা দিয়েছে আমার মামা। বাইরে চাকরি করে, বিয়েতে আসতে পারেনি।"

ডলির এরকম ঝাঁঝাল ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে বাপি, তাই গা করল না। কিন্তু ফোনটা কোথা থেকে এল, এটা তাকে জানতেই হবে। গলার স্বর মোলায়েম করে জানতে চাইল, "ফোনটা তোমার নামে করা হয়েছে তো? মানে সিমকার্ড না কীসব যেন বলে? তার জন্য তো ভোটার কার্ড লাগে।"

"ভোটের কার্ড, রেশন কার্ড তো ওবাড়ি থেকে আনা হয়নি। ওগুলো দেখিয়েই বাবা আমার নামে সিমকার্ড করিয়েছে।"

"যাক, বাঁচা গেল!" বাপি খাটে পা সোজা করে আধশোয়া হল। এটা আসলে আশ্বস্ত হওয়ার ভান। ফোনটা কোথা থেকে এল, এটা নিয়ে কৌতূহল এখনও তার মেটেনি। কার সঙ্গেই বা এত হেসে হেসে কথা বলছিল? পরে কায়দা করে ঠান্ডা মাথায় সেগুলো জানতে হবে।

"বাবা, কাল রাতে তুমি ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে কাঁদছিলে!" স্কুল যাওয়ার আগে জুতোর ফিতে বাঁধতে-বাঁধতে বলল আজান।

কুনাল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁচি দিয়ে তার সদ্য রাখা ফ্রেঞ্চকাটটা ট্রিম করছিল। ছেলের কথা শুনে থেমে গেল হাত! ভাঁজ পড়ল কপালে। মিলিয়ে গেল পরক্ষণেই। আজানটা এরকমই, খুব কম কথা বলে। বললেও হঠাৎ-হঠাৎ, ভূমিকা

খাটে হাঁটু তুলে থুতনি রেখে বসে আছে ডলি। বাপি জানতে চাইল, "কার ফোন?" "বাবা পাঠিয়েছে," বলল ডলি।

থাকে না কোনও। তাই কথাগুলো হয় অপ্রত্যাশিত। মানে বের করতে সময় লেগে যায়। আয়না থেকে মুখ না ঘুরিয়ে কুনাল বলল, "ভ্যাট, ফালতু কথা বলিস না।"

ছেলে আর কোনও উত্তর করল না। পিঠে ব্যাগ নিয়ে সে স্কুল যাওয়ার জন্য পুরোপুরি তৈরি। তুলিকা লিভিং রুমের আলমারির আয়নায় আলতো প্রসাধনের শেষ পর্যায়ে। ছেলেকে স্কুলে পৌঁছে, চলে যাবে ওদের বুটিকের শো-রুমে। ঘর থেকে বেরিয়ে এল তুলি। ছেলের কথা কানে গিয়েছে তার। শু-র‍্যাক থেকে চটি নামিয়ে বলল, "হ্যাঁ গো, সত্যি কাঁদছিলে! বুবি আমাকে ঘুম থেকে তুলে দেখাল।"

ছেলেকে 'বুবি' বলে ডাকে তুলি। ছেলে আর বউয়ের কথায় কুনাল যৎপরোনাস্তি বিব্রত। ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টায় সে বলল, "সকালবেলা মা-ছেলে মিলে আমার পিছনে না লাগলে চলছে না?"

আজানের হাত ধরে দরজার দিকে পা বাড়িয়েছে তুলি, "কেন, তুমি কি এমনই কঠিন মনের পুরুষ, স্বপ্নেতেও যে কাঁদে না!"

ডায়লগটা টিপিক্যাল টিভি সিরিয়াল মার্কা। কথা বাড়াতে ইচ্ছে করল না কুনালের। তুলি বেরিয়ে গেল ছেলেকে নিয়ে।

টিভির মেগা সিরিয়ালের পরিচালক কুনালের এখন গুছিয়ে কথার পিঠে কথা সাজানোয় প্রবল বিরক্তি। তুলি আগে এত লাগসই কথা বলত না। স্ক্রিপ্ট ব্রাশআপ করতে-করতে ভোকাবুলারি পাল্টে গেছে। ওকে দিয়ে ওসব করানো ভুল হয়েছে কুণালের। তুলির সেই সহজ স্বাভাবিক কথা বলার ভঙ্গিটাই হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। ওরা দু'জন ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর খোলা জানলায় এসে বসল দু'টো চড়াই। চিরিক-চিরিক ডাকে ঘরটাকে

আরও নির্জন করে তুলল। ড্রেসিং টেবিলে দাড়ি-গোঁফ কাটার কাঁচি নামিয়ে রাখল কুনাল। সত্যিই কি সে ঘুমের মধ্যে কাঁদছিল? খুবই বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবনাটা মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে। আজান বানিয়ে কথা বলার ছেলে নয়। তুলি অবশ্য সুযোগ পেলেই লেগ পুল করে। সেক্ষেত্রে ছেলেকেও সঙ্গে পাবে না। আজান এ ব্যাপারে ধর্মপুত্রের মতো সিরিয়াস! বাথরুমে গিয়ে গিজ়ারের সুইচ অন করে দেয়। একটু পরে স্নান করে সে-ও বেরবে। ফিরে আসে সোফায়। সেন্টার টেবিল থেকে তুলে নেয় নিউজ় পেপারটা। কিছুক্ষণের মধ্যেই টের পায় খবরগুলো সে চোখ দিয়ে শুধু দেখেই যাচ্ছে, মগজে ঢুকছে না কিস্‌সু। কাল রাতের ছবিটা কল্পনায় ভেসে উঠছে চোখে। ছবিটা নিজে দেখেনি। দেখেছে প্রথমে আজান। তার বাবা ডুকরে-ডুকরে কাঁদছে। নিশ্চয়ই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল ছেলেটা। মাত্র এগারো বছর বয়স। এই বয়সের সন্তানদের কাছে বাবা হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিমান। সেই মানুষটিকে ভেঙে পড়তে দেখলে সন্তান ভয়ঙ্কর অনিশ্চয়তায় ভুগবে, সেটাই স্বাভাবিক। তাই তো মাকে ডেকে তুলেছিল আজান। তুলিও কি ওই অবস্থা দেখে ঘাবড়িয়ে গিয়েছিল খুব? মুহূর্তের জন্য হয়তো নার্ভাস হয়ে থাকবে, কিন্তু যুক্তি দিয়ে সামলে নিয়েছে, স্বপ্নের কান্নার সঙ্গে সত্যি কান্নার বিন্দুমাত্র যোগসূত্র থাকে না। এই বিবেচনা বোধ তো আজানের নেই, ওর মাথায় একটা বিশ্রী ছাপ রয়ে গেল। স্কুলে বেচারি হয়তো মনখারাপ করে বসে থাকবে...না, কাগজটা পড়া হয়ে উঠবে না আপাতত। ভাঁজ করে টেবিলে রাখে কুনাল। ঠিক করে নেয়, সামনের ক'টা দিন ছেলের সামনে খুব উৎফুল্ল হয়ে থাকতে হবে। জল এতক্ষণে নিশ্চয়ই গরম হয়ে গিয়েছে। কিছুক্ষণ আগেই গিজ়ার ব্যবহার করেছিল তুলি। আলনা থেকে তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল কুনাল।

প্রায় এক মাস পর কুনাল বাড়ি থেকে গাড়ি নিয়ে বের হল। গ্যারেজের শাটার তোলার আওয়াজ শুনে বাড়িওয়ালা এসে দাঁড়াল ব্যালকনিতে। খেজুরে হাসিসহ কুনালকে জিজ্ঞেস করল, "কী, আউটডোর আছে নাকি কোথাও? গাড়ি নিয়ে বেরচ্ছেন!"

কুনাল বলল, "না, একটু কানাইপুর যাব।"

"ও। তা তুলিকা-আজান গেল না?"

দুর্বোধ্য এক ধরনের হাসি হেসে গ্যারেজে ঢুকে গেল কুনাল। বাড়িওয়ালা লোকটা খারাপ নয়। প্রায় ১২ বছর নাকতলার এ বাড়িতে থাকা হয়ে গেল কুনালের। খোকনদার স্বভাবের একটা দিকই বড্ড সমস্যার, অত্যধিক কৌতূহলপ্রবণ! কিন্তু খোকনদার বউ উপযাচক হয়ে কিচ্ছু জিজ্ঞেস করে না। সিনেমা, সিরিয়ালের লোকেদের কাছে বাড়ি মেয়ে-বউদের অনেক কিছু জানার থাকে। রেবা বউদির সে সব বলাই নেই। কুনালদের একতলায় দিনের অনেকটা সময় কাটায়, আজানকে ভীষণ ভালবাসে। পর্দার জীবন নিয়ে কোনও আগ্রহ দেখায় না। কুনাল বরং বউদির কাছে তার এবং টিভির অন্য সিরিয়াল সম্বন্ধে মতামত চায়। বউদি প্রোডাকশনের ব্যাপারে নিজের মতটুকু জানিয়ে চলে যায় অন্য প্রসঙ্গে। খোকনদার আগ্রহ অন্য জায়গায়। কোনও সিরিয়াল বা সিনেমা টানা বসে দেখতে পারে না, কিন্তু শুটিং দেখার ইচ্ছে খুব। বহু বার কুনালের ফ্লোরে গিয়েছে। বসে থেকেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এই কারণে অফিস কামাই হয়েছে। শেষমেষ বোধ হয় রাশ টানল বউদি। সব মিলিয়ে কুনালদের 'বাড়িওয়ালা' ভাগ্য ভাল। কানাইপুর থেকে এসে যখন কলকাতায় থাকা শুরু করল, প্রথম তিন বছরে দুটো বাড়ি পাল্টেছে। তারপর সেই যে এ বাড়িতে ঢোকা, উঠে যাওয়ার প্রসঙ্গ আসেনি। খোকনদা কখনও ভাড়া বাড়াতে বলেননি। কুনালই নিজের সুবিধেমতো বাড়িয়েছে। নাকতলার ভাড়া বাড়ির মার্কেট রেট অনুপাতে কুনালরা প্রায় অর্ধেক ভাড়ায় থাকে। ঢুকেই ছিল মাত্র ১,২০০ টাকায়। পুরো একতলা গ্যারেজসহ। অন্ততপক্ষে সাড়ে ৯০০ স্কোয়্যার ফিট তো হবেই। এত কম ভাড়ায় বাড়ি দেওয়ার পিছনেও খোকনদার রুপোলি পর্দা প্রীতি কাজ করেছে। কুনালের ইউনিটে তখন কাজ করত প্রবীর। এই পাড়াতেই থাকত। ওর মাধ্যমে বাড়িটার খোঁজ পায় কুনাল। ঘরটা দেখতে আসার আগে প্রবীর জানতে চেয়েছিল, "আপনার বাজেট কত?" কুনাল বলেছিল, "দু'হাজারের মধ্যে হলে ভাল হয়।" প্রবীর বলেছিল, "আপনি দেড়ের বেশি উঠবেন না। লোকটা সিনেম-সিরিয়াল ওয়র্ল্ড নিয়ে ভীষণ ইন্টারেস্টেড। আমি সামান্য মেকআপ আর্টিস্ট, আমার কাছেই এত কিছু জানতে চায়, ডেকে-ডেকে চা খাওয়ায়। সেখানে আপনি তো ডিরেক্টর!" প্রবীরের কথাই মিলে গিয়েছিল। এতদিন কম ভাড়ায় থাকার খেসারত হিসেবে খোকনদার সমস্ত কৌতূহলের জবাব দিয়েছে কুনাল। ইদানীং একটু ভয় পায়, মানুষটা ইন্ডাস্ট্রির অনেক খবরই রাখে। কুনালের হাতে মাসতিনেক কোনও কাজ নেই, এটা কি এখনও জানতে পারেনি? নাকি পেরেও ওয়াচ করে যাচ্ছে। যে-কোনওদিন এসে সেই দেড় লাখ টাকা চাইতে পারে। বছরতিনেক হল টাকাটা ওর কাছ থেকে ধার হিসেবে নিয়েছে কুনাল। একটা টেলিফিল্মের কাজে শর্ট পড়েছিল অ্যামাউন্টটা। টাকা যখন হাতে ছিল, আজ দিচ্ছি কাল দিচ্ছি, করে দেওয়া হয়নি। এখন এই তিন মাস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ভেঙে

সংসার চালাতে হচ্ছে। পাশবইয়ের ফিগারও খুব একটা হেলদি নয়। তুলি বিজনেস থেকে যে রোজগারটা করে, খুবই সামান্য। টাইমপাস করার জন্য একজন পার্টনারের সঙ্গে নেমেছিল ব্যবসায়। কুণালের হাতে কাজ নেই দেখে, বেশি করে সময় দিচ্ছে বুটিকে। পুরো সংসারের খরচ টানা তুলির পক্ষে অসাধ্য। এই চিন্তাগুলোই কি ঘুমের মধ্যে ভিড় করেছিল মাথায়? ঘুমের আচ্ছন্নতায় যুক্তিবুদ্ধি কাজ করছিল না। আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে হয়তো কেঁদে ফেলেছিল কুনাল। সকাল হতেই সবকিছু হাওয়া! কিছুই মনে নেই কুনালের। কান্নার সাক্ষী থেকে গিয়েছে তুলি, আজান। কুনাল এখন যেন জরাজীর্ণ পুরনো বাড়ি, দাঁড়িয়ে আছে ঠিকই, খেয়াল নেই ফাটল ধরেছে শরীরে।

সেকেন্ড হুগলি ব্রিজে উঠে পড়েছে গাড়ি। হাওয়ায় বাড়ি ফেরার গন্ধ। মনটা অজান্তেই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে প্রতিবার। আশ্চর্য ব্যাপার, এটা তুলিরও হয়। ওর হাবে-ভাবে ফুটে ওঠে আনন্দটা। অথচ তুলির বেড়ে ওঠা কলকাতায়। আজান এক্সাইটেড হয়ে থাকে মামার বাড়ির যাওয়ার রোমাঞ্চে! কানাইপুর গেলে সাধারণত ওদের সঙ্গে নেয় কুণাল। এবারও বলেছিল তুলিকে। রাজি হল না। বলল, ওর বুটিকে এখন খুব কাজের চাপ। আজানেরও স্কুল কামাই করা যাবে না। সামনে কী একটা পরীক্ষা আছে। এসবই আসলে ছুতো। সংসারের টানাটানিতে তুলির উৎফুল্লভাব কমেছে। সে হয়তো শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে আগের মতো হইচই করে কাটাতে পারবে না। অভিনয় দিয়েও নয়! যদিও পরিস্থিতি এতটা গুরুতর নয় মোটেই। টিভি ওয়র্ল্ডে পরিচালকদের এমন ফেজ় আসেই। দু'-চার মাস, এমনকী এক বছরও বসে থাকে কেউ-কেউ! তখন জমানো টাকায় জীবন-ধারণ করে। তারপর ঠিক কাজ চলে আসে হাতে। ভাল কাজের লোকেদের তো আসেই। কুনালের দোষের মধ্যে, টাকা সে জমাতে পারেনি। খরচ করে ফেলেছে নিজের প্রোডাকশনে। এখানেই তার সঙ্গে অন্য ডিরেক্টরদের তফাত। একটা সিরিয়ালের জন্য চ্যানেল থেকে যে বাজেটটা পাস হয়, তার মধ্যে থেকে পরিচালক নিজের

> জনপ্রিয়তার মাপকাঠি জৌলুস নয়। অনেক ম্যাড়মেড়ে ডেলি সোপ নিম্নরুচির গল্পের টানে হুড়-হুড় করে চলে।

প্রয়োজনীয় অ্যামাউন্টটা গুছিয়ে নিয়ে ব্যাঙ্কে ফেলে, তবে হাত দেয় কাজে। তাতে যদি প্রোডাকশনের জৌলুস হারায়, ভ্রূক্ষেপ করে না। এখানে একটা মজার ব্যাপার আছে, জনপ্রিয়তার মাপকাঠি কিন্তু জৌলুস নয়। অনেক ম্যাড়মেড়ে ডেলি সোপ নিম্নরুচির গল্পের টানে হুড়-হুড় করে চলে। অত খারাপ বোকা-বোকা গল্প নিয়ে কাজ করতে রুচিতে বাধে কুনালের। আর আলো, সেটের বাজেট মেরে প্রোডাকশন কোয়ালিটি নামাতেও মন চায় না। এমনিতেই বাংলা সিরিয়াল হিন্দির কাছে হেরে ভূত হয়ে আছে। বাংলার ঘরে-ঘরে এখন প্রাইম টাইমে হিন্দি সিরিয়ালই চলে। হিন্দি সিরিয়ালের সঙ্গে পাল্লা টানতে গিয়ে নিজের পারিশ্রমিক থেকে খরচ করে ফেলেছে কুনাল। তুলি সতর্ক করত। উত্তরে কুনাল বলত, যা বাজেট দেয় চ্যানেল, তাতে অনেকটাই কম্প্রোমাইজ় করতে হয়। কিন্তু একটা স্ট্যান্ডার্ড অবধি কাজ না করলে লোকে তো তারই বদনাম করবে। ভবিষ্যতে কাজও পাবে না। এতটা সিনসিয়ার থাকা সত্ত্বেও কাজ এল না। শেষ মেগা সিরিয়াল 'মোহনার আকাশ'-এর কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে তিন মাস হল। চ্যানেলের কাছে এখনও যা ব্যাঙ্কিং আছে, দু' মাস এয়ারে থাকবে। টিভি জগতের বাইরে কুনালের স্বজন-পরিজনরা জানবে, সে এখনও কাজের মধ্যে আছে। টেলিকাস্ট শেষ হলেই প্রশ্ন আসবে, এরপর কী করছ? খোকনদা অবশ্য তার আগেই জেনে যাবে কুনালের পরিস্থিতি। ধার নেওয়া টাকাটা তো শোধ চাইবেই, বাড়ি থেকেও উঠে যেতে বলতে পারে। তখন আবার নতুন ফ্ল্যাট খোঁজ। এ বাড়ির মতো সস্তায় তো কিছুতেই পাওয়া যাবে না। সেই কারণেই কুনাল ঠিক করেছে, আচমকা হাতে কিছু টাকা এসে গেলে, প্রথমে খোকনদার ধারটা শোধ করবে। তারপর হাত দেবে কাজে।

কোনা এক্সপ্রেস হয়ে দুর্গাপুর হাইওয়ে ধরেছে কুনাল। এই রাস্তায় গাড়ি কম স্পিডে চালালেই অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার চান্স বেশি। গতির কারণেই একটু-একটু করে যেন কনফিডেন্স বাড়ছে কুনালের। নিজের কাজের পরিস্থিতি যতটা খারাপ ভাবছে, তেমনটা নয়। এই তো নতুন একটা বাংলা চ্যানেল লঞ্চ করছে, মিটিং হয়েছে কুনালের সঙ্গে। ওরা কুনালের তৈরি ধারাবাহিকে আগ্রহী। তবে পাইলট পর্ব কুনালকে নিজের টাকায় করে দিতে হবে। চ্যানেলের যদি পছন্দ হয়, সিরিয়ালের পুরো টাকা ওরাই ফিনান্স করবে। সিলেকশন নিয়ে চিন্তা নেই কুনালের। চ্যানেল তাকে এমনি-এমনি ডাকেনি। তার কাজ, মার্কেট রিপোর্ট সার্ভে করেই অফারটা দিয়েছে। পাইলট দেখাটা ওদের রুলের অন্তর্গত বলেই টাকা জোগাড় করতে হবে কুনালকে। তার ব্যবস্থা করতেই আজ কানাইপুরে যাওয়া। দেবরাজের ভাই পারিজাত কানাইপুরে প্রোমোটিং করছে। ভাঙা দুর্গাবাড়িটা ওর সাইট। ঘটনাচক্রে ওই বাড়িতেই বিজনের ওয়র্কশপ। পারিজাতের কাছে একটা তথ্য নতুন পেল কুনাল, ও বাড়ির চার শরিকের একজন নাকি বিজনের ঠাকুরমা। বাকি তিন শরিক বাড়ি বিক্রির ব্যাপারে রাজি। বিজনের ঠাকুরমা বাধ সাধছিল। ও বাড়ির যারা টেনেন্ট, তারাও ক্ষতিপূরণ নিয়ে উঠে যেতে চাইছে। কারণ, বাড়ির যা অবস্থা, যে-কোনওদিন ভেঙে পড়তে পারে। বিজনও ক্ষতিপূরণে রাজি হয়ে যেত, নিশ্চিত ছিল পারিজাত। কথাও একটু-আধটু এগোচ্ছিল। হঠাৎই বিজন একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে গিয়েছে। দুর্গাবাড়ির বাসিন্দাদের জড়ো করে বোঝাতে শুরু করেছে, প্রোমোটার ঠকাচ্ছে তাদের। রীতিমতো আন্দোলন নেমে পড়েছে। এর পিছনে তার সবচেয়ে বড় সাপোর্ট, ঠাকুরমা। সে সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার ছেড়ে দিয়েছে নাতির উপর। অর্থাৎ বিজন যা বলবে, সেটাই করবে। বিজন বললেই বাড়ি বিক্রির কাগজে সই করবে, নচেত নয়। পারিজাতের বক্তব্য আসল পয়েন্টে আসতেই কান খাড়া করেছিল কুনাল। পারিজাত বলেছিল, "তুমি যদি বন্ধুকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ব্যাপারটা সেট্‌ল করে দাও, মানে আমার বাজেটমতো, তোমার চারটে এপিসোডের টাকা আমি দিয়ে দেব। সে টাকা তোমায় ফেরত দিতে হবে না।"

অফারটা কতটা সিরিয়াসলি করছে বোঝার জন্য কুনাল জিজ্ঞেস করেছিল, "চারটে এপিসোডে কত টাকা লাগবে, না জেনেই কমিট করে বসছ!"

"কত আর লাগবে পাঁচ লাখ, ছয়? তুমি লড়ে যাও, আমার যদি সেরকম প্রফিট হয়, দশ অবধি দিতে পারি।"

ক্রমশ

অলঙ্করণ: নির্মলেন্দু মণ্ডল

ত্রিপটি

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

দেবরাজদের বাড়িতে বসে থেকে সেদিন পায়ের তলা ঘামতে শুরু করেছিল কুণালের। পারিজাতকে বলেছিল, "ঠিক আছে, আমি ট্রাই করছি। খুব তাড়াতাড়ি যাব কানাইপুরে। কী হল না-হল, খবর দেব তোমাকে।" কুণাল যখন বেরিয়ে আসছিল ওদের বাড়ি থেকে পারিজাত অদ্ভুতভাবে হাসছিল। ঠগকে চিনতে পেরে লোকে যেমন হাসে। হয়তো হাসিটার মানে তা ছিল না, সবটাই কুণালেরই মনগড়া! পারিজাতের প্রোজেক্টে মধ্যস্থতা করে যদি কিছু টাকা পাওয়া যায়, প্রথমে খোকনদার ধারটা শোধ করবে কুণাল। তারপর পাইলট এপিসোড নিয়ে ভাববে। তবে সবচেয়ে প্রথমে দেখতে হবে, বিজন কেন দুর্গাবাড়ির ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছে? অমিতেশ এখন কানাইপুরে। মাঝে একদিন দু'জনের সঙ্গেই কথা হয়েছিল ফোনে। তখনই কুণাল জানিয়েছিল বিজনকে, খুব তাড়াতাড়ি কানাইপুরে গিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলবে। কী দরকার, বিজন জানতে চায়নি তখন। ভেবেছে সামান্য কোনও বিষয়। ও ভাবতেই পারবে না, দুর্গাবাড়ির প্রসঙ্গ নিয়ে উদয় হবে কুণাল। চমকাবে খুব! কুণাল অবশ্য একটা ব্যাপার ঠিক করে রেখেছে, ওখানে গিয়ে যদি দেখা যায় দুর্গাবাড়ির ব্যাপারে বিজনের অবস্থান একেবারে সঠিক জায়গায়, কুণাল মোটেই জোর করবে না বাড়ি বিক্রির জন্য। পরিস্থিতিটা আগে গিয়ে বুঝতে হবে। গাড়ির স্পিড একটু কমিয়ে আনে কুণাল। একটু পরেই দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে ছেড়ে দিল্লি রোড ধরতে হবে। ক্রসিংটা ভীষণ গুলিয়ে যায়। বেশ কয়েকবার দিল্লি রোডে না ঢুকে এগিয়ে গিয়েছিল কুণাল। তারপর থেকে এই ব্যাপারটা খেয়াল রাখে তুলি, জাংশনের কাছাকাছি এলেই তুলি বলে, 'এবার কিন্তু ডানদিকে।' লাস্ট তুলিকে ছাড়া কানাইপুর কবে এসেছিল কুণাল, মনে পড়ে না।

কোনও-কোনও দুপুর হয় ভীষণ নিঃঝুম। ঘোর রাতের চেয়েও আশঙ্কাময়। কর্তা গিয়েছিলেন পাশের গ্রামে সামন্তদের নারায়ণ বসাতে। সামন্তরা বিরাট ব্যবসাদার। অর্থবলে কনকলতাদের জমিদারের কাছাকাছি। সামন্তরা তাদের পুরনো বাড়ি ভেঙে দালানকোঠা তুলেছে, নতুন নাটমন্দির গড়েছে তারা। সেখানেই নারায়ণ প্রতিষ্ঠা করতে গেলেন শ্রীধর ভট্টাচার্য, কনকলতার স্বামী।

সপ্তাহখানেক হল জমিদার চন্দ্রমোহন চৌধুরি এক সন্ধেয় কর্তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন বৈঠকখানায়। কনকলতা খুব অবাক হয়েছিলেন এভাবে ডেকে পাঠানোয়। কর্তার সঙ্গে জমিদারবাবুর সন্ধেকালীন যে আড্ডাটা হয়, সব সময় কনকলতার বাড়িতেই। এ বাড়িটা জমিদারবাড়ির চৌহদ্দির শেষ প্রান্তে, কুলপুরোহিতের বাসভবন হিসেবে নির্দিষ্ট। এই বাড়িতেই কনকলতার শ্বশুর-শাশুড়ি দেহ রেখেছেন। জমিদার চন্দ্রমোহন চৌধুরির জমিদারজনিত বদ নেশাগুলো নেই। মদ ছোঁন না। আলো জ্বলে না নাচঘরে। ইয়ার-বন্ধু হাতে গোনা। তাস-পাশা খেলার

লণ্ঠনের আলোতেও চন্দ্রমোহনের মুখ আরও উজ্জ্বল হয়ে উ

ঝোঁক নেই তাঁর। অত্যন্ত প্রজাবৎসল আর খুবই ধর্মপ্রাণ মানুষ। বিয়ে হয়ে আসার পর থেকে উনি দেখছেন, কর্তা আর জমিদারের খুব ভাব। নাটমন্দিরে নিত্য পুজোর সময় চন্দ্রমোহন অবশ্যই থাকেন, সন্ধেবেলা আধ্যাত্মিক আলোচনা করতে আসেন পুরোহিতগৃহে। চন্দ্রমোহন কর্তার চেয়ে অন্তত দশ-বারো বছরের বড় তো বটেই। তবু ঠাকুর-দেবতাকে সর্বক্ষণ আশ্রয় করার মতো বয়স হয়নি। বাধ্য ছাত্রের মতো বসে থাকতেন কর্তার সামনে। আকাশপাতাল আলোচনা হত। পাশের ঘরে সেলাই অথবা বাড়িতে পুজোয় বসবে, একথা তখনকার দিনে চিন্তাই করা যেত না। তারপর আবার কর্তার সঙ্গে চন্দ্রমোহনের এমন বন্ধুত্ব! গ্রামের উচ্চবর্ণের লোকেরা দান-ধ্যান করতে এলে অনুমতি নিত জমিদারবাবুর কাছে। এতটাই সম্মানের সঙ্গে চন্দ্রমোহন তাঁর পুরোহিত পরিবারকে আগলে রেখেছিলেন। খোকা তখন দু' বছরের। কর্তা বেরলেন সামন্তদের বাড়ির উদ্দেশে। মনে-মনে দুর্গানাম জপে ছিলেন কনকলতা। পুরো বিষয়টা তাঁর ভাল ঠেকছিল না। তারপর এল সেই দমচাপা আশঙ্কাময় দুপুর। বাড়ির বাইরে

ঠত। কনকলতা দু'জনকেই জল, শরবত, ফলাহার দিতেন। তেল ভরে দিতেন লণ্ঠনে।

সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকা কনকলতার কানে সেসব আসত। কিছুটা বুঝতেন, কিছুটা না। কর্তা মোটা-মোটা পুঁথি নামিয়ে চন্দ্রমোহনকে পড়ে শোনাতেন। লণ্ঠনের আলোতেও চন্দ্রমোহনের মুখ আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠত। কনকলতা দু'জনকেই জল, শরবত, ফলাহার দিতেন। আলো ঝিমিয়ে এলে তেল ভরে দিতেন লণ্ঠনে। রাত বেড়ে গেলে পাশের ঘর থেকে গলা ঝেড়ে খেয়াল করিয়ে দিতেন সময়। চন্দ্রমোহন পকেট থেকে ঘড়ি বের করে টাইম দেখতেন। বলতেন, 'না, ঠাকুরমশাই অনেক বেলা হল। এবার চলি।' কর্তা হাতে লণ্ঠন ঝুলিয়ে চন্দ্রমোহনকে মূলবাড়িতে পৌঁছে দিতেন। এই ছিল মোটামুটি রোজকার নির্ঘণ্ট। সেদিন হঠাৎ বৈঠকখানায় ডাক পড়ায় একটু চিন্তান্বিত হয়েছিলেন কনকলতা। কর্তা ফিরতেই জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কী ব্যাপার গো? কোনও গন্ডগোল?"

কর্তা বললেন, "না, সেরকম কিছু না। জয়দেব সামন্ত এসেছিল জমিদারবাবুর কাছে, ওদের নতুন বাড়িতে নারায়ণ বসাতে হবে। আমাকে চায়।"

"রাজি হলেন জমিদারবাবু?" জানতে চান কনকলতা।

বিমর্ষভাবে কর্তা বললেন, "হ্যাঁ। রাজি তো হতেই হবে। সামন্তদের এখন অনেক পয়সা। ওদের শত্রু বানিয়ে লাভ নেই।"

এটা যে চন্দ্রমোহনের এক ধরনের পরাজয়, কনকলতা তাঁর সাধারণ বুদ্ধিতেই বুঝেছিলেন। জমিদার বাড়ির পুরোহিত অন্য গাছের পাখিরাও ডাকছিল কেমন একটা ভয়ে-ভয়ে। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে শুয়েছিলেন তিনি। এমন সময় সেই ঘোর অমঙ্গলের ডাক, 'কনকলতা! কনকলতা!' জমিদারবাবুর গলা। চাপাস্বরে ডাকছেন, এই প্রথম নাম ধরে, কেঁপে যাচ্ছে ডাকটা। সাবধানে ফেলা পদশব্দে উঠে এল বারান্দায়। এবার শিকলের ঠক ঠক। 'কনকলতা। দরজা খোলো। ফিরিয়ে দিও না।' চন্দ্রমোহন আরও জোরে আওয়াজ করতে পারতেন। মূল বাড়ির দূরত্ব এখান থেকে অনেকটাই। তারপর আছে গাছ-পালার আড়াল। ওঁর ব্যাকুলতা কেউ দেখতেও পাবে না। তবু বাড়াবাড়ি করেননি, হয়তো অপরাধবোধে! চন্দ্রমোহন যে এমন কাণ্ড করবেন, কর্তার অবর্তমানে ঘরে ঢুকে পড়তে চাইবেন, এমনটা কল্পনাতেও আসেনি কনকলতার। পুরোহিত গিন্নির উপর জমিদারের যে একটা মুগ্ধতা বোধ ছিল, তা অবশ্যই টের পেয়েছেন কনকলতা। কিন্তু কোনও লালসা তো দেখেননি। ডাকাডাকি যখন অসহ্য পর্যায়ে পৌঁছল, জানলার কাছে উঠে গিয়েছিলেন কনকলতা। অত্যন্ত দৃঢ়কণ্ঠে জমিদারের উদ্দেশে বলেছিলেন, "আপনি চলে যান। নিজের সর্বনাশ করবেন না। আমি কিন্তু লোক ডাকতে বাধ্য হব।"

ব্যস, আর কিছু বলতে হয়নি। ফিরে গিয়েছিলেন চন্দ্রমোহন। ওঁর সেই বিধ্বস্ত, টলোমলো পায়ে ফিরে যাওয়া দেখে কনকলতা নিশ্চিতভাবে বুঝেছিলেন, চন্দ্রমোহন আসলে সামন্তদের কাছে হেরে যাওয়ার ক্ষতে প্রলেপ দিতে এসেছিলেন। তা বলে এভাবে!

নিজের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গ কামনা করে...সারা দুপুর, বিকেল এসব ভেবে-ভেবে ফুঁপিয়ে গেলেন কনকলতা। বুঝে উঠতে পারছিলেন না, কর্তা ফিরলে জমিদারবাবুর কাণ্ডটা বলা ঠিক হবে কি না? খুবই কষ্ট পাবেন উনি। চন্দ্রমোহনের আশ্রয় ছেড়ে যাবেন নিশ্চয়ই। তখন আবার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। কর্তা ফিরলেন সন্ধের আগেই। ততক্ষণে কনকলতা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ঘটনাটা চেপে যাবেন। সামন্তদের অপমানে জমিদারের এমন মতিভ্রম। এই দুর্ঘটনা দ্বিতীয়বার নিশ্চয়ই ঘটবে না। কর্তাকে এসব বলে গেলে দু' বছরের ছেলে কোলে নিয়ে সপরিবারে পথে দাঁড়াতে হবে। কর্তার থেকে দান ভর্তি ঝোলা নিয়ে ঘরে রেখে এলেন কনকলতা। ঘটির জল কর্তার পায়ে ঢেলে দিতে-দিতে জানতে চাইলেন, "পুজো কেমন হল?"

কর্তা পরিতৃপ্তির কণ্ঠে বললেন, "ভাল। খুব ভাল। নিষ্ঠা, আয়োজনের কোনও ত্রুটি ছিল না। আমাকে যথেষ্ট সম্মান দিয়েছে। পূজার্চনা দেখে বাড়ির লোক অভিভূত! জয়দেব সামন্ত তো একেবারে ধরে পড়ল, 'ঠাকুরমশাই আপনি আমাদের নাটমন্দিরের ভার নিন। জমিদারবাড়ির চেয়ে অনেক বেশি সুবিধে পাবেন। মাথায় করে রাখব আমরা।'"

"তুমি কী বললে?" অদম্য কৌতূহলে জানতে চেয়েছিলেন কনকলতা। চন্দ্রমোহনের আশ্রয়কে উপেক্ষা করার সুযোগ এসেছে!

গামছা দিয়ে পা মুছতে-মুছতে কর্তা বললেন, "কী আর বলব! বললাম, আমি চলে এলে চন্দ্রমোহন খুব ভেঙে পড়বে। আমাকে ওর খুব প্রয়োজন। আমি পাশে না থাকলে ও জমিদারিতে মন টেকাতে পারবে না। প্রজারা ওর বাপের আমলের মতোই কষ্ট ভোগ করবে।"

চন্দ্রমোহন পরবর্তী দুই সন্ধেতে এলেন না। অজুহাত হিসেবে কর্তাকে কী বলেছিলেন, কনকলতা জানেন না। কর্তাকে জিজ্ঞেসও করেননি। যেদিন এলেন, ছিলেন আগের মতোই স্বাভাবিক। মাঝের সময়টুকুতে কর্তার সঙ্গে দেখা হয়েছে, বুঝে নিয়েছেন, কনকলতা সেই ঘটনার কথা উত্থাপন করেননি স্বামীর কাছে। আলাপ-আলোচনা চলতে লাগল পরের ক'দিন। কনকলতা ফল, শরবত এগিয়ে দিলেন প্রয়োজনমাফিক। শুধু আড্ডায়-আড্ডায় রাত বেড়ে গেলেও গলা খাঁকারি দিতেন না। তাঁর এই যন্ত্রবৎ আচরণ ধরা পড়ে গেল কর্তার চোখে। জানতে চাইলেন, "কী ব্যাপার, কনকলতা, তোমাকে ইদানীং জমিদারবাবুর সামনে বড্ড আড়ষ্ট দেখি!"

"কই না তো, আমি এরকমই থাকি। উনি মনিব মানুষ। ওঁর সামনে কি বেশি সহজ থাকা শোভা পায়? আগে কখনও-সখনও সেটা ভুলে যেতাম। এখন ভুলি না।"

একটা-দুটো করে দিন গড়াতে লাগল। কনকলতার মন থেকে একটা আশঙ্কা গেল না, আহত বাঘটা আবার ফিরে আসবে না তো? কর্তা কোনও কাজে বাইরে গেলে, সদ্য হাঁটতে শেখা ছেলেটাকে নিয়ে বারান্দায় চলে আসতেন কনকলতা। অবুঝ ছেলেটার সঙ্গে চেঁচিয়ে অর্থহীন বাক্যালাপ চালাতেন। এভাবেই অস্তিত্ব জানান দিতেন জমিদার বাড়ির ঠাকুর চাকরদের কাছে। বাঘ যাতে সুযোগ না পায় কাছে ঘেঁষার! আঘাত কিন্তু এল। তবে অপ্রত্যাশিতভাবে। এক সকালে, কর্তা সদ্য বেরিয়েছেন নাটমন্দিরে পুজো করতে, গোপালের মা ছুটতে-ছুটতে এল, "ও বামুনদিদি, ও বামুনদিদি, কাছারি বাড়িতে এসো। সেখানে মারাত্মক কাণ্ড! বিচার হচ্ছে তোমার কর্তার।"

কথার আগামাথা কিছুই বুঝলেন না কনকলতা, এটুকু বোধগম্য হল, কর্তার ভীষণ বিপদ! ছেলেকে কোলে নিয়ে দৌড়লেন কাছারি বাড়ির দিকে। ঘরভর্তি লোক। ভিড় সরে পথে করে দিল তাঁকে। চন্দ্রমোহন বসে আছেন চেয়ারে। খানিক দূরে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছেন কর্তা। এই ভঙ্গিতে তাঁকে আগে কখনও দেখেননি কনকলতা। জমিদার চিৎকার করে কী সব যেন বলছেন পুরোহিতকে। ভর্ৎসনা করছেন কোনও ব্যাপারে। মাথা ধাঁধিয়ে গিয়েছে কনকলতার, ছেঁড়া-ছেঁড়া কথা আসছে কানে। জমিদার বলছেন, "আপনার পরিবার এত লোভী! আমি কি আপনাদের উপযুক্ত দান, দক্ষিণা দিই না? সামন্তদের সিধে গ্রহণ করেন, ঠিক আছে। আমিই অনুমতি দিয়েছি। তা বলে বেজাতের হাত থেকেও দান নেওয়া শুরু করলেন! যাদের জল চলে না..."

কনকলতা সমস্তটাই বুঝে গেলেন। তখনকার দিনে ব্রাহ্মণরা উঁচু বংশ ছাড়া দান গ্রহণ করতেন না। জমিদারের নিজস্ব পুরোহিত তো নয়ই। কে কী দিল না-দিল, কর্তা ঘুরেও দেখতেন না। দোষ করেছিলেন কনকলতা। হারানি জমিদারবাড়ির বাগান ঝাঁট দিত, নালা পরিষ্কার করত, সুখ-দুঃখের কথা কইত বামুনদিদির সঙ্গে। সবই দূর থেকে। হঠাৎই একদিন কনকলতা হারানির শরীর দেখে আন্দাজ করলেন, ফের অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে সে। হারানির তিনটে ছোট-ছোট মেয়ে আছে। তাদের মানুষ করার বদলে আবার বাচ্চা! খানিকটা বিরক্তির সঙ্গেই কনকলতা বলেছিলেন, "কী রে, আবার বাধালি?" শাড়ি গাছকোমর বেঁধে দু' হাত তফাতে মাথা নিচু করে বসেছিল হারানি। বলেছিল, "বামুনদিদি, আশীর্বাদ করো এবারটা যেন ছেলে হয়। তা হলে আমি বাঁচি।" বড় মায়া লেগেছিল কনকলতার। আপনা থেকেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, "এবার তোর ছেলেই হবে।"

সত্যিই ছেলে হল! এতে কনকলতার কোনও কৃতিত্ব নেই। সবই ভগবানের ইচ্ছে। কিন্তু সেকথা বললে শুনছে কে? হারানি চুপি-চুপি শাশুড়িকে নিয়ে এল। সঙ্গে সামান্য দান। বারান্দায় রেখে বিষম কাকুতি-মিনতি করতে লাগল সেটা গ্রহণ করার জন্য। কনকলতার আশীর্বাদে তাদের পুত্রসন্তান লাভ হয়েছে, তাঁর কৃপাদৃষ্টি থাকলে জাতক আয়ুষ্মান হবে। বেচারিদের ফেরাতে পারেননি কনকলতা। দান তুলে রেখেছিলেন ঘরে। কর্তা এসবের কিছুই জানেন না। কনকলতা বলতে সাহস পাননি। কর্তা এসব ব্যাপারে ভীষণ গোঁড়া। বিনয়ের সঙ্গে দান-দক্ষিণা প্রত্যাখ্যানে একেবারে সিদ্ধহস্ত। খবরটা যে কীভাবে চন্দ্রমোহনের কানে পৌঁছল, সেটা ভেবে অবাক হচ্ছেন কনকলতা। এর আগেও এমন কাণ্ড তিনি বেশ কয়েকবার করেছেন। অসুস্থ স্ত্রীলোককে দেখতে ঢুকে পড়েছেন বাগদি, বাউরির বাড়িতে। ছোঁয়াছুঁয়ি মানেনি। সেকথা কি ছড়ায়নি বাতাসে? কর্তার কানে এসেছিল, মৃদু ভর্ৎসনা করে ছেড়ে দিয়েছেন। চন্দ্রমোহনও হয়তো জেনেছিলেন। কিছু

তিনি বুঝছিলেন না, কর্তা ফিরলে জমিদারবাবুর কাণ্ডটা বলা ঠিক হবে কি না?

বলেননি। সেই দুপুরে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর থেকে বোধ হয় ওত পেতে বসেছিলেন, কীভাবে কনকলতাকে শিক্ষা দেওয়া যায়। আজকের এই বিচার পর্ব যে একটা প্রহসন, কনকলতা, চন্দ্রমোহন ছাড়া এখানকার আর কেউ জানে না। তাই তো জমিদারবাবু এত হম্বিতম্বি করলেও, কনকলতার দিকে তাকাতে পারছিলেন না। যদি তাকাতেন, দেখতেন কনকলতার দৃষ্টি দাবানল হয়ে উঠেছে!

বিচার শেষে চন্দ্রমোহন বিধান দিলেন, "ঠাকুরমশাই, আপনি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাই আমি মন্দিরের কাজ থেকে আপনাকে বরখাস্ত করছি না। তবু প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। নয়তো প্রজারা বলবে, ধর্মের চেয়ে আমি সম্পর্ককে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি। আপনাকে এখনই এখান থেকে নাকে খত দিয়ে নাটমন্দির পর্যন্ত যেতে হবে!"

বুকটা খানিকক্ষণের জন্য ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল কনকলতার! হয়তো পড়েই যেতেন মাথা ঘুরে। কোনও এক মহিলা ধরে রেখেছিলেন তাঁকে। কাছারিবাড়ি থেকে নাটমন্দিরের দূরত্ব অনেকটাই। মূল বাড়ির পর মোরামের রাস্তা, দু' বিঘের জমিদার বাড়ির শেষ মাথায় মন্দির। মন্দিরের দিকে মুখ করে কর্তা হাঁটু মুড়ে বসলেন। অপমানে মুখ লাল। কনকলতার একবার মনে হল ছুটে গিয়ে চন্দ্রমোহনের পা জড়িয়ে ধরেন। বলে, এবারের মতো ক্ষমা করে দিন আমাদের। পরক্ষণেই মনে হল জমিদারবাবু তো এটাই চাইছেন, আমি কেন তার মনোবাসনা পূর্ণ হতে দেব? খালি গায়ে নাকে খত দিচ্ছেন কর্তা। পটবস্ত্র গলায় ঝুলছে। পাথর বসানো মন্দির চাতালের মতো ফর্সা পিঠে ধবধব করছে উপবীত। কর্তাকে অনুসরণ করে চলেছে উপস্থিত নির্বাক প্রজারা। শব্দ বলতে হেঁটে আসা জমিদারবাবুর জুতোর মসমস আর লাঠির আওয়াজ। চোখের জলের বন্যা

নেমেছে কনকলতার। মনে-মনে বলছেন, হে ঠাকুর, তোমার মনে এই ছিল। একজন ধর্মনিষ্ঠ মানুষকে তুমি এভাবে শাস্তি দিলে! তা-ও আমার প্রাপ্য শাস্তি! মন্দিরে পৌঁছনোর আগে প্রজারাও কেউ কেউ ফোঁপাতে শুরু করল। ধমক দিলেন জমিদার, "দেবতার জন্য কাউকে তো কখনও কাঁদতে দেখি না। নীতিভ্রষ্ট পূজারির জন্য এত চোখের জল ফেলার কী আছে?" এভাবেই চন্দ্রমোহন কনকলতার নিজস্ব দেবতাটিকে ভুলুণ্ঠিত করে শোধ তুলেছিলেন প্রত্যাখ্যানের। কর্তার কনুই ধরে মন্দির থেকে ঘরে ফিরিয়ে এনেছিলেন কনকলতা। অবোধ ছেলেটা অন্য কারও কোলে ছিল। পিতার অপমান স্বচক্ষে দেখেও উপলব্ধি করেনি। না বুঝে কাঁদছিল। উপলব্ধি করল না

সানন্দা ওয়ান স্টপ ক্লাসিফায়েড

তোতলামী?
সারাতে চান ? বিশ্বের শ্রেষ্ঠ তোতলামি সারানোর বিশেষজ্ঞ শ্রী পার্থ বাগচি ১৮ থেকে ২৫ শে ডিসেম্বর '২০১১ ব্যাঙ্গালোর থেকে আসছেন কোর্স করাতে কল্যাণ ভবনে ৬৭, বালিগঞ্জ গার্ডেন্স, কলকাতা-৭০০০১৯ আজই বুকিং- এর জন্য যোগাযোগ করুন।
080-26544204/ 09886060037
www.stammeringcurecentre.com

Avail 10% Discount
on Every Original Cutting
আকার aakar
fashion boutique
Studio:
71, Ballygunge Gardens,
Kolkata 700029
Ph.: 24607650
9903728823

এই বিভাগে বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ ৯৮৩১৫ ৮১০০২

আজও। ঘরে ফিরে কর্তা গুম মেরে রইলেন। কনকলতাকে তিরস্কার তো দূরস্থান, একটি বাক্যও ব্যয় করলেন না। কপালে শুধু গাঢ় ভাঁজ। অশুভ আশঙ্কায় কেঁপে উঠেছিল কনকলতার বুক। পরদিন আলো ফোটার আগেই কর্তা ডেকে তুললেন কনকলতাকে। বললেন, "বাক্স-প্যাঁটরা বেঁধে নাও। গ্রাম ছেড়ে চলে যাব আমরা।"

"কোথায় যাব? কে আছে আমাদের?" গভীর অনিশ্চয়তায় জানতে চেয়েছিলেন কনকলতা।

কর্তা বলেছিলেন, "ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস হারিও না। কোথাও না কোথাও তিনি আমাদের আশ্রয়ের বন্দোবস্ত করে রেখেছেন।"

জিনিসপত্র ঘুছিয়ে ঘুমন্ত ছেলেকে কোলে নিয়ে কনকলতা বেরিয়ে পড়েছিলেন কর্তার সঙ্গে। তাঁর তো আশ্রয় নিয়ে চিন্তা নেই, স্বামীর ছায়ার তলায় থেকে যাবেন। মাইলের পর মাইল গোরুর গাড়িতে যাওয়ার পর রেল স্টেশনে পৌঁছনো গেল। একটু জিরিয়ে নিয়ে কয়লার ইঞ্জিনের ট্রেন। রোদ ঢলে পড়ল ট্রেন পথেই। এসে নামলেন কানাইপুরে। সেই প্রথমবার। কনকলতা জানেন না, কার কাছে যাওয়া হবে। জিজ্ঞেসও করেননি কর্তাকে। জায়গাটা একটু শহর মতো। বাঁধানো চওড়া রাস্তা, বেশির ভাগ পাকাবাড়ি। একটা-দুটো মোটরগাড়িও দেখা গেল। হাঁটতে-হাঁটতে কর্তা একে-তাকে জিজ্ঞেস করে, রাজবাড়ির সিংহদুয়ারে পৌঁছলেন। দারোয়ানকে বললেন, "জমিদারবাবুকে গিয়ে বলো, রায়পুরের পুরোহিত শ্রীধর ভট্টাচার্য দেখা করতে এসেছেন।"

কনকলতা এই জমিদারকে চেনেন না। কর্তার সঙ্গেই বা কবে আলাপ হল, তাও জানা নেই। দারোয়ান ভিতরমহলে খবর দিতে গেল, সেই ফাঁকে কর্তা পরিচয় দিলেন কানাইপুরের জমিদারের। নাম বরেন ঘোষাল। চন্দ্রমোহনের জ্ঞাতি। কোনও একবার দুর্গাপুজোয় গিয়েছিলেন রায়পুরে। কর্তার পুজো দেখে এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন, বলেছিলেন, "ঠাকুরমশাই, আপনার মতো নিষ্ঠাসহকারে পুজো বহুদিন আমি কাউকে করতে দেখিনি। কী স্পষ্ট সংস্কৃত উচ্চারণ! বোঝা যায়, আপনি মন্ত্রের মর্মে পৌঁছে গিয়েছেন। যদি কখনও কানাইপুরের দিকে আসেন, একবার পায়ের ধুলো দেবেন আমার বাটিতে। আর কোনওদিন যদি আমাকে আপনার সেবায় লাগে, আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।" পুজোপাঠ দেখে ভক্তিভাব জাগলে লোকে তো কত কিছুই বলে। ক'টা দিন কাটতে না-কাটতে সব ভুলে যায়। কর্তার সঙ্গে বরেন ঘোষালের সাক্ষাৎ হয়েছিল বছর দুই অথবা তিন আগে। উনি কী আর সেসব কথা মনে রেখেছেন? এখানে আশ্রয়ের ব্যাপারে কনকলতা ঠিক ভরসা পাচ্ছিলেন না। কর্তা ভালমানুষ, লোককে বিশ্বাস করাই তাঁর স্বভাব। এক্ষেত্রে কিন্তু কর্তার বিশ্বাসেরই জয় হল। রাজবাড়ির ভৃত্য নিতে এল কনকলতাদের। লটবহর বইল সেই ভৃত্য আর দারোয়ান।

কী স্পষ্ট সংস্কৃত উচ্চারণ আপনার! বোঝা যায়, আপনি মন্ত্রের মর্মে পৌঁছে গিয়েছেন।

ক্রমশ

অলঙ্করণ: নির্মলেন্দু মণ্ডল

সানন্দা শব্দভেদ

সূত্র পা শা পা শি

১ শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র। ৫ মুঘল সম্রাট শাজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র। ৮ অসুর, দৈত্য। ৯ বাসস্থান। ১০ অবয়ব বিশিষ্ট। ১২ রবিবার সম্বন্ধীয়। ১৫ বাধার অভাব। ১৮ রসের স্বাদ উপলব্ধি করা। ২০ অন্যের অগোচরে বাস। ২২ নতুনত্বপ্রাপ্তি। ২৪ জাঁকজমক আবার সংঘটিত হওয়া। ২৬ পরিবর্ত বা বিনিময়। ২৮ সদ্য এসেছে এমন। ২৯ বিভিন্ন উপাদানের মিলন বা একত্রীকরণ।

১	২	৩		৪	■	৫		৬	৭
৮			■		■		■	৯	
	■	■	■	১০			১১	■	
১২	১৩		১৪		■	■		■	
■		■		■	১৫	১৬		১৭	
১৮		১৯			■		■		■
	■		■	■	২০				২১
	■	২২	২৩			■	■	■	
২৪	২৫	■		■		■	২৬	২৭	
২৮				■	২৯				

গত সংখ্যার সমাধান

আ	ম	জ	ন	তা	■	ন	তো	দ	র
ম	■	ন	■	■	পা	■	■	র	দ
দ	■	ম	ত	ল	ব	■	স	দ	ন
র	হি	ত	■	ব	ক	ল	ম	■	■
বা	■	■	অ	জ	■	ব	ন	বা	স
র	ক্ত	জ	বা	■	র	ণ	■	■	ম
■	■	ল	ক	ল	ক	■	স	হ	সা
ব	র	দ	■	ক	ম	জো	র	■	ম
র	স	■	■	ড়ি	■	■	ভা	■	য়ি
জ	না	ন্তি	কে	■	ন	ব	জা	ত	ক

সূত্র শব্দকল্প

১ জঘন্য বা বিশ্রী আচরণ। ২ চিত্ত, অন্তঃকরণ। ৩ বিভাজ্য অঙ্ক। ৪ রক্তচন্দন। ৫ দানের যোগ্য। ৬ পরিশোধ করা বা জিজ্ঞাসা করা। ৭ কোমরে বাঁধার পটিবিশেষ। ১১ প্রতিনিধিত্ব বা দায়িত্ব দেয় এমন। ১৩ দীপ্ত হওয়া। ১৪ বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র। ১৬ দৃঢ়পণ। ১৭ পুরাণে বর্ণিত সিন্ধুঘোটক। ১৮ অত্যন্ত গূঢ় এবং জটিলতাপূর্ণ। ১৯ কেবল নিজের অধীন। ২০ প্রকাশ, দীপ্তি। ২১ জনগণকে মিলিত করা। ২৩ বাতাস দেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে এমন। ২৫ লেবুবিশেষ। ২৬ মাছ শিকারে পটু পাখি। ২৭ এটি পাকানো মানে একজোট হওয়া।

কনকলতারা যখন জমিদার বরেন ঘোষালের সামনে দাঁড়ালেন, পরম আত্মীয়ের বেদনা ফুটে উঠল তাঁর মুখে। বিষম বিস্ময়ে জানতে চাইলেন, "এ কী ঠাকুরমশাই, কী চেহারা হয়েছে আপনার!"

কর্তা বললেন, "আপনার আশ্রয়ে চলে এলাম। এখন দেখুন রাখবেন, না তাড়িয়ে দেবেন।" সেই প্রথম কর্তার গলা কেঁপে গিয়েছিল।

বরেন ঘোষাল বলেছিলেন, "আপনি এখানে আজীবন থাকুন। এ তো আমার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু এমন কী ঘটল, যে রায়পুর ছেড়ে চলে আসতে হল আপনাদের?"

কর্তা আর কথা বলার অবস্থায় ছিলেন না, কান্নায় রুদ্ধ হয়ে আসছিল কণ্ঠ। জমিদার ইতিমধ্যে ইশারায় ভৃত্যকে নির্দেশ দিয়েছেন কনকলতাদের চেয়ার দিতে। বাচ্চাটার জন্য গরম দুধ আর শরবতেরও আদেশ হল। রায়পুরের সমস্ত বৃত্তান্ত বলতে হল কনকলতাকে। অবশ্যই সেই দুপুরের কথাটা বাদ দিয়ে। সেকথা আজ পর্যন্ত কাউকেই বলা হল না। ঘটনাটা মারাত্মক কিছু নয়। চন্দ্রমোহন দরজা ভেঙে ফেলেননি, স্পর্শ করেননি কনকলতাকে। ঝিম দুপুরে কর্তার অবর্তমানে পৌঁছে গিয়েছিলেন কনকলতার দোরগোড়ায়। বেশ কয়েকবার নাম ধরে ডেকেছিলেন। সেই ডাকে সাড়া দিলে কনকলতার জীবনটা অন্য পথে প্রবাহিত হত। সেটা কি নরকের পথ? সাড়া না দিয়েও তো কনকলতার পথ কুসুমাস্তীর্ণ হল না। ডাকটার কী অসীম শক্তি! কনকলতার দুঃখভরা জীবনের প্রধান কারণ হয়ে রইল।

সব শুনে বরেন ঘোষাল বললেন, "দেখুন ঠাকুরমশাই, আমি কিন্তু ধর্মনিষ্ঠ মানুষ নই। তবে প্রথানুযায়ী আমার বসতভিটেতে নাটমন্দির আছে। পরিবারের বাকি লোকেদের ইচ্ছানুসারে সেখানে পুজো হয়। আমাদের কুলপুরোহিত বৃদ্ধ হয়েছেন, তাঁর ছেলে এখন পুজো করে। আমি তাকে সেরেস্তায় নিয়ে নেব। আপনিই এবার থেকে নাটমন্দিরের দায়িত্ব নেবেন।"

সামান্য সংশয় নিয়ে কর্তা জানতে চাইলেন, "আপনি তো জমিদার চন্দ্রমোহনের জ্ঞাতি, আমাকে নিয়োগ করছেন, আপনাদের সম্পর্ক নষ্ট হবে না তো?"

"হলে হবে। আমি পরোয়া করি না। চন্দ্রমোহন দিবানিশি ঠাকুরদেবতা নিয়ে পড়ে থাকলে কী হবে, আসলে ওর বাবার মতো অমানুষই রয়ে গিয়েছে," কথা শেষ করে বরেন ঘোষাল কর্তাকে প্রশ্ন করেন, "আচ্ছা ঠাকুরমশাই, চন্দ্রমোহন নিষ্ঠার সঙ্গে ধর্ম পালন করত। শুনেছি, আপনার কাছে নিয়মিত বেদ, পুরাণ, গীতা শুনতে যেত। কিন্তু প্রবৃত্তি তো শুদ্ধ হল না? তা হলে ধর্মাচরণে কী লাভ?"

কর্তা মাথা নিচু করে বললেন, "দোষ তো আমাদেরও ছিল।"

দুর্গাপুজোটা করি গ্রামের লোকের কথা ভেবে। এবার থেকে এবাড়িতে দু

"না, সেরকম গর্হিত অপরাধ আপনারা করেননি, যার কারণে এতটা অপমান করা যায়। আপনি যে নির্লোভ মানুষ, চন্দ্রমোহনের চেয়ে আর ভাল কেউ জানে না। উপর-উপর শ্রদ্ধাভক্তি দেখালেও, ও আপনাকে নিজের সম্পত্তি মনে করত। নিচু জাতের লোকও আপনাদের দয়াদাক্ষিণ্য পেয়ে যাচ্ছে, এটা ওর সহ্য হয়নি," ঘটনার তাৎপর্য নিজের মতো সাজিয়ে নিয়ে বরেন ঘোষাল অন্য প্রসঙ্গে গেলেন, "আপনার থাকার ব্যবস্থা আমি এ বাড়িতে করতে পারছি না। এখান থেকে আধ মাইল দূরে আমাদের দুর্গাবাড়ি, ওই বাড়িটা নিয়ে বুঝে উঠতে পারছি না।"

সেই প্রথম দুর্গাবাড়িতে পা রাখা। চারপাশে ফাঁকা মাঠ দশ কাঠার বিশাল বাড়ি। তখন গোটাটাই একতলা। একটাও লোক নেই। সার সার ঘর তালাবন্ধ। যেন বন্ধ হয়ে যাওয়া জেল। সামনের দিকে একটা কোণের ঘর খুলে দিল ভৃত্য। ঘরে আসবাব বলতে একটি খাট। কর্তা সেখানে বসে জানলার বাইরে তাকিয়ে রইলেন। নন্দকে কর্তার পাশে রেখে সংসার গোছাতে লাগলেন কনকলতা।

জায়গা বদলের সঙ্গে-সঙ্গে কর্তাও কেমন যেন বদলে গেলেন।

র্গাপুজো আপনিই করবেন। থাকবেন দুর্গাবাড়িতে। মামলায় জিতে গিয়েছি আমি। ওবাড়ি ফাঁকাই পড়ে

আমার দাদার সঙ্গে দীর্ঘ মামলা চলেছিল। তখনই দুর্গাপুজো ওখান থেকে সরিয়ে এবাড়িতে নিয়ে আসি। আমার সেরকম কোনও আগ্রহ নেই, দুর্গাপুজোটা করি গ্রামের লোকের কথা ভেবে। এবার থেকে এবাড়িতে দুর্গাপুজো আপনিই করবেন। থাকবেন দুর্গাবাড়িতে। মামলায় জিতে গিয়েছি আমি। ওবাড়ি ফাঁকাই পড়ে আছে। আপনারা থাকলে তবু একটু দেখাশোনা হবে।"

কর্তা জোড়হাতে নমস্কার করে বলেছিলেন, "আপনার অশেষ দয়া। আপনাকে যে আমি কী ভাষায় কৃতজ্ঞতা জানাব, আগের সেই সদাপ্রফুল্ল ভাব তো নেইই, আত্মবিশ্বাসটাও প্রায় উধাও হয়েছে। কনকলতা ভেবেছিলেন, এটা সাময়িক। চন্দ্রমোহনের কাছ থেকে পাওয়া ধাক্কাটা সামলাতে সময় নিচ্ছেন। কিন্তু দেখা গেল, তা নয়। ঘর থেকে বেরিয়ে কানাইপুরের রাজবাড়িতে পুজো করতে যাওয়ায় প্রবল অনীহা। ঠেলে পাঠাতে হত কনকলতাকে। জোগাড়যন্ত্র ভাল নয়, তাই হয়তো মন বসছে না পুজোয়, এই ভেবে কনকলতা একদিন গেলেন কর্তার সঙ্গে। দেখলেন, রায়পুরের চেয়েও বড় নাটমন্দির। ভক্ত সমাগমও অনেক। বাড়ির মেয়েরা

হাতে-হাতে জোগাড় দিচ্ছে। ফুল, ধূপ-ধুনো, কাঁসরঘণ্টায় মন্দির মুখরিত। কিন্তু কর্তার মন্ত্র উচ্চারণে সেই জোর আর নেই। যেন ঝিমোচ্ছেন। প্রমাদ গুনেছিলেন কনকলতা। কর্তার পূজাপাঠ বরেন ঘোষালকে মুগ্ধ করেছিল, তাই তো এখানে আশ্রয় জুটেছে। পুজোর এই ছিরি দেখলে, জমিদার আদৌ থাকতে দেবেন তো এখানে? তবু ভাল, বরেন ঘোষাল নাকি পূজাপাঠের সময় মোটেই উপস্থিত থাকেন না। কিন্তু যে-কোনওদিন থাকতেও তো পারেন।

উদ্বিগ্ন কনকলতা চেপে ধরলেন কর্তাকে, “কী হল, পুজোআচ্চায় মন দিতে পারছ না কেন? এখানে তো কোনও অভাব নেই।”

বিমর্ষচিত্তে কর্তা জবাব দিয়েছিলেন, “অভাব আছে। তুমি বুঝতে পারছ না। এখানকার সবকিছুই আমার অপরিচিত। কাঁসরঘণ্টার আওয়াজ অন্যরকম। ধুপ, ফুলের গন্ধ আলাদা! এসবের বেড়া ঠেলে আমি আমার দেবতাকে উপলব্ধি করতে পারছি না। তাই যদি না পারি, বন্দনা, প্রার্থনা, সমস্ত কিছুই দিকভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে!”

কথাগুলোর অর্থ সম্পূর্ণ অনুধাবন করতে পারেননি কনকলতা। কিন্তু একটা বিষয় খুব পরিষ্কার করে বুঝেছিলেন, এতদিন তাঁর দায়িত্ব নিয়েছিলেন কর্তা। এবার পালাবদল হবে। কর্তার সঙ্গে যাওয়া শুরু করলেন রাজবাড়ি। দু’ বছরের ছেলেটাকে ওবাড়ির কোনও চাকরের জিম্মায় দিয়ে বসে যেতেন কর্তার পাশে। জোগাড় দিতেন পুজোর। সামান্য হলেও কর্তার আড়ষ্টতা কমল। এই ক’দিন যারা এগিয়ে দিত পূজা উপাচার, সকলেই তাঁর আচেনা। তায় আবার মহিলা। কনকলতা নিয়মিত কর্তার পাশে থেকে-থেকে জেনে নিলেন পুজোর খুঁটিনাটি। বরেন ঘোষালের যেহেতু পূজাপাঠের ব্যাপারে কোনও আগ্রহ ছিল না, তাই কোনও বিধিনিষেধও আরোপ হয়নি কর্তার উপর। এলাকার বর্ধিষ্ণু মানুষজন কর্তাকে বাড়ির নানা পুজোর জন্য নিয়ে যেতেন। সঙ্গে থাকতেন কনকলতা। জমিদারের পুরোহিত বলে দানদক্ষিণা ভালই পাওয়া যেত। আগের মতোই কর্তা সেসব দিকে ঘুরেও দেখতেন না।

ক্রমশ

অলঙ্করণ: নির্মলেন্দু মণ্ডল

সানন্দা শব্দভেদ

সূত্র পা শা পা শি

১ পরশুরাম নামের আড়ালে ইনি। ৩ বিচার-বিবেচনা প্রসূত সিদ্ধান্ত। ৭ রাজপুত নৃপতির খেতাব। ৮ পরিশ্রম বা খাটুনি। ১০ মুখে মুখে রটে যাওয়া কথা। ১১ বিষ্ণু। ১২ গৌরববতী। ১৪ অজয়, দামোদরকে যা বলা হয়। ১৫ বনের অধিষ্ঠাত্রীদেবী। ১৭ রঙিন। ১৯ এটি গলায় ঝুলিয়ে পরতে হয়। ২০ প্রতারক। ২২ বিপদ, দুর্দশা। ২৩ কামনার অধিদেবতা। ২৫ রিক্তহস্ত। ২৬ গ্রহণ করো। ২৭ মনের বা অন্তরের ইচ্ছা। ২৮ স্বদেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে বসবাস।

১		২			■	৩		৪	৫
	■		■	■	৬	■	■	৭	
	■	৮		৯		■	১০		
১১			■	১২		১৩		■	■
	■	■	১৪		■	১৫			১৬
১৭		১৮		■	১৯		■	■	
■	■	২০		২১		■	২২		
২৩	২৪		■	২৫				■	
২৬		■	■		■	■		■	
২৭				■	২৮				

গত সংখ্যার সমাধান

ক	ম	ল	ল	তা	■	দা	রা	শু	কো
দা	ন	ব	■	ন্ত্র	■	নী	■	ধা	ম
চা	■	■	■	সা	ব	য়	ব	■	র
র	বি	বা	স	র	■	■	রা	■	ব
■	ভা	■	রো	■	অ	প্র	তি	ব	ন্ধ
র	সা	স্বা	দ	ন	■	তি	■	ড়	■
হ	■	ধী	■	■	অ	জ্ঞা	ত	বা	স
স্য	■	ন	বী	ভা	ব	■	■	■	ম্মে
ঘ	টা	■	জি	■	ভা	■	ব	দ	ল
ন	বা	গ	ত	■	স	মা	ক	ল	ন

সূত্র উপর নীচ

১ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় প্রদেশের সরকার। ২ সব কিছুর পরে। ৪ সগৌরবে অবস্থান। ৫ মুসলমানদের সম্মানসূচক সম্বোধন। ৬ ‘খাঁচার — অচিন পাখি...।’ ৯ কেনার সময় হাতে হাতে যে মূল্য দিতে হয়। ১০ মন্ত্রতন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি। ১৩ সমরেশ বসুর বিখ্যাত উপন্যাস। ১৪ কোমল। ১৬ বিপদ দূরকারী। ১৮ অগ্রিম প্রদত্ত মূল্য বা মূল্যের অংশ। ১৯ বিচারাধীন আসামিদের জন্য কারাগার। ২১ শোভা বা সৌন্দর্য। ২২ এর সঙ্গে ৪০ চোর নিয়ে আরব্যরজনীর গল্প। ২৩ এই জব্বর ওষুধটি উলটেও লাগানো যায়। ২৪ আগুন।

ত্রিপটি

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

বছর ঘুরতে না-ঘুরতে বরেন ঘোষাল একদিন ডেকে পাঠালেন পুরোহিত এবং তার গিন্নিকে। ভয় মেশানো কৌতূহল নিয়ে কর্তা, কনকলতা হাজির হলেন বৈঠকখানায়। জমিদার বরেন ঘোষাল তাঁদের বসতে বলে বললেন, "ঠাকুরমশাই, যা বুঝছি, দেশভাগ আটকানো যাবে না। এখনই যতটা পারি, নিজের দেশটা ঘুরে দেখে নিই। আগামী মাস পাঁচ-ছয় আমি ভ্রমণে বের হব। রাজবাড়ির দায়িত্ব যথাযোগ্য লোককে দিয়েছি। আপনাকে দুর্গাবাড়ির ভার নিতে হবে।"

কর্তা অবাক হয়ে বললেন, "দুর্গাবাড়ির ভার মানে? সেখানে কেউ থাকেও না, কোনও কাজও নেই।"

"নির্দিষ্ট কোনও কাজ নয়। ও বাড়ির সব ঘরের চাবি আপনার কাছে থাকবে। চারপাশে যুদ্ধের দামামা বাজছে। এই যে জাপানিরা বোমা মেরে গেল। এরকম কোনও ঘটনায় আমার প্রজারা যদি নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে অথবা কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে যায়, ঘরগুলো খুলে দেবেন তাদের জন্য," বলে বরেন ঘোষাল একগোছা চাবি তুলে ধরেছিলেন।

কর্তা ঘাবড়ে উঠেছিলেন, "আমি কি এত সব সামলাতে পারব?"

বরেন ঘোষাল বলেছিলেন, "আপনি যে পারবেন না, জানি। সেই কারণেই আপনার স্ত্রীকেও আসতে বলেছিলাম।"

চাবির গোছা জমিদার তুলে দিলেন কনকলতার হাতে। গ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি পুরোহিত গিন্নি। এরপর বরেন ঘোষাল খানিক উদাসী বিষণ্ণতায় কনকলতার উদ্দেশে বললেন, "এমন হতেই পারে, আমি আর ফিরলাম না। কত বিপদই তো অপেক্ষা করে আছে এই দীর্ঘ ভ্রমণে, তখনও কিন্তু আপনার দায়িত্বেই থাকবে দুর্গাবাড়ি।"

এরকম অশুভ আশঙ্কার কথা শুনে ভিতর-ভিতর চমকে উঠেছিলেন কনকলতা। মুখে বলেছিলেন, "অমঙ্গলে কথা মুখেও আনবেন না। কত মানুষ আপনার মুখ চেয়ে থাকে বলুন তো!"

বরেন ঘোষাল চারদিনের মাথায় বের হলেন দেশ ভ্রমণে। সঙ্গে পাত্র, মিত্র। অন্দরমহলে চাপা কান্নার রোল উঠল। কর্তা জমিদারের কপালে মঙ্গলতিলক এঁকে দিলেন। কনকলতা মনে-মনে বললেন, ঠাকুর, আমার আশ্রয়দাতাকে তুমি আগলে রেখো। পাঁচ মাসের মাথায় সপারিষদ ফিরে এলেন জমিদার বরেন ঘোষাল। চেহারায় দীর্ঘ পথের ক্লান্তি। বললেন, "গোটা দেশ ঘোরা সম্ভব হয়নি। বহু জায়গায় অশান্তির আগুন। এবার সাহেবদের দেশ ছেড়ে পালাতেই হবে!"

এই ক'মাসে কানাইপুরে কোনও বিপর্যয় নেমে আসেনি। জমিদারির কাজ ঠিকমতোই গড়িয়েছে। কনকলতা একটা কাজের কাজ করেছেন, দুর্গাবাড়ির সবক'টা তালা খুলে ঘরগুলো পরিষ্কার করিয়েছেন। কর্তাকে দিয়ে শিব, নারায়ণ প্রতিষ্ঠা করিয়েছেন ঠাকুরঘরে। কর্তা ইতস্তত করছিলেন, "জমিদারের অনুমতি না নিয়ে তুমি এত কিছু করছ, আবার রায়পুরের মতো কিছু না হয়।" বেশ আত্মবিশ্বাসের

অশুভ আশঙ্কার কথা শুনে চমকে উঠেছিলেন কনকলতা। মুখে বলেছি

সঙ্গে কনকলতা বলেছিলেন, "দেখো, উনি কিচ্ছু বলবেন না। এ মানুষ অন্য ধরনের।"

কনকলতার কথাই বেশি করে সত্যি প্রমাণ হল। জমিদারকে যখন চাবির গোছা ফেরত দিতে গেলেন কনকলতা, উনি নিলেন না। বললেন, "শুনেছি, ইতিমধ্যে গোটা দুর্গাবাড়ি ঝাড়পোঁছ করিয়েছেন আপনি। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছেন ঠাকুরঘরে। ও বাড়ির ভার আপনার উপরই থাক। ওখানকার ঠাকুরদালানে প্রজারা পুজো দিতে এলে ফেরাবেন না। গরিব প্রজারা তো রাজবাড়িতে ঢুকতে

ছেলেকে পাঠশালায় দিলেন। কর্তা কিন্তু নিজের ছোট্ট জগৎটা থেকে কিছুতেই বেরলেন না। আসলে তাঁর মন পড়েছিল রায়পুরে। গাছপালা, পাখি নিয়ে আশ্রমিক আবহাওয়া। আধ্যাত্মিক আলোচনা করার সঙ্গী চন্দ্রমোহন এবং ঈশ্বরবিশ্বাসী নিরীহ গ্রামবাসীই তাঁর পছন্দের মানুষজন। তুলনায় কানাইপুর অনেক শহরঘেঁষা। কলকাতা প্রায় নাগালে। রাস্তাঘাটে বাঙালি সাহেব তো ছড়াছড়ি! ইংরেজ সাহেবদেরও হামেশাই দেখা যায়। এঁদের মধ্যে নাকি অনেকেই চান, ভারতবর্ষ স্বাধীন হোক। এঁরা স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষে

লেন, "অমঙ্গলে কথা মুখেও আনবেন না। কত মানুষ আপনার মুখ চেয়ে থাকে বলুন তো!"

ঠিক সাহস পায় না। তাদের পক্ষে শ্রীধর ভট্টাচার্যের মতো পণ্ডিত, নিষ্ঠাবান পুরোহিতের করুণা পাওয়াও কঠিন। এতে প্রজাদের যেমন সুবিধে হবে, ঠাকুরমশাইয়েরও হবে। যত বেশি পুজো পাঠ নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন, রায়পুরকে ভুলতে পারবেন তাড়াতাড়ি।"

বরেন ঘোষালের নজর যে সব কিছুর উপর আছে, সেই প্রথম সঠিকভাবে টের পেলেন কনকলতা। এতে দুর্গাবাড়ি নিয়ে তাঁর উৎসাহ দ্বিগুণ হল। ঠাকুরঘরে নিয়মিত পুজো করাতেন কর্তাকে দিয়ে। যেখানে এখন বিজনের কারখানা। গ্রামের গরিবমানুষগুলো আসত। বাড়তে লাগল ভিড়। চিকিৎসাশাস্ত্রে অল্পবিস্তর দখল ছিল কর্তার। সেই গুণটাও কাজে লাগালেন কনকলতা। বিত্তহীন, অসুস্থ প্রজাদের কর্তার সামনে নিয়ে যেতেন। খুব একটা উৎসাহের সঙ্গে না হলেও কর্তা তাঁদের চিকিৎসা করতেন। একটা টোল বসানোর খুব ইচ্ছে ছিল কনকলতার। সেটা আর সম্ভব হয়নি। কিছুতেই রাজি করানো গেল না কর্তাকে। মানুষটার অর্ধেক সত্তা রয়ে গিয়েছিল রায়পুরেই। যতটুকু যা করতেন, কনকলতার জোরাজুরিতেই। ক্রমশ কনকলতা কানাইপুরের সকলের প্রিয় 'বামুনদিদি' হয়ে উঠলেন। তিনি জানতেন, তাঁর সমস্ত উদ্যোগের পিছনে জমিদারের পরোক্ষ সমর্থন আছে। উনি না দেখার ভান করে, সব কিছুই লক্ষ করছেন। লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে-করতে কনকলতা একসময় ভুলেই গেলেন রায়পুরের অপমান! মনে হত, ওসব গত জন্মের কথা। এভাবেই কনকলতার পৃথিবী বড় হতে থাকল।

জোর সওয়াল করেন। জমিদারদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গড়ে তোলেন স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল। বরেন ঘোষালের বৈঠকখানায় সাদা চামড়ার সাহেবরা এসে আড্ডা জমান। এসব দেখে ধাঁধা লেগে যায় কনকলতার। তেলে-জলে মেশার রহস্য উদ্ধার করতে বসেন। কুল করতে না পেরে কর্তার শরণাপন্ন হন। কর্তার একটাই উত্তর। এসব আর কিছুই না, হিন্দুদের ম্লেচ্ছ করার চক্রান্ত। বরেন ঘোষালের মতো বোকা জমিদাররা এটা বুঝতে পারছে না।

আচমকা কনকলতা জানলেন, দেশ স্বাধীন হচ্ছে! ক'টা দিন খুব হইচই হল। স্বাধীনতার দিন বাজি ফাটল, পতাকা উড়ল। কোলাকুলি, মিষ্টিমুখ। সকলের চেহারাতে কেমন হাসি-হাসি ভাব। বদল বলতে এইটুকুই। আবার যে-কে সেই। স্বাধীনতা ব্যাপারটা ঠিক কী, ধরতে পারলেন না কনকলতা। পাখির ডানায় জোর বাড়ল না। গরিবের ঘরে কেউ চাল পৌঁছে দিল না। গৃহস্থের ঘরে জন্ম হল না কোনও অবতারের। অবশ্য কয়েকমাস অতিক্রান্ত হতেই কনকলতা স্বাধীনতার প্রভাব টের পেলেন। পথে-পথে ঘুরতে লাগল পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মানুষ। তাদের খাওয়া-পরার সংস্থান নেই। কেউ ভিক্ষে করছে। কেউ বা বংশপরিচয় লুকিয়ে আঁকড়ে ধরছে নিচু জাতের কাজ। ব্রাহ্মণগিন্নি বাসন মাজতে ঢুকছে পরের বাড়িতে! জাত, বেজাত মানার অবস্থা তখন আর কারও নেই। সেই সময় পূর্ববঙ্গ থেকে আসা কয়েকজন পুরোহিত কর্তার সঙ্গে দেখা করে বলেন, "আমরা জেনেছি, আপনি খুব নামী পুরোহিত।

সমাজের অনেক উঁচু মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। আমাদের রোজগারের কিছু একটা বন্দোবস্ত করে দিন।"

কর্তা বললেন, "আমিও আপনাদের মতো বাস্তুহারা। রায়পুরে যখন থাকতাম, পালন করতাম পুরোহিতধর্ম। এখানে পূজারির চাকরি করি। জমিদারের একটু ভাল শ্রেণির চাকর। আমার পক্ষে আপনাদের জন্য কিছুই করা সম্ভব নয়।"

কর্তাকে সংশোধনের জন্য সময় না দিয়ে কনকলতা সেই সব ব্রাহ্মণের পাশে দাঁড়ালেন, "আপনাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই আমি দিতে পারি। রোজগারের পথ নিজেদের বের করতে হবে।" এই অনুগ্রহটুকুতেই তাঁরা যেন ধড়ে প্রাণ পেলেন। কনকলতা খুলে দিলেন দুর্গাবাড়ির কয়েকটা ঘর। পরিবার নিয়ে এসে উঠলেন ওই ক'জন। তারপর তাঁরা দ্বিগুণ উৎসাহে বেরিয়ে পড়লেন রোজগারের ধান্দায়। ক'টা দিন ওদের পরিবারকে কনকলতাই খাওয়ালেন, পরালেন। বরেন ঘোষালকে গিয়ে আগ বাড়িয়ে বললেন, "পূর্ববঙ্গ থেকে কিছু দূর সম্পর্কের আত্মীয় এসে উঠেছেন আমাদের কাছে। দুর্গাবাড়ির চারটে ঘর খুলে দিয়েছি। কিছু একটা সংস্থান হলে ওঁরা চলে যাবেন।"

কনকলতার সব পরিকল্পনায় বরেন ঘোষালের প্রশয়মেশানো সমর্থন দেখে, কর্তা মজা করে বলতেন, "এখানকার জমিদারের দেখি, পুরোহিতের চেয়ে তার গিন্নির উপর ভক্তি বেশি।"

"কেন, তোমার হিংসে হচ্ছে বুঝি?" ঠাট্টার সুরেই উত্তর করতেন কনকলতা। মনে-মনে বলতেন, হায়, তুমি কবে মানুষ চিনবে! চন্দ্রমোহনকে ভেবেছিলে খুব বন্ধু!

দুর্গাবাড়িতে আশ্রয় পাওয়া ওপার বাংলার ব্রাহ্মণরা তৎপরতার সঙ্গে রুটিরুজির বন্দোবস্ত করে ফেলল। কে কতটা সম্মানজনক কাজ পেল, দুর্গাবাড়িতে বসে আন্দাজ করতে পারলেন না কনকলতা। তবে মানুষগুলোর চোখেমুখে স্বস্তির ভাব দেখতে পেলেন। দুর্গাবাড়ির আশ্রিতরা কয়েকমাস পর থেকে ভাড়া দিতে থাকলেন ঘরের। নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী টাকা। বললেন, "দিদি, এটা রাখুন। এখন তো হাতে কিছু টাকাপয়সা আসছে। এটুকু দেওয়া আমাদের কর্তব্য।" আসলে আশ্রয়টা পাকা করার জন্যই দিতে এসেছিলেন টাকা। কনকলতা কিছুতেই নেবেন না। বললেন, "এ বাড়ি তো আমার নয়। ভাড়া যদি দিতেই হয়, জমিদারকে দিন।"

জমিদারকে ভাড়া দেওয়ার ধৃষ্টতা দেখাতে কেউ রাজি নন। ওই দু'-চার টাকা জমিদারবাবুর কাছে নিয়ে যাওয়া মানে, তাঁকে অপমান করা। ফল উল্টো হতে পারে, দুর্গাবাড়ি থেকে হয়তো পাততাড়ি গোটাতে হবে। এই বিবেচনা থেকে ওঁরা কনকলতাকে বললেন, "টাকাটা আপনি রাখুন। কেউ জানবে না। মিছিমিছি এসব ছোটখাটো ব্যাপারে জমিদারবাবুকে না জড়ানোই ভাল। আর উনি যখন ভরসা করে এ বাড়ির দায়িত্ব আপনাকে দিয়েছেন, এখানকার ভাল-মন্দর সমস্ত দায় আপনার। শুধু মন্দর দিকটাই সামলাবেন? ভালটা উপভোগ করবেন না!"

ভাড়ার টাকা দেওয়া নেওয়া হত এত গোপনে যে, জমিদার তো দূরস্থান, কর্তা পর্যন্ত টের পেতেন না! এভাবে কয়েকটা বছর ঘুরতে না-ঘুরতে জানা গেল, দেশের সরকার জমিদারি ব্যাপারটা রাখছে না। প্রজাদের দেখাশোনা, খাজনা নেওয়া, সব তারাই করবে। তা হলে কি যত জমিদার ছিল, সব সাধারণ লোক হয়ে যাবে? এমনকী, চন্দ্রমোহন চৌধুরীও! সরকার সমস্ত সম্পত্তি কেড়ে নেবে তাঁদের? ব্যাপারটা ঠিকঠাক বোঝার আগেই বরেন ঘোষাল কানাইপুরের জমিদার রাজবাড়িটা হাসপাতালের জন্য দান করে এবং জমিজমা বিক্রি করে চলে গেলেন কলকাতায়। দুর্গাবাড়ির কোনও বন্দোবস্ত করে গেলেন না। বাড়িটা তাঁর নামেই রইল। দেখাশোনার ভার কনকলতার উপর। কোনও লিখিত নির্দেশ অবশ্য ছিল না। তাতে কিছু যায় আসেনি কনকলতার। বরং মালকিন ভাবটা আরও বেশি করে প্রকাশ হতে লাগল তাঁর আচরণে। এই প্রত্যয় থেকে কনকলতা দুর্গাবাড়ির আরও বেশ কিছু ঘর খুলে ভাড়া দিয়ে দিলেন। সারাদিন বাড়িতে বসে থাকার দরুণ কর্তাও এবার টের পেতে থাকলেন, ঘর খুলে দিয়ে ভাড়া নেওয়া হচ্ছে। ভীষণ রাগ করলেন। কিন্তু সেই রাগে আগের তেজ নেই, "এটা তুমি ঠিক করছ না কনকলতা। জমিদারের সঙ্গে বেইমানি করা হচ্ছে।"

"কিসের বেইমানি শুনি? বরেন ঘোষালের অনেক আছে। তিন পুরুষ খেয়ে শেষ করতে পারবে না। তা ছাড়া বাড়িটা তো আমি নিজের নামে লিখিয়ে নিচ্ছি না, সামান্য ক'টা ভাড়ার টাকা পাচ্ছি। এই টাকাটা ছাড়া আমাদের চলবেই বা কী করে? জমিদারবাড়ির পুজো বন্ধ। প্রণামীও নেই। জমিদার আমাদের কথা ভেবে মাসান্তে কিছু টাকাও তো পাঠাতে পারতেন। এ বাড়ির নিত্য পুজোটা তো আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। তা যখন করেননি, নিজেদের সুবিধেমতো একটা ব্যবস্থা তো করে নিতেই হবে।"

কনকলতার কথার তোড়ে কর্তা মিইয়ে গেলেন। পাল্টা যুক্তি দেওয়ার উৎসাহ অনেকদিনই হারিয়েছেন। কনকলতা তাঁকে যেমনভাবে চালাতেন, সেভাবেই চলা শ্রেয় মনে করতেন। একবারই শুধু কনকলতার কোনও কথা তিনি শুনতে চাননি, ছেলে যখন বিয়ে করল নিচু জাতের মেয়েকে। রায়পুরের অপমান ফিরে এসেছিল মনে। দ্বিতীয়বার পরাজিত হতে কঠোরভাবে নারাজ ছিলেন। জোর খাটিয়ে, কাতর অনুনয়-বিনয় করেও কনকলতা নন্দর বউকে ঘরে তুলতে পারেনি। কর্তা তখন শেষ অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছেন। হুমকি দিয়েছেন, ওই বউ ঘরে এলে স্বেচ্ছা মৃত্যুবরণ করবেন! এরপর আর কোনও কথা হয় না। কোনও মূল্যেই কনকলতা তাঁর স্বামীকে হারাতে রাজি নন। কর্তা ছাড়া কনকলতা, মাটি হারানো গাছের মতো। ছেলেকে ছাড়তে হল...

তারপর বিহারি দারোয়ানের আগমন, তাকে তাড়ানোর ব্যবস্থা করা এবং সবকিছুর ফলস্বরূপ বাড়ির এক ভাগের মালিকানা কনকলতার কাছে চলে আসা। বরেন ঘোষালের উইলের একটা কপি উকিলবাবু দিয়ে গিয়েছিলেন কনকলতাকে। ক'টা দিন ঘোরের মধ্যে কাটল। আনন্দের খবরে সত্যনারায়ণের সিন্নি চড়ালেন কনকলতা। দুর্গাবাড়ির দালান ভরে গেল আশপাশের চার-পাঁচটা পাড়ার লোকে। সকলেই জানল, এখন থেকে খাতায়-কলমে দুর্গাবাড়ি কনকলতার। উইলের বয়ান তো আর কেউ খতিয়ে দেখতে যায়নি। জানতে পারেনি, বাড়িটা আসলে চারজনের নামে!

দিন গেল। বছর গেল। কানাইপুরের পাঁচ মাইল দূর দিয়ে বয়ে

কনকলতা বরেন ঘোষালকে গিয়ে বললেন, পূর্ববঙ্গ থেকে কিছু দূর সম্পর্কের আত্মীয় এসে উঠে

যাওয়া গঙ্গার জল হল ময়লা। কত লোক বাড়ল শহরে। দুর্গাবাড়ির সব ঘরেই ভাড়াটে বসালেন কনকলতা। দেখতে-দেখতে চোখের সামনে থেকে ভাল মানুষগুলো উধাও হয়ে গেল। কানাইপুরের সবচেয়ে ওঁচা আর গরিবগুর্বোরা ঠাঁই নিল দুর্গাবাড়িতে। দেওয়ালে ফাটল ধরল, তাল রেখে কনকলতার শরীরে পড়তে থাকল ভাঁজ।

ঠাকুরদালানের ওপ্রান্তে গোটা বিশজনের একটা দল, এপ্রান্তে মাত্র একজন। একটা শুকনো, পাকানো চেহারার ছেলে, বামুনবাড়ি একে আগে কোনওদিন দেখেনি। ছেলেটার পরনে রংচঙে জামা। খুব হাত-পা ছুঁড়ছে, চেঁচাচ্ছে প্রতিপক্ষ দলের উদ্দেশে। ওই দলটার সামনে আছে বুলা। কোলে বাচ্চা। ছেলেটাকে লক্ষ করে বুলাও

ছেন আমাদের কাছে। দুর্গাবাড়ির চারটে ঘর খুলে দিয়েছি। কিছু একটা সংস্থান হলে ওঁরা চলে যাবেন।

অশক্ত শরীরে ভাড়া আদায় ঠিক মতো হয় না। অনেকের আবার দেওয়ার ক্ষমতা নেই। ছেলে নিজের মতো দাঁড়িয়ে নিচু জাতের মেয়েকে বিয়ে করে পৃথক হল। দুর্গাবাড়ির ভাঙা দরজা, জানলার ফাঁক দিয়ে কর্তা পেলেন মহাপ্রস্থানের হাতছানি। হঠাৎ চলে গেলেন একদিন। একেবারে না বলে। কনকলতা কোথাও যায়নি, যেতে চাননি। নিজের নামে লেখা জায়গাটুকুর প্রতি তাঁর বড্ড মায়া...

গালটা ভিজে-ভিজে লাগছে। পাশ ফিরে শুয়ে থাকা বামুনবুড়ি চিত হয়। এতসব ভাবতে-ভাবতে কখন যে চোখে জল এসে গিয়েছে, হুঁশ নেই। বালিশটা মিছিমিছি ভিজল। দুপুরবেলা ভাত খেয়ে রোজই একটু গড়ায় বামুনবুড়ি। আজ শোওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে চলে গিয়েছিল অতীতে। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ঘুরে এল এতগুলো বছর। ছবির মতো চোখের সামনে ভাসছিল সব। আরও খানিকক্ষণ থাকাই যেত বর্তমান থেকে পালিয়ে। চোখের জল, নাকি বাইরের চিৎকার চেঁচামেচিতে ঘোর কাটল বামুনবুড়ির, ঠিক বুঝতে পারে না।

উঠোনে জোর ঝগড়া চলছে। নতুন কিছু নয়, এ তো লেগেই আছে দুর্গাবাড়িতে। কোন দুটো ঘরের মধ্যে কাজিয়াটা লেগেছে, ঠিক ধরা যাচ্ছে না। একটা গলা একদম অচেনা। শুয়ে-শুয়ে জানলার দিকে তাকায় বুড়ি, রোদ মরে এসেছে। আর গড়ানো ঠিক হবে না। সন্ধের দিকে শরীরের জোড়ে-জোড়ে ব্যথা হবে। তার চেয়ে বরং কার সঙ্গে কার লাগল দেখা যাক। বিছানা থেকে ধীরে-ধীরে নেমে আসে বামুনবাড়ি। কুঁজো শরীরটা নিয়ে ঘরের চৌকাঠে এসে দাঁড়ায়। আজকের ঝামেলার দৃশ্যটা গোলমেলে টাইপের। গাল পাড়ছে দেদার...এত অবধি দৃশ্যটায় কোনও গোলমাল নেই। একটা ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে না, বুলার দিকে যারা দাঁড়িয়ে আছে, তারা বুলার হয়ে কথা না বলে, ওকে ঠেলে দিচ্ছে প্যাঁকাটি মস্তানটার দিকে! সকলেই একসঙ্গে চেঁচানোর দরুন ঝগড়াটা কী নিয়ে, সেটাই বোঝা যাচ্ছে না।

"কী রে, কী হয়েছেটা কী?" পরিচিত দাপুটে গলা তুলে দালানে নেমে এল বামুনবুড়ি।

সকলেই একটু থতমত খায়। সেই ফাঁকে বুলা কোলে ছেলেসুদ্ধু উঠোনে নেমে শর্টকাটে বামুনবাড়ির ঘরের সামনে এসে উঠল। বামুনবুড়িকে জড়িয়ে ধরে বলল, "দিদা আমাকে বাঁচাও। ওরা আমাকে বেচে দিচ্ছে!"

কথাটা প্রথমেই মাথায় ঢুকল না বুড়ির। এই মুহূর্তে তার খুব আনন্দ হচ্ছে। অনেকদিন পর দুর্গাবাড়ির একজন শেষ আশ্রয় হিসেবে ভাবছে তাকে! বুলা মেয়েটা ভাল। একবার বিয়ে করে ঠকেছে। কিন্তু ভুলের মাশুল বাচ্চাটাকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসেনি। সিঁদুর মুছে ফিরে এসেছে বাবা-মায়ের সংসারে, দুর্গাবাড়ি বলেই সম্ভব হয়েছে । অন্য কোথাও হলে গঞ্জনার চোটে টিকতে পারত না বুলা। যে করেই হোক, বাঁচাতে হবে।

বামুনবুড়ি বলল, "বেচে দিচ্ছে মানে! চালাকি পেয়েছে? দুর্গাবাড়ি কি মেয়ে বেচার হাট নাকি?"

হঠাৎই উল্টো দিকের দালান থেকে বুলার বাবা সনৎ তেড়েফুঁড়ে এগিয়ে এল। সামনে এসেই মেয়ের চুলের মুঠি ধরে হ্যাঁচকা টান। বামুনবুড়ির বুক থেকে দূরে সরে গেল বুলা। ওর কোলের বাচ্চাটা পরিত্রাহি কাঁদছে। তার উপরে গলা তুলে সনৎ বলল, "খালি

উল্টোপাল্টা কথা। কে তোকে বেচবে বলছে? জামাই নিতে এসেছে, কত বড় ভাগ্যের কথা! তা না, বাপের অন্ন ধ্বংস করা জন্য বসে থাকবে এখানে।"

এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হল বামুনবুড়ির কাছে। প্যাঁকাটি মার্কাটা তার মানে বুলার স্বামী। এতদিন পর বউকে খেয়াল পড়ার কারণটা কী? সনৎ এখন মেয়ের চুলের মুঠি ছাড়েনি, আজেবাজে বকেই যাচ্ছে। গরিব সংসারে দেড়খানা পেটের দায় নামতে পারে ঘাড় থেকে, এই সুযোগ কেউ হাতছাড়া করে?

"অ্যাই সনৎ, সোমত্ত মেয়ের গায়ে হাত তুলছিস, আমি কিন্তু থানায় যাব," হুঁশিয়ারি দেয় বামুনবুড়ি।

বামুনবুড়ি বলল, "বেচে দিচ্ছে মানে! চালাকি পেয়েছে? দুর্গাবাড়ি কি মেয়ে বেচার হাট নাকি?"

সনৎ গ্রাহ্য করল না, "আমি আমার মেয়েকে মারছি, পুলিশ কী করবে শুনি?"

"অন্ততপক্ষে তিন বছরের জেল। আইন এখন সব পাল্টে গিয়েছে," ঠান্ডা গলায় বলল বামুনবুড়ি।

সনৎ বুলার চুল ছেড়ে দিয়েছে। বামুনবুড়িকে বিশ্বাস নেই। সত্যিই হয়তো থানার দিকে হাঁটা দেবে! থানা-পুলিশ এর আগেও অনেকবার করেছে বুড়ি। থানার লোক তাকে ভাল মতোই চেনে। চটি-ফটফটিয়ে বামুনবুড়ি এগিয়ে যাচ্ছিল দালান ধরে, পথ আগলাল সনৎ, "ঠান্ডা মাথায় তুমি একটা বিহিত কর দিদা। এখন মাথা গরম করার সময় নয়।" সনতের পাশে ওর বউ এসে দাঁড়িয়েছে। সে-ও বলল, "জামাই এতদিনে তার ভুল বুঝতে পেরেছে। তাই নিতে এসেছে বউ-ছেলেকে। এর চেয়ে আর ভাল কথা কী হতে পারে? কিন্তু বুলা কিছুতেই যেতে রাজি নয়। তুমি ওকে একটু বোঝাও। কোলের ছেলেসুদ্ধু ওকে কে বিয়ে করবে? ওর ভবিষ্যৎ তো অন্ধকার।"

একটু দূরে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে যাচ্ছে বুলা। বাকি দুর্গাবাড়ির সব লোক এখন দর্শক। বামুনবুড়ি দেখে নিল ভিড়ের একদম পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে বিজন। ওর পাশে একটা ছাগলদাড়ি ছেলেকে দেখা যাচ্ছে। সকলের চোখেই বিষম কৌতূহল, বামুনবুড়ি কীভাবে ঝামেলাটা সামলায়, সেটাই দেখতে চাইছে। বিজনের উপস্থিতির কারণে বামুনবুড়ি বাড়তি উৎসাহ বোধ করল। এই সুযোগে ওকে দেখিয়ে দেওয়া যাবে, কীভাবে এতদিন দুর্গাবাড়ির সমস্ত ঝড়ঝাপটা সে সামলে এসেছে। খানিক তফাতে দাঁড়িয়ে বুলা এখনও কেঁদে যাচ্ছে। বামুনবুড়ি ওর পাশে গেল। কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করল, "ওই ছেলেটা কি সত্যিই তোর ছেলের বাপ?"

ক্রমশ

অলঙ্করণ: নির্মলেন্দু মণ্ডল

সানন্দা শব্দভেদ

সূত্র পা শা পা শি

১ ময়লা বা ঘোলা নয় এমন। ৪ সর্বজনের জন্য অনুষ্ঠিত। ৭ রায়ের ছেলে বা রাজকুমার। ৮ মুসলমানদের ঈশ্বর-উপাসনা। ১০ জাঁকালো, চমৎকার। ১১ ছলনা। ১৩ বলা হয় অসি-র চেয়ে এর জোর বেশি। ১৪ শারীরিক শক্তি। ১৬ আরব্য উপন্যাসে বর্ণিত কাল্পনিক পাখি। ১৭ আওয়াজ, ধ্বনি। ১৮ রান্নার মশলা। ২০ কর্কশ বা কঠোর। ২১ মূল কারণ। ২৩ গুরুর গৃহ বা আশ্রম। ২৫ খুব তাড়াতাড়ি। ২৬ পাপাত্মা, অতি দুর্বৃত্ত লোক।

১		২	৩	■	৪		৫		৬
	■	৭				■		■	
৮	৯		■	■		■	১০		
■		■	১১			১২		■	■
১৩		■		■	■		■	১৪	১৫
১৬		■		■	■		■	১৭	
■	■	১৮		১৯			■		■
২০			■		■	■	২১		২২
	■		■	২৩		২৪		■	
২৫					■	২৬			

গত সংখ্যার সমাধান

রা	জ	শে	খ	র	■	ত	জ	বি	জ
জ্য	■	ষ	■	■	ভি	■	■	রা	না
স	■	মে	হ	ন	ত	■	গু	জ	ব
র	মে	শ	■	গ	র	বি	নি	■	■
কা	■	■	ন	দ	■	ব	ন	বি	বি
র	ং	দা	র	■	হা	র	■	■	প
■	■	দ	ম	বা	জ	■	আ	প	দ
ম	দ	ন	■	হা	ত	খা	লি	■	ভ
ল	হ	■	■	র	■	■	বা	■	ঞ্জ
ম	ন	স্কা	ম	■	অ	ভি	বা	স	ন

সূত্র শব্দভেদ

১ ভোজন, খাওয়া। ২ সগৌরবে অবস্থান। ৩ বিলীন হওয়া। ৪ বৈচিত্রহীন ও সাধারণ। ৫ অতিশয় ক্লিষ্ট। ৬ বিনাশ আছে এমন। ৯ মনোগত বা কল্পনাপ্রসূত। ১১ জঘন্য বা বিশ্রী আচরণ।১২ মিথ্যা বড়াইকারী। ১৩ মরণশীল। ১৪ অভীষ্ট পূর্ণকারী। ১৫ বিভাজ্য অঙ্ক। ১৮ কৃষিকাজ। ১৯ তন্ময়, বিভোর। ২০ ধন, টাকাকড়ি। ২১ বাসস্থান। ২২ পুত্র, ইন্দ্রের উপবন। ২৪ তীক্ষ্ণাগ্র তৃণবিশেষ।

ত্রিপটি

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

কান্না ঢোঁক গিলে ঘাড় হেলাল বুলা।

"তা হলে তুই ওর সঙ্গে যাচ্ছিস না কেন? নিতে এসেছে যখন।"

কান্নার দমক চেপে বুলা বলতে থাকল, "ওর নিশ্চয়ই এখন টাকার দরকার পড়েছে। আমাকে ও বাড়ি নিয়ে গিয়ে ঘরে অন্য লোক ঢোকাবে। আগেও চেষ্টা করেছিল, সেই জন্যই তো পালিয়ে এসেছি।"

বামুনবুড়ি চোখ তুলে বুলার গুণধর স্বামীটিকে খুঁজল। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। নতুন জামা পরা লিকলিকে ছেলেটা এগিয়ে এসে সোজা বামুনবুড়ির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে কাঁচুমাচু মুখে বলল, "ঠাকুরমা, ও যা বলছে, একেবারে সত্যি কথা। বদ সঙ্গে পড়ে মদ, জুয়া ধরেছিলাম। নেশার ঘোরে ওর ঘরে লোকও ঢুকিয়েছি। কিন্তু সে মাত্র একবার। ও পালিয়ে এসেছে। আমিও আর লজ্জায় বুলাকে নিয়ে আসতে পারিনি। তবে এখন আমি পুরো পাল্টে গিয়েছি। ঘা খেয়ে শিখেছি, এভাবে জীবন কাটালে ফৌত হয়ে যাব।"

"তা তুমি এখন কর কী? মানে, রোজগারপাতি..." বুলার বরের কথার মাঝে জানতে চাইল বামুনবুড়ি।

"গ্রিলের কারখানায় ওয়েল্ডিং করি। আগেও করতাম। স্বভাব খারাপ হয়ে যেতে তাড়িয়ে দিয়েছিল। শুধরে গিয়েছি দেখে ডেকে নিয়েছে," একটু দম নিল বুলার বর, "আমি এখন শান্তির জীবন চাই। বউ-ছেলে নিয়ে ঘর করব। মায়ের শরীরটাও ভেঙে গিয়েছে। কোনও রকমে রান্নাবান্না করে। বাকি সময়টা বিছানায় কাটায়। মায়ের বড় ইচ্ছে জীবনের শেষ ক'টা দিন যেন ছেলের বউয়ের সেবা পায়।"

বুলার বরটা কইয়ে-বইয়ে আছে। গলার স্বর বলার ধরন বেশ নাটুকে। দালানের ভিড়টা এতটুকু কমেনি, বরং বেড়েছে। সবাই মন দিয়ে শুনছে বুলার স্বামীর কথা। বুলার কোলেরটার কান্না থেমেছে। চিনতে পারল কি বাবার গলা? বোধ হয় না। জন্মের দু' মাস পরেই চলে এসেছে দুর্গাবাড়িতে।

বামুনবুড়ি বুলার কাছে গেল, "আর একবার ভেবে দেখবি? যাবি নাকি শ্বশুরবাড়ি? বলছে তো নিজেকে পাল্টে ফেলেছে।"

"আমি ওকে বিশ্বাস করি না। নেশা করলেই জানোয়ার হয়ে যায়!" স্পষ্টভাবে নিজের মতামত জানাল বুলা।

বামুনবুড়ি এবার বুলার বরের দিকে তাকাল, "দেখলে তো, বলছে, তোমাকে বিশ্বাস নেই। কী করে তোমার হাতে ওকে ছাড়ি বলো?"

"আমি কী করলে ওর বিশ্বাস হবে বলুক?"

বুলার বরের প্রশ্নের উত্তরে বামুনবুড়ি বলল, "ও বলবে না। আমি বলছি। তুমি এখন বাড়ি যাও। আমাদের এখানকার কেউ গিয়ে তোমার বাড়ির, চাকরির সমস্ত খবর নিয়ে আসবে। সব শুনে যদি মনে হয় বুলাকে পাঠানো যাবে, তবেই পাঠাব।"

"ফাইনাল ডিসিশনটা কবে হবে তা হলে?" জানতে চাইল বুলার বর। খোঁজখবর নেওয়া হবে জেনেও একটুও ঘাবড়াল না।

বামুনবুড়ি বলল, "ঠিক এক সপ্তাহ পর। এই দিনেই।

ক্যারিশমাই নয়, রসবোধও আছে তোর ঠাকুমার, ছেলেটাকে বলল, বউ

তোমার রিপোর্ট যদি সব ভাল আসে, তা সত্ত্বেও ঠাকুরদালানে দাঁড়িয়ে কান ধরে এক হাজার ওঠবোস করতে হবে। বুলাকে এতদিন নিতে না আসার শাস্তি। এই শর্তে রাজি থাকলেই নিতে এসো বউ-ছেলেকে, নয়তো নিজের রাস্তা দেখো।"

কথাটা খুব মন দিয়ে শুনে ঘাড় কাত করল বুলার বর। তারপর এপাশ-ওপাশ না তাকিয়ে সাইকেলটা হেলান দিয়ে রাখল বিজন। চটি ছেড়ে সে আর কুনাল ঢুকল ভিতরে। দু' বছর পর কুনাল এল বিজনের কাজের জায়গায়। কিছুই পাল্টায়নি ভিতরের ছবি। সেই পুরনো লোক দুটোই কাজ করছে। র‍্যাকের উপর র‍্যাক চাপিয়ে শুকোতে দেওয়া আছে সদ্য ছাপা কাগজ। বিজন কম্পিউটারটাও পাল্টায়নি, সাদা রং ধূসর হয়েছে। বিজনের ফোকলা মুখের

ফেরত নিতে এলে এক হাজার বার ওঠ-বোস করতে হবে।

এগিয়ে গেল সদরের দিকে। দালানের সবক'টা লোকই তাকিয়ে রইল ছেলেটার চলে যাওয়ার পথে। কেউই নিশ্চিত হতে পারল না, বুলার বর আদৌ ফিরবে কি না। বামুনবুড়ি ঠিকই লক্ষ করেছিল, ঝগড়ার শেষ পর্বে ভিড়ের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল বিজন, কুনাল। বিজনের ওয়র্কশপে কুনাল আগেও এসেছে, তখন হয়তো ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ছিল না। সেই কারণেই বামুনবুড়ি তাকে চিনতে পারল না। যেদিন থেকে বিজন এখানে অফিস দিয়েছে, কারা সেখানে যাতায়াত করে, যতটা সম্ভব নজর রাখে বামুনবুড়ি। সে নিজে তো বিশেষ কোথাও যায় না। কাজটা তার স্বেচ্ছায় নেওয়া। এই বিনে পয়সার পাহারাদারের কথা বিজনও ভাল মতো জানে না।

কুনালের বামুনবুড়িকে চেনার কথা নয়, বিজন কখনও আলাপ করিয়ে দেয়নি। পারিজাতের দেওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে, ঠাকুরদালানের ঝগড়ার শেষ পর্ব দেখে, কুনালের এখন আর বুঝতে অসুবিধে হয়নি, কনকলতা ভট্টাচার্যটি কে? ইনিই হচ্ছেন এই বাড়ি বিক্রি হতে না পারার আসল গাঁট! ওয়র্কশপের বাইরের থামে কর্মচারী একটা টুল নিয়ে এসে রাখে কুনালের পাশে। লোকটা চোখ কুঁচকে দেখে যাচ্ছে কুনালকে, ফ্রেঞ্চ কাটের জন্যই চিনতে পারছে না। কুনাল লোকটার দিকে তাকিয়ে হাসে। বিনা দাঁতের মনোরম একটা হাসি ফেরত দেয় বিজনের স্টাফ। এখনও অবশ্য চিনতে পারেনি, মুখ দেখেই সেটা বোঝা যাচ্ছে।

কুনাল টুলে না বসে বিজনের রিভলভিং চেয়ারে বসে। একটু গলা তুলে বলে, "উনিই তা হলে তোর ঠাকুরমা? তুই ওঁর নাতি, একদম বোঝা যায় না কিন্তু। কত বয়স হবে ওঁর?"

"আশি-পঁচাশি হবে।"

"এখনও চামড়ার কী রং! কী অ্যারিস্টোক্র্যাসি। দেখতেও নিশ্চয়ই খুব সুন্দর ছিলেন।"

"হবে না কেন, খাঁটি ব্রাহ্মণী যে! আমি তো মায়ের দিক থেকে ডাউন। মা লোয়ার কাস্ট। তাই আমার চেহারায় ওই জৌলুস নেই।"

"অশিক্ষিতের মতো কথা বলিস না। কালো-কুলো প্যাংলা ব্রাহ্মণ তোর ক'টা চাই, এবাড়ির সামনে লম্বা লাইন করিয়ে দিতে পারি আমি। যার শেষটা তুই দেখতে পাবি না! তোর ঠাকুরমা তো দেখছি অনেক বেশি সংস্কার মুক্ত। তোকে

এখানে ব্যবসার জায়গা দিয়েছে, এই বাড়ি বিক্রির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে দিয়েছে তোকে...”

কুনালকে বাধা দিয়ে বিজন বিস্মিত গলায় বলে উঠল, “দাঁড়া, দাঁড়া। তুই এত কথা জানলি কী করে?”

জানাটা যেন কিছুই নয় এভাবে কুনাল বলল, “দুর্গাবাড়িটা প্রোমোটিং করতে চাইছে যে ছেলেটা, পারিজাত, ওর দাদা দেবরাজ আমার বন্ধু। সেই সূত্রে ওদের বাড়ি মাঝে-মাঝে যাই। পারিজাত কথায়-কথায় একদিন বলল, কানাইপুরের দুর্গাবাড়ি কিনছে। আমি তোর কথা বললাম। ও তখন তোর ঠাকুরমার ব্যাপারটা বলল। আমি তো অবাক, তুই আমাকে এসব কিছু বলিসনি।”

বিজন মন দিয়ে কথাগুলো শুনল। তারপর বলল, “খুব তাড়াতাড়িই তোদের সঙ্গে এসব নিয়ে আলোচনা করতাম। এমন একটা দায়িত্ব ঠাকুরমা আমার ঘাড়ে চাপিয়েছে, আমি মোটেই এর যোগ্য নই।”

“এটা অবশ্য তুই ঠিকই বলেছিস। এই ধরনের বিগ ডিল অ্যাজ় ওয়েল অ্যাজ় এরকম ক্রিটিকাল সিচুয়েশন সামলানো তোর কম্মো নয়। বরং তোর ঠাকুরমা কেসটা ইজ়িলি হ্যান্ডল করতে পারবে। আজ এখানে ঢুকেই তো দেখলাম তাঁর করিশমা। ঝামেলাটা কী সুন্দরভাবে মেটাল। রসবোধও আছে মাইরি, ছেলেটাকে বলল, বউ ফেরত নিতে এলে এক হাজার বার ওঠ-বোস করতে হবে। সেই ভয়েই ছেলেটা পালাল নাকি কে জানে!”

হাসি থামিয়ে বিজন বলল, “ওসব এখন ছাড়। তুই কী বলতে এসেছিস, বলে ফ্যাল।”

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল কুনাল, “চল, অমিতেশের বাড়ি যাই। তিনজনে একসঙ্গে হয়ে বলব।”

অমিতেশদের বাড়ির পাঁচিল ঘেঁষে গাড়ি রাখল কুনাল। রেলের বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি অমিতেশদের। মূল বাড়িতে ঢোকার আগে ফিট কুড়ির মোরামের রাস্তা। বাড়িতে দুটো ঘণ্টি। একটা গেটের, অন্যটা বাড়ির দরজার। গেটের বেলটা বাজাতে হয়নি। দরজার বেলটা টিপতে ম্যান্ডোলিনের আওয়াজ হল ভিতরে। দরজা খুলল অমিতেশের বোন। দাদার দুই বন্ধুকে দেখে খুব অবাক হয়েছে। স্বাভাবিক উৎফুল্লতা এসে উজ্জ্বল করল ওর মুখ, “আরে, কী ব্যাপার। দু’জন একেবারে একসঙ্গে? কুনালদা তো প্রায় এক যুগ পর!”

হাসি-হাসি মুখ করল কুনাল, বিজন ঘরের সোফায় এসে বসল। খুকুর সামনে বিজন যতটা ফ্রি, কুনাল ততটা নয়। এর পিছনে অনেকদিন আগের একটা ঘটনার সম্পর্ক আছে। খুকু কিন্তু কুনালের সামনে অনেক সাবলীল! মনেই হয় না ঘটেছিল কিছু।

ক্রমশ

অলঙ্করণ: নির্মলেন্দু মণ্ডল

সানন্দা শব্দভেদ

সূত্র পা শা পা শি

১ পৃথিবীর সমস্ত মানুষ। ৪ বৈষ্ণবদের ললাটে অঙ্কিত পুষ্পকলির মতো তিলক। ৬ ঝোলাগুড় বা চিটেগুড়। ৮ সূর্য। ১০ দোষ বা ত্রুটি। ১১ কয়েকটি পরগনার সমষ্টি। ১২ মনের ক্রিয়া। ১৩ গুটিপোকার সুতো থেকে প্রস্তুত মোটা কাপড়। ১৫ গ্রাস আবার অধিকারও বোঝায়। ১৭ নাস্তিক মুনিবিশেষ। ১৮ মুখমণ্ডল। ১৯ মধুর ধ্বনি। ২০ ভাগ্য, অদৃষ্ট।
২১ খুব তাড়াতাড়ি।

১	২		৩			৪			৫
			৬		৭				
	৮	৯					১০		
১১					১২				
		১৩		১৪			১৫	১৬	
১৭						১৮			
			১৯						
২০					২১				

গত সংখ্যার সমাধান

অ	না	বি	ল		সা	র্ব	জ	নী	ন
শ		রা	য়	জা	দা		র		শ্ব
ন	মা	জ			মা		জ	ব	র
	ন		ক	প	টা	চা	র		
ম	সি		দা			ল		ব	ল
র	ক		চা			বা		র	ব
		চা	র	ম	গ	জ		প্র	
প	রু	ষ		শ			নি	দা	ন
য়		বা		গু	রু	কু	ল		ন্দ
সা	ত	স	কা	ল		শ	য়	তা	ন

সূত্র উপর নীচ

২ রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের কাব্যগ্রন্থ। ৩ জন্মলাভ করছে এমন। ৪ মজা, কৌতুক। ৫ একভাষার লিপি বা লেখ্যরূপকে অন্য ভাষার লিপিতে বা অন্য লিপিতে লিখন। ৭ মালখানা, বিক্রয় দ্রব্যের ভাণ্ডার। ৯ পালিয়েছে এমন। ১০ তীব্র যন্ত্রণা বা তীব্র ঠান্ডার অনুভূতি। ১৪ ভিতরে রস আছে এমন। ১৬ বেলফুল। ১৭ নিজের সম্বন্ধে মিথ্যে বড়াই করে বেড়ায় এমন ব্যক্তি। ১৮ পুলকিত, হৃষ্ট। ১৯ ভালো জিনিসের সবাই যা বোঝে।

ত্রিপটি

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

বউ না চুম্বক, বোঝা মুশকিল! ডলির সঙ্গে স্টেশনে আসতেই, আশপাশের

"দাদা এলেই তোমাদের আগমন শুরু হয়! এমনি আসতে পার না কুনালদা? এখানকার বাড়িতে তো আস মাঝেমধ্যে। তখন খানিকক্ষণের জন্য দেখা দিয়ে গেলে কী হয়?"

বিজন জানতে চাইল, "অমিতেশটা কোথায়, ডাক?"

অর্থপূর্ণ হেসে খুকু বলল, "দাদা এখন খুব বিজি! তোমরা যাও না দাদার ঘরে। আমি ততক্ষণ চা বানাই।"

অমিতেশের ঘর তারা চেনে। স্কুলবেলা থেকে আসছে। বারান্দা ধরে এগিয়ে ঘরের সামনে দাঁড়ায়। দরজা বন্ধ। কী করছে অমিতেশ ভিতরে? বিজন ডাকে প্রথমে, "অমিতেশ!"

কোনও সাড়া নেই। এবার কুনাল ডাকে, "অমিতেশ, আমরা।"

গলা তোলে কুনাল, "অ্যাই, অমিতেশ দরজা খোল!" দরজায় অল্প ধাক্কাও দেয়।

ছিটকিনি খোলার শব্দ। খুলে যায় দরজা। অমিতেশের চেহারা দেখে ঝটকা খায় দু'জনে! পরনে ঢলঢলে খয়েরি পাজামা আর ফতুয়া টাইপের সাদা গেঞ্জি। চুল উসকোখুসকো। চোখে ঘুম পালানো দৃষ্টি। পেটের কাছে গেঞ্জির একটাই বিশাল পকেট, ক্যাঙারুর বাচ্চার মতো বেশ ক'টা ব্রাশ, তুলি উঁকি মারছে সেখানে।

"কী হয়েছে রে তোর?" গভীর উদ্বেগের সঙ্গে প্রশ্নটা করে ঘরে ঢুকে পড়ল বিজন। কুনালও ঢোকে, তামাকের গন্ধ গোটা ঘর জুড়ে। গাঁজার গন্ধও যেন মিশে আছে মনে হচ্ছে। এতদিন পর কানাইপুর এসে কোথা থেকে জোগাড় করল পুরিয়া? আগের বার এসে খোঁজ করেছিল কুনাল, পায়নি...এসব ভাবতে-ভাবতে ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে অমিতেশের উদভ্রান্ত চেহারার রহস্য অনেকটাই উদ্ধার করে ফেলল কুনাল। ঘর ভর্তি অসম্পূর্ণ ছবি, মেঝেতে, বিছানায় উড়ছে কাগজ। কোথাও স্কেচ, কোথাও রং, কোনওটাই শেষ হয়নি। ইজেলে যে ক্যানভাসটা টাঙানো, অসমাপ্ত পেন্টিংয়ের উপর লাল রং দিয়ে ঢ্যারা মারা। সব কিছুর মাঝে ঝড়ে আছড়ে পড়া পাখির মতো দাঁড়িয়ে আছে অমিতেশ!

বিজনের বিস্ময়বোধের মাত্রা বেশি, আক্ষরিক অর্থেই সে 'হাঁ' হয়ে গিয়েছে! ভয় পাওয়া চোখ তুলে অমিতেশকে জিজ্ঞেস করল, "ক'রাত ঘুমোসনি?"

বড় করে শ্বাস টেনে অমিতেশ বলল, "গুনিনি!" তারপর শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বিছানায় বসে পড়ল। মাথা নিচু করে দু হাতের আঙুল চিরুনির দাঁড়ার মতো চুলে ঢুকিয়ে দিল, "একদম হচ্ছে না। পারছি না আঁকতে। কিচ্ছু দাঁড়াচ্ছে না!"

অমিতেশের কাঁধে হাত রেখে বিজন সহমর্মীর গলায় বলল, "হবে, হবে। উতলা হচ্ছিস বলেই গুলিয়ে যাচ্ছে। একটু সময় নে।"

"সময় অনেক দিয়েছি রে! লাস্ট কবে সিরিয়াস ছবি এঁকেছি, মনে পড়ে না। চেষ্টা করেছি অনেকবার। ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পাওয়া ছবিটাই বোধ হয় শেষ।

সেই সময় বেশ ক'টা ভাল কাজ করেছিলাম। তারপর থেকে সব কেমন যেন হারিয়ে গেল! কিন্তু দেখ, আমাদের এই বয়সটাই তো কাজ করার হাই টাইম। ভাবনা, জীবন অভিজ্ঞতায় এখন পরিপূর্ণ আমরা। শরীর সক্ষম। আর ক'দিন পরেই তো বুড়িয়ে যাব। রোগ-ব্যাধি

বসে থাকবি তত এরকম হবে। ওঠ, ওঠ, অনেক কথা আছে।"

অমিতেশের হাত ধরে টানাটানি শুরু করেছে বিজন। অমিতেশ জানে, না উঠে সে পারবে না। বিজন সহজে ছাড়ার পাত্র নয়। স্কুল বয়স থেকে এমনটাই করে এসেছে ও। হঠাৎ বাড়ি

র সব চোখ যেন ক্যামেরা হয়ে গেল! টেনশনে পড়ে বাপি।

ক্রমশ অথর্ব করবে আমাদের। তারপর কখন যে কোন রোগের কাছে হেরে গিয়ে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে, কোনও ঠিক নেই। এখনও যদি আঁকতে না পারি, আর কবে আঁকব?"

ঘরের আবহাওয়া ক্রমশ ভারী হয়ে আসছে। কুনাল একটু হালকা হতে চায়। আজ দিনটাই শুরু হয়েছে অন্যরকমভাবে। মেঘলা সকালের মতো। এদিক-ওদিক তাকাতে কুনালের চোখ যায় দেওয়াল টাঙানো অমিতেশের আঁকা ছবির উপর। ছাত্র বয়সে এঁকেছিল, দিগন্ত ছোঁয়া সবুজ ধানখেত, আকাশ মুছতে-মুছতে যাচ্ছে সাদা মেঘ। খেতের মাঝখান দিয়ে হেঁটে আসছে কালো চমশা পরা একটা ছেলে। বডি ল্যাঙ্গোয়েজ দেখলেই বোঝা যায়, ছেলেটি দৃষ্টিহীন। ছবিটার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে কুনাল বলল, "এই ছবিটা কতদিন আগে এঁকেছিলি। তুই যে বড় আর্টিস্ট হবি, ছবিটার মধ্যে সেই সিগনেচার আছে। এসব দেখে নিজেকে চার্জ করতে পারিস না?"

বিজন লাফিয়ে উঠে অমিতেশকে বলল, "অ্যাই চল তো, বাইরে ঘুরে আসি। যত ঘরে ঢুকে নিয়ে গিয়েছে বাইরে, খোলা হাওয়ায়!

বউ না চুম্বক, বোঝা মুশকিল! ডলির সঙ্গে কানাইপুর স্টেশনে আসতেই, আশপাশের সব চোখ যেন ক্যামেরা হয়ে গেল! টেনশনে পড়ে গিয়েছিল বাপি, এই বুঝি ডলি চটে যায়! কিন্তু ডলির কোনও হেলদোল নেই। শহরের লোকের চাউনিতে সে যেন অভ্যস্ত। শুধু ছেলেরাই নয়, ডলিকে মেয়েরাও দেখছে! পাশে বাপি আছে, সেটা কেউ হিসেবেই ধরছে না। ডলিকে আজ লাগছে ব্যাপক! গোলাপি রঙের সালোয়ার কামিজ পরেছে, জরি-টরির কাজ আছে অনেক। কাঁধে চামড়ার ভ্যানিটি ব্যাগ। হিলতোলা চটি। ডলির হাইট এখন বাপির প্রায় মাথায়-মাথায়। হাঁটাটাও পালটে গিয়েছে একদম। এক একটা স্টেপিং যেন হিন্দি সিনেমার মিউজ়িক! বাপির চেহারার পাশে তো বটেই, মাইনের সঙ্গেও এই বউ বেমানান। বাপি যদি গিয়ে বলে, এ আমার বউ আর আমার মাস মাইনে এত, পাবলিক বিশ্বাসই করবে না! বলবে, কোথাও একটা গলদ আছে। আসলে গলদ নয়, ফারাক। কলকাতায় থেকে

চাকরি করলে কি ফাঁকটা ভরাট করা সম্ভব? মাইনে বাড়বে দেড় হাজার, মায়ের খরচ কমবে। আকডাঙার বাড়ির ভাড়াও দিতে হবে না। সব মিলিয়ে কত বাঁচবে, এখনও হিসেব করেনি বাপি। হয়তো দু' হাজার কিংবা তিন। ডলি যে সালোয়ার কামিজটা এখন পরে আছে, এর দাম প্রায় এরকমই হবে। এই ড্রেসটা বাপিকে কিনে দিতে হয়নি। পরে কখনও স্ট্যান্ডার্ড মিলিয়ে কিনতে হবে ড্রেস। ব্যস, তখনই দম শেষ বাপির। ফাঁকটা আবার দেখা দেবে। ডলিরও কিন্তু বোঝা উচিত, বরের ক্ষমতা অনুযায়ী চলা দরকার। ক'দিন আগে হাতে মোবাইল ফোন এসেছে। আজ এত দামি সালোয়ার কামিজ। ডলি গত দু'দিন ধরেই বেশ খুশি-খুশি আছে, যখন থেকে জেনেছে, বাপি ওকে নিয়ে আলাদা থাকবে কলকাতায়! কলকাতায় থাকার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করল দিদি। বাপির প্রোমোশনের খবরটা মা দিদিকে গিয়ে বলেছে। মায়ের যে কলকাতায় থাকার ইচ্ছে নেই, জানিয়েছে সেটাও। দিদিই বাপিকে বোঝাল, "তুই ডলিকে নিয়ে আলাদাই থাক। কোম্পানি যখন সুযোগ দিচ্ছে, থাকবি না কেন? তোর জামাইবাবুও তো মা, বাবা, ছেলে, বউ ছেড়ে আছে। আমরা আটকেছি? তোর সঙ্গে তবু বউ থাকবে।"
দিদি সেদিন সব দিক ভেবেই এসেছিল। সেগুলোই বলে গিয়েছিল এক-এক করে, "তোর জামাইবাবু আমার জন্য যে বাড়িটা ভাড়া করে রেখেছে, সেখানে বোধ হয় আর যাওয়ার দরকার পড়বে না। শাশুড়ি এখন অনেক পালটে গিয়েছে। আমার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে খুব। শাশুড়ির কিডনিতে অসুখ ধরা পড়েছে। মাঝে-মাঝেই বিছানা নেয়। তখন আমিই রান্নাবান্না, সংসার সামলাই। এদিকে শ্বশুরমশাই তাঁর নাতিকে চোখে হারান। ভাবগতিক বুঝে ননদও এখন ভাল ব্যবহার করছে আমার সঙ্গে। তবু আমি তোর শিবেনদার কাছে, বাড়ি ভাড়ার টাকা আর হাতখরচ নিয়ে যাব। ওর পাঠানো টাকাতে আকডাঙার এই বাড়িটার ভাড়া, মায়ের খাওয়া খরচ চলে যাবে।"
দিদির সুষ্ঠু ব্যবস্থায় আশ্বস্ত হয়েছিল বাপি। ছোট থেকেই দিদি তাকে এভাবে আগলে রেখেছে। খুব কম ভাই কপাল করে এমন দিদি পায়।

রবিবার বলে বাসে ভিড় কম। ডলি তো লেডিজ় সিটে জায়গা পেয়েইছে, বড়বাজার আসতে বাপিও পেয়ে গেল। কলকাতা আজ রেস্ট নিচ্ছে। এই শহরে মানুষ বসবাস করে, ভাবতে গেলে আশ্চর্য হয় বাপি। বাড়িঘর সব যেন রাস্তার উপর। অহরহ গাড়ি ঘোড়া, অজস্র দোকানপাট। ঘরের ভিতর লোকজন রান্না, খাওয়া, ঘুমনো কী করে সারে, কে জানে! ঘর মানে তো চারপাশটা একটু শান্ত থাকা। মানিকতলার ঘরের আশপাশটা কেমন হবে, সেই নিয়ে বাপির বেশ চিন্তা আছে। পছন্দ না হলে থাকবে না। এখনও তাই মালিককে বলেনি, প্রোমোশনটা নিচ্ছে।
ক্রমশ

অলঙ্করণ: নির্মলেন্দু মণ্ডল

সানন্দা শব্দভেদ

সূত্র পাশাপাশি

১ আচমকা, অপ্রত্যাশিতভাবে। ৫ প্রধান মহিষী। ৮ নড়া বা সঞ্চলন। ৯ বর্ষায় গ্রামের রাস্তাঘাটে যা হয়। ১০ দীর্ঘকায় ও কৃশ। ১২ যার যৌবন সদ্য আরম্ভ হয়েছে। ১৫ নত হয় এমন। ১৮ নিজের লোক। ২০ তিব্বতীয় বৌদ্ধ পুরোহিত। ২২ অতিশয় হীন বা নীচ লোক। ২৪ জীবনযাত্রার ধরন। ২৬ কারণ, উৎস। ২৮ আচার-ব্যবহার। ২৯ প্রবীণ ও সংঘমধ্যে সর্ববন্দিত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীবিশেষ।

১	২	৩		৪	■	৫		৬	৭
৮			■		■		■	৯	
	■	■	■	১০			১১	■	
১২	১৩		১৪		■	■		■	
■		■		■	১৫	১৬		১৭	
১৮		১৯			■		■		■
	■		■	■	২০				২১
	■	২২	২৩			■	■	■	
২৪	২৫	■		■		■	২৬	২৭	
২৮				■	২৯				

গত সংখ্যার সমাধান

মা	ন	ব	জা	তি	■	র	স	ক	লি
■	ব	■	য়	■	■	গ	■	■	প্য
■	জা	■	মা	ত	গু	ড়	■	■	ন্ত
■	ত	প	ন	■	দা	■	ক	সু	র
চা	ক	লা	■	■	ম	ন	ন	■	■
■	■	ত	স	র	■	■	ক	ব	ল
চা	র্বা	ক	■	সা	■	আ	ন	ন	■
লি	■	■	ক	ল	তা	ন	■	ম	■
য়া	■	■	দ	■	■	ন্দি	■	ল্লি	■
ত	ক	দি	র	■	সা	ত	স	কা	ল

সূত্র দাঁড়াশব্দ

১ নিয়ে আসা। ২ দৌড়। ৩ ইংরেজি ওজনবিশেষ। ৪ নরকপালধারী ও শ্মশানবাসী বামাচারী তান্ত্রিক। ৫ শুকনো গুড়ের বরফি বা তক্তি। ৬ প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমা তিথি। ৭ অন্তিম সময়। ১১ পতাকা, নিশান। ১৩ সমুদ্রের নিকটবর্তী নদীর পলি দিয়ে এর সৃষ্টি। ১৪ পানচাষের খেত। ১৬ অভিনয়াদির অভ্যাস। ১৭ বসন্তরোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ১৮ সুরের আলাপ। ১৯ পুত্র। ২০ এখানেই আছে কলকাতা বিমানবন্দর। ২১ অতি মাননীয় বা সম্ভ্রান্ত। ২৩ প্রজা সংক্রান্ত। ২৫ কানের নিম্নভাগের নরম অংশ। ২৬ দফা। ২৭ এক কল্পিত জেদি মেয়ে।

গাড়ি থেকে নামতে পেরে বাপি স্বস্তি পেয়েছিল। মনে হয়েছিল, পালিয়ে

পবনবাবু ঠিকানা লেখা একটা চিরকুট দিয়ে বলেছিলেন, "মানিকতলা পোস্ট অফিসের কাছে গিয়ে খোঁজ করবে, পেয়ে যাবে। চাবি খুলতে দেখে যদি আশপাশের লোক কিছু জিজ্ঞেস করে, হামার নাম বলবে। বলবে, আমি ওর স্টাফ আছি।" ঠিকানা লেখা চিরকুটটা যত্ন করে পার্সে রেখে দিয়েছে বাপি, ছয়ের ডি বাই ওয়ান হরিনাথ দে রোড। মানিকতলা এলাকায় বাপিকে নামতে হয়নি কখনও। এদিকের রাস্তাঘাট খুব একটা চেনে না। কান খাড়া করে বসে আছে, কখন কন্ডাক্টর 'মানিকতলা' বলে হাঁকে! ডলির দিকে চোখ যায়। এখনও তাকিয়ে আছে জানলার বাইরে। বিভোর হয়ে আছে। মুঠোয় আছে মোবাইল, খেয়াল আছে তো? এখন এই মেয়েকে দেখলে কে বলবে, রেগে গেলে কী বিশ্রীভাবে কথা বলে! কাঁচা খিস্তিও জানে অনেক! বাপি যখন ওর সঙ্গে সেক্স করে, আরামের চূড়ায় চলে গেলে ডলির মুখ থেকে বেরতে থাকে খারাপ গরম কথাগুলো! বাপি বেশ ক'বার চেপে ধরেছে ওর মুখ। সুখের গোড়ায় পৌঁছেও বাপি লজ্জায় মনে-মনে কুঁকড়ে যায়!

"ভাই, মানিকতলার মোড় আসছে," পাশের লোকটা ঠেলা দিল বাপিকে।

বাপি ডলিকে ডাকল, "চলো, এসে গিয়েছি। উঠে এসো।"

ঠিকানায় 'রোড' লেখা থাকলে কী হবে, লোকজনকে জিজ্ঞেস করে বাপিরা এখন এক গলির ভিতর ঢুকেছে! দুটো তিনতলা বাড়ি ছেড়ে দু' তলা বাড়িটা হচ্ছে ছয়ের ডি বাই ওয়ান হরিনাথ দে রোড। বাড়িটার সামনে পৌঁছে বাপি একটু থতমত খেয়ে যায়, দরজা খোলা অথচ বাপির পকেটে চাবি! ভুল বাড়িতে এল নাকি? বাড়িটার দিকে একটু এগোতেই খোলা জানলা দিয়ে চোখে পড়ে রঙের কাজ হচ্ছে ভিতরে। তার মানে পবনবাবুর কাছে থাকা ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে খোলা হয়েছে ঘর। চৌকাঠে এসে দাঁড়ায় বাপি। মাথায় কাপড় বেঁধে টুলে দাঁড়িয়ে একটা লোক রং করছে। বাপি জিজ্ঞেস করল, "এটা পবনবাবুর বাড়ি তো?"

ঘাড় ফিরিয়ে লোকটা বলল, "হ্যাঁ। বাবু বলেছেন, আসবেন আপনারা। দেখুন, ঘর-টর দেখুন।"

বাপি বেশ গর্ব ভরে ডলির দিকে তাকায়। ডলির চোখে জ্বল-জ্বল করছে আনন্দ। বাপি হাসে। হাসিটা একটু বোকা-বোকা হয়ে যায়। সে জানত না, পবনবাবু এত বড় মনের মানুষ। তারা আসবে বলে ঘরে কলি ফেরাচ্ছে! ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে মাপটা আন্দাজ করে বাপি, ও বাড়ির খাট, আলমারি, আলনা সব ধরবে তো? মনে তো হচ্ছে, ধরে যাবে। ঘরটা খুব বড় না, ছোটও নয়। ঘরে আর একটা দরজা আছে ভিতর দিকে যাওয়ার। বাপি ডলিকে ডাকল, "এদিকে এসো, রান্নাঘর, বাথরুম দেখি।" ভিতর দিকে ছোট্ট একটা বারান্দাও আছে। বাথরুম, রান্নাঘরের সাইজ ভাল। এখনও রং হয়নি। বারান্দায় পড়ে আছে একটুকরো দুপুরের আলো। দু' পাশের বাড়ির ফাঁক গলে চলে এসেছে। বাপি আচমকাই যেন দেখতে পায়,

ওই রোদে হামা টানছে তেল মাখা, ফর্সা একটা বাচ্চা! বাপি, ডলির সন্তান...ঝপ করে দৃশ্যটা উধাও হয়ে যায়। ডলি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশ দেখছে। পায়ে-পায়ে সামনে গেল বাপি, "ঠিকই আছে বলো বাড়িটা?" ডলি বলল, "দারুণ!"

আহ্লাদ উপচে পড়ছে! ও তো আর জানে না, এই আধঘণ্টার এ সির পয়সা মালিক বাপিকেই খাটিয়ে ঠিক তুলে নেবে! মানিকতলার মোড় ছাড়িয়ে একবার গাড়ি দাঁড় করিয়েছিল মালিক, বাঁ ফুটপাতে ওষুধের দোকান। মালিক বাপিকে বলেছিল, "এক

যাই। কিন্তু ডলিকে ফেলে রেখে যাবে কী করে...এসব ভাবতে-ভাবতে এগিয়ে গেল বাপি।

বাপি কিছু বলতে যাবে, দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়াল পবনবাবু, "কেয়া বাপি, ক্যায়সা লগা রুম? পেন্ট-ফেন্ট সব করিয়ে দিলাম।"
বাপি বিগলিত হাসল।
পবনবাবু এবার ডলিকে বলল, "বউমা, বাড়ি পসন্দ হয়েছে তো?"
ডলি একগাল হেসে ঘাড় কাত করল।
পবনবাবু বলল, "এখন তোমরা যাবে কোথায়?"
বাপি বলল, "কোথাও না। বাড়িই ফিরব।"
ডলি পাশ থেকে বলে উঠল, "না, মেট্রো চড়ব আমি।"
"আচ্ছা, সেই ভাল। হামার সঙ্গে গাড়ি আছে। চলো, তোমাদের মহাত্মা গাঁধী স্টেশনে নামিয়ে দিই," হাঁটা লাগাল পবনবাবু।
বাপিকে পিছন ধরতেই হয়। একবার সামান্য ধমকের চোখে তাকায় ডলির দিকে। সে এখন আনন্দে আত্মহারা। মহাত্মা গাঁধী মেট্রো স্টেশনে এসে পবনবাবুর গাড়ি থেকে নামল বাপিরা। হাত নেড়ে চলে গেল মালিক। ডলিও টা-টা করার জন্য হাত তুলেছিল। দেরি হয়ে গেল একটু। বাপি ভিড়ে মিশে যাওয়া পবনবাবুর গাড়িটার দিকে তাকিয়ে ভাবে, এই কি সেই মালিক? যে কাজ ছাড়া কিছু বোঝে না? কথাও বলে না খুব একটা। যদি কিছু বলতে হয় স্টাফকে, চেম্বারে ডাকে। এটা মালিকের যমজ নয় তো? নিজের ভাবনায় নিজেই হেসে ফেলে বাপি। পবনবাবুর গাড়িতে যতক্ষণ ছিল, এতটুকু ফ্রি হতে পারেনি। বাপিরা সিটে গিয়ে বসতেই, পবনবাবু জানলার কাচ তুলে দিয়ে ড্রাইভারকে এ সি চালাতে বলল। বাপি লজ্জায় মরে যায় আর কী! ডলির চেহারায় তখন স্ট্রিপ ডাইজিন লে আও তো বাপি।" গাড়ি থেকে নামতে পেরে বাপি স্বস্তি পেয়েছিল। মনে হয়েছিল, পালিয়ে যাই। কিন্তু ডলিকে ফেলে রেখে যাবে কী করে...এসব ভাবতে-ভাবতে মেট্রো স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেল বাপি।

মেট্রোয় ওঠার সময় ভয় পাচ্ছিল ডলি। কিন্তু এসপ্ল্যানেডে নেমে ওর ভয় অনেকটাই কেটে গেল। চলন্ত সিঁড়িতে উঠল একাই। স্টেশনের বাইরে এসে আবার থতমত খেয়ে গেল। চারপাশে এত দোকানপাট! দু' ফুট হাঁটা হয়নি, দু'বার দু'জনের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে গেল ডলি। ওর চোখ এখন ফুটপাতের দোকানগুলোর উপর। মেট্রো স্টেশনের দেওয়ালে সারি-সারি ম্যাক্সি, গেঞ্জি ঝুলছে।
ডলি দাঁড়িয়ে পড়ল, "একটা নাইটি কিনে দেবে? দুটো মাত্র আছে, তাও ছিঁড়ব-ছিঁড়ব করছে একটা। তোমার ধামসানিতেই হয়েছে।"
বাপির মনটা ঝট করে একবার তার পার্সের মধ্যে ঘুরে নিল। দু'শো দশ-কুড়ি টাকা মতো আছে। নাইটি কেনা আর দুপুরের খাওয়া হয়ে যাবে নিশ্চয়ই। ডলিকে বলল, "কেনো।"
দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পছন্দ করতে থাকল ডলি। এখানে সব নাইটির একই দাম। দরাদরির সুযোগ নেই। ডলি একটার পর একটা দেখে যাচ্ছে। বিরক্ত হচ্ছে হকার। অবশেষে দুটো পছন্দ হয়ে গেল ডলির। দু' হাতে দু'খানা নিয়ে ভাবছে, কী করবে। টেনশনে পড়ে যায় বাপি! ডলি যদি দুটোই কিনতে চায়, দুপুরের খাওয়া হবে না। এদিকে বেশ খিদেও পেয়েছে। কোন সকালে চারটে করে রুটি

খেয়ে বেরিয়েছে ওরা!

"কোনটা নিই বলো তো?" দুটোই বাপির দিকে বাড়িয়ে জানতে চাইল ডলি।

বাপি নিশ্চিন্ত হল। ডলির বাঁ হাতের জংলা ছাপের নাইটিটা দেখিয়ে বলল, "এটাই নাও।"

দোকানদার কাগজে মুড়ে দিল জিনিসটা, হাতে নিয়ে চার পা এগোতে না-এগোতে ডলি বলল, "একটা চটি কিনে দেবে?"

ফুটপাতের উপর থরে-থরে মেয়েদের চটি সাজিয়ে বসেছে এক হকার। ডলির চোখ সেখানেই। বাপি ডলির কানের কাছে মুখ রেখে বলে, "চটি কিনলে দুপুরের খাওয়া হবে না। আমার কাছে এখন অত টাকা নেই।"

"টাকা নেই তো এসব জায়গায় আস কেন?" খেঁচিয়ে উঠল ডলি।

বাপি ভাবে, ভুলই হয়েছে ডলিকে এখানে নিয়ে এসে। এর চেয়ে বরং রবীন্দ্রসদন, ময়দানে নামলে ভাল হত। সেখানে এত দোকানপাট নেই। কিন্তু খাওয়া হত কোথায়? ওখানে তো আবার সব বড়-বড় হোটেল! ডলির কনুই ধরে বড় রাস্তার দিকে এগোল বাপি। রাস্তা ক্রস করলে ময়দান মার্কেট। ওখানে সস্তায় ভাল খাবার পাওয়া যায়। কিন্তু রবিবার বলে মার্কেট, ক্যান্টিন সব বন্ধ। গরিবমার্কা একটা ভাতের হোটেল পাওয়া গেল। সেখানে ডলিকে নিয়ে গিয়ে বসতে খারাপই লাগছিল বাপির। দোকানদার এবং যারা বসে খাচ্ছে, সকলেই অবাক হয়ে দেখছে বাপিদের! বাপি তো নয়, আসলে ডলিকেই কাস্টমার হিসেবে বেশ ভারী ঠেকছে ওদের! ডলির কিন্তু কোনও বাধো-বাধো ভাব নেই। ঝপ করে বসে পড়ল বেঞ্চে। ও তো গরিব পরিবেশেই মানুষ। চেহারাটা বড়লোকের মতো হলে কী হবে! হোটেলের বাচ্চাটা তড়িঘড়ি দু' গ্লাস জল নিয়ে এল টেবিলে। দুটো মাংস ভাতের অর্ডার দিল বাপি। মুরগির মাংস। ডলি অল্প জল খেয়ে গ্লাসটা রাখল টেবিলে। একটু যেন মনমরা। বাপি ওকে সহজ করার জন্য ফের বলল, "তুমি ধর্মতলায় এই প্রথমবার এলে?"

ঘাড় হেলিয়ে 'হ্যাঁ' বলল ডলি।

বাপি জানতে চাইল, "লাস্ট কবে এসেছিলে কলকাতায়?"

"অনেকদিন আগে। পাড়ার ক্লাব থেকে একবার চিড়িয়াখানা দেখতে নিয়ে এসেছিল। তারপর কতবার ভেবেছি আসব, কাউকে সঙ্গে পাইনি।"

অন্য একটা প্রশ্ন এসেছে বাপির মাথায়, "প্রতাপ তো হামেশাই তোমাদের বাড়ি যায়। ওর সঙ্গেও তো চলে আসতে পারতে।"

"মেসোমশাই আমাদের পছন্দ করেন না। আমরা গরিব, খারাপ পাড়ায় থাকি। প্রতাপদা তো বাড়িতে না জানিয়ে আসে।"

ডলির কথায় বেশ বড় ধরনের ঝটকা খেল বাপি! কিছু বলতে যাবে, খাবার প্লেট এসে হাজির। ভাতটা গরম, ধোঁয়া উঠছে। বাঁ-হাতে গ্লাস তুলে ডান হাত ধুয়ে নিল ডলি, হামলে পড়ল প্লেটে। ওরও খিদে পেয়েছিল ভালই। এই সময় ওকে কিছু জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে না। প্রশ্নগুলো মাথায় নিয়ে বাপিও গ্লাসের জলে হাত ধুয়ে খাওয়ায় মন দিল। দেওয়ালির দিন প্রতাপের সঙ্গে প্রথম ডলিদের বাড়িতে গিয়েছিল বাপি। প্রতাপ এমন ভান করছিল, অনিচ্ছেতে যাচ্ছে। ওর মা বিশেষ দরকারে পাঠাচ্ছে ওকে। ঘটনাটা কি সত্যিই তাই ছিল? নাকি প্রতাপ বিশেষ কোনও কারণে ওখানে নিয়মিত যায়। ও যে ওখানে প্রায়ই যায়, একথা ডলির বাবা নিজের মুখে স্বীকার করেছে। একই সঙ্গে এটাও বলেছে, ডলিদের পাড়ায় যে দেহব্যবসা হয়, প্রতাপ তা জানে না। কিন্তু এখন ডলি বলল, ওরা গরিব এবং খারাপ পাড়ায় থাকে বলে মেসো সম্পর্ক রাখতে চায় না। প্রতাপ আসে বাড়িতে লুকিয়ে। মানে যা দাঁড়াল, প্রতাপ ভাল মতোই জানে ডলিদের পাড়ায় ধান্দা হয়। অথচ প্রতাপ এবং ডলির বাবা, দু'জনেই বাপিকে মিথ্যে বলেছে! কেন বলল? কী লাভ হল এতে ওদের...মাংসের ঝালটা এবার টের পাচ্ছে বাপি, জল গড়াচ্ছে চোখ দিয়ে। বাঁ-হাতে চোখের কোল মুছে বাপি ডলিকে বলল, "চলো, এখান থেকে প্রতাপদের বাড়ি যাই। এখন তুমি গরিবও নও, খারাপ পাড়াতেও থাক না।"

"না। মেসোর হেভি ডাঁট। বিয়েতে পর্যন্ত আসেনি," ডলির খাওয়া শেষ। শেষ পাতে চাটনি দিয়ে গেল হোটেলের বাচ্চাটা। চাটনি খেতে-খেতে ডলি বলল, "বরং এখন একটু ঘুরি। কলকাতায় কী জায়গার অভাব?"

চাটনি শেষ করে বাপি দ্রুত ভাবতে থাকে, কোথায় যাওয়া যায়। অবশ্যই সেখানে কোনও দোকানপাট থাকা চলবে না!

কখনও এঘর-ওঘর করে, বাপির ঘরের টিভিটা একবার চালিয়ে, একটু পরে বন্ধ করে, ঠাকুরের ছবির সামনে বসে থেকে বিকেল ফুরিয়ে ফেলল সরমা। বাপিরা কখন ফিরবে, ঠিক করে বলে যায়নি। রাতে এসে নিশ্চয়ই খাবে। দূরে কোনও বাড়ি থেকে সন্ধের শাঁখের আওয়াজ ভেসে এল। সরমাও ঠাকুরকে প্রদীপ দেখানোর জন্য শাড়ি বদলাতে ওঠে। এমন সময় দরজায় ঠক-ঠক! একটু জোরে বিশ্রীভাবে। কে এল এখন? বাপি তো এভাবে দরজা ধাক্কায় না। কড়া নাড়ে। স্বপ্নাও নয়। তা হলে কে? কপালে ভাঁজ ফেলে দোর খুলতে যায় সরমা। খিল খোলার আগে সরমা গলা তুলে জিজ্ঞেস করে, "কে?"

ওপার থেকে পুরুষকণ্ঠ, "আমি, আমি। খুলুন।"

চেনা-চেনা লাগে গলাটা, কার? কিছুতেই খেয়াল করা যাচ্ছে না।

কে এল এখন? বাপি তো এভাবে দরজা ধাক্কায় না। কড়া নাড়ে। স্বপ্নাও নয়। তা হলে কে? কপালে

দরজা খোলার পর মানুষটাকে চিনতে অসুবিধে হল না, ডলির বাবা! পিছনে যে ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে, তাকেও চেনে সরমা। ডলির পিসতুতো দাদা। বাপি বাড়িতে না থাকাকালীন এক দুপুরে এসেছিল। খুব সঙ্গত কারণেই এই দুই অতিথি সরমার কাছে কাঙ্ক্ষিত নয়। তবু কুটুম বলে কথা, ঠোঁটে জোর করে হাসি টেনে সরমা আপ্যায়ন করে, "আসুন, আসুন। খবর সব ভাল তো? বসুন," বসার চেয়ার দু'টো দেখিয়ে বলে সরমা।

"বসব না। ডলি বাড়ি নেই?" মেজাজি গলায় জিজ্ঞেস করল ডলির বাবা। লোকটার গা থেকে মদের গন্ধ ভেসে আসছে!

দু'পা পিছিয়ে সরমা বলল, "ওরা একটু কলকাতায় গিয়েছে।"

ডলির বাবা জিজ্ঞেস করল, "কখন ফিরবে?"

"বলে যায়নি। রাত হতে পারে।"

ডলির বাবার চেহারায় আগের সেই কন্যাদায়গ্রস্তভাব নেই, পোশাক-আসাক একইরকম অপরিচ্ছন্ন।

"তা হলে আপনাকেই বলি, ডলিকে একটা মোবাইল ফোন দিয়েছি নিশ্চয়ই জানেন? সেটা বন্ধ থাকে কেন?" 'বন্ধ' কথাটার উপর বেশ জোর দিল ডলির বাবা।

ঘাবড়ে যাওয়া গলায় সরমা বলল, "আমি কী করে জানব!"

"আপনি সব জানেন। ডলিকে সারাক্ষণ কাঠি করেন। আমাদের কাছে

খবর আছে।”

এই কথাটা ডলির দাদার। এরা এভাবে অপমান করবে, সরমার কাছে কল্পনার অতীত। তাই চোখ বড়-বড় হয়ে গিয়েছে, গলা শুকিয়ে কাঠ!

ডলির বাবা বলতে থাকল, “মেয়েকে ফোনটা দেওয়া হয়েছে, যাতে ওর খবরাখবর নিতে পারি। ঘরে সাজিয়ে রাখার জন্য নয়। বাড়ি এলে হবে।”

ডলির বাবার কনুই ধরে ছেলেটা টেনে নিয়ে গেল দরজার দিকে। সরমা দাঁড়িয়ে রইল পুতুলের মতো! একরাশ আতঙ্ক নিশ্চল করেছে তাকে, ওরা কি বাপিকে মারবে? ছেলেটা ডলির বাবাকে ‘দাদা’ বলে সম্বোধন করল কেন? ডলি যে বলেছিল, ছেলেটা ওর পিসতুতো দাদা? সব

ভাঁজ ফেলে দোর খুলতে যায় সরমা। জিজ্ঞেস করে, “কে?”

সেটা ওদের বলে দেবেন।”

অনেক কষ্টে মনে জোর এনে সরমা বলল, “আমি পারব না বলতে, ওটা বাপি, ডলির ব্যাপার। আপনিই বলবেন।”

কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল ডলির বাবার। একটু টালও খাচ্ছে। ভয়ে বুক ফাঁকা হয়ে যায় সরমার, কী ঘটতে যাচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারছে না। অবস্থা সামাল দেওয়ার জন্য বলল, “আমাদের বাড়িওয়ালার ফোন নম্বর তো আপনাদের কাছে দেওয়া আছে। দরকার পড়লে ওখানে ফোন করে ডলি বা বাপিকে ডেকে দিতে বলবেন।”

এক ঝটকায় অনেকটা গলা তুলে ফেলল ডলির বাবা, “কেন বাড়িওয়ালার ঘরে ফোন করতে যাব? মেয়েকে ফোন দিয়েছি কী করতে? কতগুলো টাকা খরচ হয়েছে জানেন!”

সরমা আর পাল্লা দিতে পারছে না, বুকের ধুকপুকানি নিজের কানেই বাজছে! পিসতুতো দাদা ডলির বাবাকে ধাতস্থ করতে গিয়ে বলল, “ছাড়ো শিবুদা, এই বুড়িকে বলে কোনও লাভ হবে না। বাপিকেই একদিন কাজ ফেরত ধরতে তা হলে মিথ্যে, সাজানো! ছেলেটা প্রথম যেদিন এসেছিল বাড়িতে, সরমাকে মিষ্টি কিনতে পাঠিয়ে দরজা বন্ধ করেছিল ডলি। সরমা ফেরার পর ডলির চেহারায় অগোছালোভাব দেখে সেদিনের ঘটনা বাপিকে বলেছে সরমা। কিন্তু ডলির চেহারার কথা বলা হয়নি। বলা উচিত ছিল। তখন থেকেই সাবধান হতে পারত বাপি। এখন না জানি, ওর জন্য কত বড় বিপদ অপেক্ষা করে আছে। ডলির বাড়ির লোক দরজা পার করে চলে গিয়েছে, বাইরের অন্ধকারটা আজ যেন বড্ড বেশি কালো! দৌড়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে সরমা। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ফের দরজায় আওয়াজ। তবে এবার কড়া নাড়ার। খুলতে সাহস হয় না। ধড়াস-ধড়াস করেই যাচ্ছে বুক।

“বউদি, আমি। দরজা খুলুন।”

বাড়িওয়ালা বিজয়ের গলা। খিল খুলল সরমা। এখনও তার হাত কাঁপছে।

“কারা এসেছিল বউদি? খুব চেঁচাচ্ছিল, লোক দু’টোকে বেরিয়ে যেতেও দেখলাম। আগে তো দেখিনি এদের।”

বিজনের প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না সরমা। আঁচল তুলে নিয়ে ঠোঁট চাপা দিল, কান্না উঠে চোখ দিয়ে গড়াতে লাগল জল।

বিজয় সদরের বাইরে গিয়ে দোতলার দিকে ঘাড় তুলে ডাকল, "ওগো, শুনছ? নীচে এসো তো তাড়াতাড়ি।"

রাত দশটা নাগাদ বাপিরা বাড়ি ফিরতে দরজা খুলল বাড়িওয়ালি কাকিমা। বাপি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, "মা কোথায়?"

"দিদির শরীরটা একটু খারাপ। শুয়ে আছে। একা আছে, তাই কিছুক্ষণ গল্প করে গেলাম। এবার চলি।" কাজ বেশি, কম কথার মানুষ কাকিমা। মায়ের হয়তো শরীরটা বেশিই খারাপ, দরকারের সময় কাকিমা থেকে, বাপি ফিরতেই চলে গেল উপরে। গভীর দুশ্চিন্তা নিয়ে মায়ের ঘরের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে থেমে যায় বাপি। ঘাড় ফিরিয়ে ডলিকে দেখে, সে যাচ্ছে নিজের ঘরের দিকে। বাপি বলল, "কী হল, চলো? মায়ের কী হয়েছে, দেখবে না?"

ঠোঁট বেঁকিয়ে ডলি বলল, "কী আবার হবে। ছেলে বউকে নিয়ে ফুর্তি করতে গিয়েছে, মায়েদের একটু শরীর খারাপ হয়ই!"

বাপির ইচ্ছে করল, দৌড়ে গিয়ে ওর স্টাইল করে কাটা চুলটা খামচে ধরে। প্রাণপণে ইচ্ছে সংবরণ করল। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বাপি লক্ষ করল, চোখে কনুই ঢাকা দিয়ে একটা হাঁটু পিরামিডের মতো করে অন্য হাঁটু তার উপর চাপিয়ে শুয়ে আছে মা। এভাবে শুয়ে থাকাটা মায়ের অভ্যেস, কোনও অসুস্থতার লক্ষণ নেই।

খানিক নিশ্চিন্ত হয়ে বাপি ডাকল, "মা!"

চোখ থেকে কনুই সরিয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল মা, "ওঃ, তোরা এসে গিয়েছিস?"

অবাক হল বাপি। মায়ের শরীর ঠিকই আছে, কী এত ভাবছিল!

"তোমার নাকি শরীর খারাপ। উপরের কাকিমা বলল।"

"না, সেরকম কিছু নয়। সন্ধের দিকে একটু মাথা ধরেছিল," বলতে-বলতে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াল সরমা। নিজের ঠাকুরের জায়গার দিকে একবার তাকাল। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে গেল, এভাবে বলে উঠল, "ও হ্যাঁ, ডলিকে এখনই ফোনটা চালু করতে বল। সন্ধেবেলা ওর বাবা এসেছিল। বলল, 'মেয়েকে ফোন চালু রাখতে বলবেন। ওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্যই মোবাইলটা দেওয়া হয়েছে।' লোকটা মদ খেয়ে এসেছিল, জানিস বাপি? ওর বাবার সঙ্গে পিসতুতো দাদাও এসেছিল। যে ছেলেটা আগে একবার এসেছিল, তুই তখন কারখানায় ছিলি..." দরজার কাছে পৌঁছে গিয়েছিল সরমা।

ক্রমশ

অলঙ্করণ: নির্মলেন্দু মণ্ডল

লোকটা মদ খেয়ে এসেছিল, জানিস বাপি? ওর বাবার সঙ্গে পিসতুতো দাদাও এসেছিল।

সানন্দা শব্দভেদ

সূত্র পা শা পা শি

১ বিপদে পড়েছে এমন। ৩ স্বর্গের গঙ্গা। ৭ সরু নালা। ৮ বনই যার আশ্রয় বা বাসস্থান। ১০ প্রথম, আদ্যা। ১১ গৃহ বা বাসভবনের অংশ। ১২ মদ্যপানের ফলে আবেশের জন্য বিহ্বলা। ১৪ যুদ্ধ। ১৫ সম্পূর্ণ নষ্ট বা পণ্ড। ১৭ কষ্ট সহ্য করতে পারে এমন। ১৯ যার জন্ম নেই বা হয় না। ২০ হাসির উদ্রেককারী। ২২ ধান রাখার জন্য বাঁশ বেত ইত্যাদির আধার। ২৩ এভাবে দিন কাটানো ঠিক নয়। ২৫ মণিদ্বারা শোভিত। ২৬ শিবের শ্বশুর। ২৭ যুদ্ধের পোশাক। ২৮ উপযুক্ত, শোভন।

১		২			■	৩		৪	৫
	■		■	■	৬	■	■	৭	
	■	৮		৯		■	১০		
১১			■	১২		১৩		■	■
	■	■	১৪		■	১৫			১৬
১৭		১৮		■	১৯		■	■	
■	■	২০		২১		■	২২		
২৩	২৪		■	২৫				■	
২৬		■	■		■	■		■	
২৭				■	২৮				

গত সংখ্যার সমাধান

আ	ল	ট	প	কা	■	পা	ট	রা	নি
ন	ড়	ন	■	পা	■	টা	■	কা	দা
য়	■	■	■	লি	ক	লি	কে	■	ন
ন	ব	যু	ব	ক	■	■	ত	■	কা
■	দ্বী	■	র	■	ন	ম	ন	শী	ল
আ	প	ন	জ	ন	■	হ	■	ত	■
লা	■	ন্দ	■	■	দ	লা	ই	লা	মা
প	■	ন	রা	ধ	ম	■	■	■	ন্য
চা	ল	■	য়	■	দ	■	প্র	ভ	ব
রী	তি	নী	তি	■	ম	হা	স্থ	বি	র

সূত্র চলবে না

১ পা থেকে মাথা পর্যন্ত। ২ সঙ্গে থাকলে সাহস বাড়ে। ৪ ধার, প্রান্ত। ৫ নীল রং বা আভা। ৬ সুফল, লাভ। ৯ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। ১০ ব্যবসায়ে খ্যাতি বা প্রতিপত্তি। ১৩ বাচনভঙ্গি। ১৪ গূঢ় তাৎপর্য বা মর্ম। ১৬ অঙ্গমর্দন। ১৮ হাসিযুক্ত। ১৯ যে কাঠের ঘর্ষণে আগুন জ্বলে। ২১ সন্ন্যাসীদের ব্যবহৃত মাটির বা কাঠের বা ধাতব জলপাত্রবিশেষ। ২২ আলংকারিক অর্থে অবারিত স্থান। ২৩ খাতির, যত্ন। ২৪ চিহ্ন, পরিচয়।

জরুরি কিছু একটা মনে পড়েছে এই ভঙ্গিতে ফিরে এসে আবার বিছানায় বসল সরমা। ইশারায় বাপিকেও বসতে বলল। তারপর গলা নামিয়ে বলল, "তোকে একটা কথা আমার আগে বলা উচিত ছিল। ডলির দাদা আগে যেদিন এসেছিল, আমাকে মিষ্টি কিনতে পাঠাল ডলি। ফিরে এসে দেখি, ডলি কেমন যেন আলুথালু।" একটু থেমে রইল সরমা, "ছেলেটা ডলির সত্যিকারের দাদা নয়। ডলির বাবাকে আজ 'শিবুদা' বলে ডাকছিল। ছেলেটা একেবারেই সুবিধের নয়। ডলির বাবাকে একবার বলল, তোকে রাস্তায় ধরবে। তুই একটু সাবধানে চলাফেরা করিস বাবা। নয়তো কাল থেকেই কলকাতায় গিয়ে থাক!"

বিছানা থেকে নেমে দরজার দিকে হাঁটা দিল মা। বাপি পুরোপুরি থ' মেরে বসে থাকে! একটা চক্রান্তের মাঝে তাকে যে ফেলা হয়েছে, অনেকদিন আগে থেকেই টের পাচ্ছিল। বার-বার সেটা ভুলে থাকার চেষ্টা করেছে, আপন করে নিতে চেয়েছে ডলিকে। সেটা বোধ হয় আর সম্ভব নয়। মায়ের কথা শুনে মালুম হচ্ছে, চক্রান্তের জাল অনেকটাই ছড়ানো। এই অবস্থায় **বাপিকে মাথা ঠান্ডা রাখতেই হবে, জাল ফুটো করে বেরতে হবে তাকে।**

মায়ের ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে পা দিতেই মা রান্নাঘর থেকে অত্যন্ত স্বাভাবিক গলায় বলে, "মুখ-হাত ধুয়ে নে তোরা। খেতে দিই। বিকেলে কিছু রাঁধতে পারিনি। রত্নাই দিয়ে গেল রুটি-তরকারি। আর ফোনটা চালু করে দে।"

ডলির মোবাইল সেটটা এখন আছড়ে ভেঙে ফেলাই উচিত! ইচ্ছেটা মাথা চাড়া দিলেও নিজেকে শান্ত করে বাপি। শোওয়ার ঘরে ফিরে দেখল ডলি ম্যাক্সিটা পরে আয়নায় নিজেকে দেখছে। আয়নাতেই দেখল ঘরে ঢুকেছে বাপি। ঘুরে দাঁড়িয়ে জানতে চাইল, "ভালই হয়েছে, বলো?"

"হ্যাঁ, ভাল!" বাপি থমথমে মুখে জামা ছাড়তে-ছাড়তে বলল, "তোমার ফোনটা একবার দাও তো। অন করব। তোমার বাবা এসেছিল। ফোন চালু রাখতে বলেছে। কী একটা দরকার আছে, ফোনে জানাবে।"

"বাবা!" অবাক হয়ে কথাটা উচ্চারণ করল ডলি।

বাপি বলে, "তোমার সেই দাদাও এসেছিল। কী যেন নাম, সোনাদা।"

কলকাতা দেখে আসা রঙিন, মায়াবি ডলির মুখ এখন নিভে যায়। কপাল কুঁচকে কী যেন ভাবছে। বিছানায় পড়ে থাকা ডলির হ্যান্ডব্যাগ থেকে সেটটা বের করে বাপি। অন করে সাইলেন্ট মোডে রাখে।

রাতে ডলি ফোনটা বালিশের কাছে নিয়ে শুল। **পরদিন সকাল থেকেই ফোনটা ওর হেফাজতেই** ছিল। **কিন্তু রিং হচ্ছে না বলে একসময় ভুলেই** গেল ফোনের **কথা। বাপির দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ** বেরবে। বি **শিফ্‌ট থাকলে ডলি বাপি সঙ্গেই খাওয়া** সেরে নেয়। **তারপর দরজা বন্ধ করে ঘুম অথবা টিভি** দেখা। এখন **স্নান করতে ঢুকেছে ডলি। ফোনটা ভুলে** রেখেছে

দ্বিতীয়টা নম্বরটা দেখে চমকে ওঠে বাপি, ভীষণ চেনা নম্বরটা! এই দশটা স

চিপ্রপট

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

চোখের সামনে, টিভির মাথায়। বাপি এই সুযোগটাই খুঁজছিল। টিভির মাথা থেকে তুলে নেয় সেটটা। তিনটে মিসড কল। লিস্ট দেখে, প্রথম নম্বরটা থেকে এসেছে দুটো কল। লিখে

ংখ্যা ভোলার কথা নয় তার। অফিসের সব স্টাফেরই মুখস্থ।

নিতে হবে নম্বরটা। দ্বিতীয়টা নম্বরটা দেখে চমকে ওঠে বাপি, ভীষণ চেনা নম্বরটা! এই দশটা সংখ্যা ভোলার কথা নয় তার। অফিসের সব স্টাফেরই মুখস্থ। নম্বরটা পবন তেওয়ারির!

দিনসাতেক হয়ে গেল অমিতেশের খোঁজ নেয়নি বিজন। কুনালের নিজের থেকে ফোন করার কথা। এই ক'দিন বিজনেরও বেশ কাজের চাপ ছিল। আজ একবার ফোন করবে কুনালকে। তার আগে দুর্গাবাড়ি বিক্রি নিয়ে এক রাউন্ড ভেবে নিতে হবে। সাইকেল চালাতে-চালাতে দুর্গাবাড়ির কাছে এসে পড়েছে বিজন...কিন্তু গেটের কাছে ম্যাটাডোর কেন? গাড়িতে খাট, আলমারি উঠছে। কারা চলে যাচ্ছে ঘর ছেড়ে? প্যাডেলে জোরে চাপ দেয় বিজন। সদরের কাছে এসে দেখে দুর্গাবাড়ির প্রায় সকলেই বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। চলে যাচ্ছে রতন জ্যেঠারা। জ্যেঠার ছোট ছেলে বিশ্বনাথ ম্যাটাডোরের ডালায় উঠে জিনিসপত্র বাঁধছে। হেল্প করছে গাড়ির খালাসি। রতন জ্যেঠা দাঁড়িয়ে থেকে গোটা ব্যাপারটা তদারকি করছে। জেঠাইমা আর বিশ্বনাথের বউ পোঁটলাপুঁটলি তুলে দিচ্ছে বিশ্বনাথদের হাতে। দু'জনেরই পরনে পাটভাঙা শাড়ি। বিজন সাইকেল থেকে নেমে পড়ে। বলা নেই, কওয়া নেই, জ্যেঠাদের এভাবে চলে যাওয়াতে স্বাভাবিক কারণেই বেশ অবাক হয়েছে। চোখে অনেক প্রশ্ন নিয়ে জেঠার দিকে তাকিয়েছিল, চোখাচোখি হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দৃষ্টি সরিয়ে নিল জ্যেঠা। সাইকেলটা স্ট্যান্ড করে বিজন রতন জেঠার পাশে গিয়ে বলল, "কী ব্যাপার, কোথায় চললে?"

"শিমুলতলায়। মুক্তির বাড়ির পাশে," বলল রতন জেঠা। মুক্তি জ্যেঠার বড় ছেলে। পুরো নাম মক্তিনাথ, মেজ বাইরে কোথাও চাকরি করে। রতন জ্যেঠা বিজনের মুখের দিকে তাকিয়ে বিরক্তির স্বরে বলল, "এ বাড়িতে থাকা মানে তো জান হাতে করে বাঁচা! এই তো ক'দিন আগে সিলিং থেকে সিমেন্টের চাঙড় খসে পড়ল। একটু হলেই বউমার মাথায় পড়ত। কাঁহাতক টেনশন নিয়ে থাকা যায়!"

কথাগুলো কনভিনসিং হচ্ছে না বিজনের কাছে। এই বিপদ মাথায় নিয়ে সকলেই তো আছে দুর্গাবাড়িতে। অন্য কোথাও যাওয়ার উপায় নেই বলেই আছে। সে রতন জ্যেঠাকে বলল, "তোমার ঘরের চাবি ঠাকুরমাকে দিয়ে দিচ্ছ তো?"

অমনই তেরিয়া ভাব নিয়ে জ্যেঠা বলল, "কেন

শুধু মুখের সৌন্দর্যের কথা ভাবেন?
আমরা ভাবি আরও কিছু...

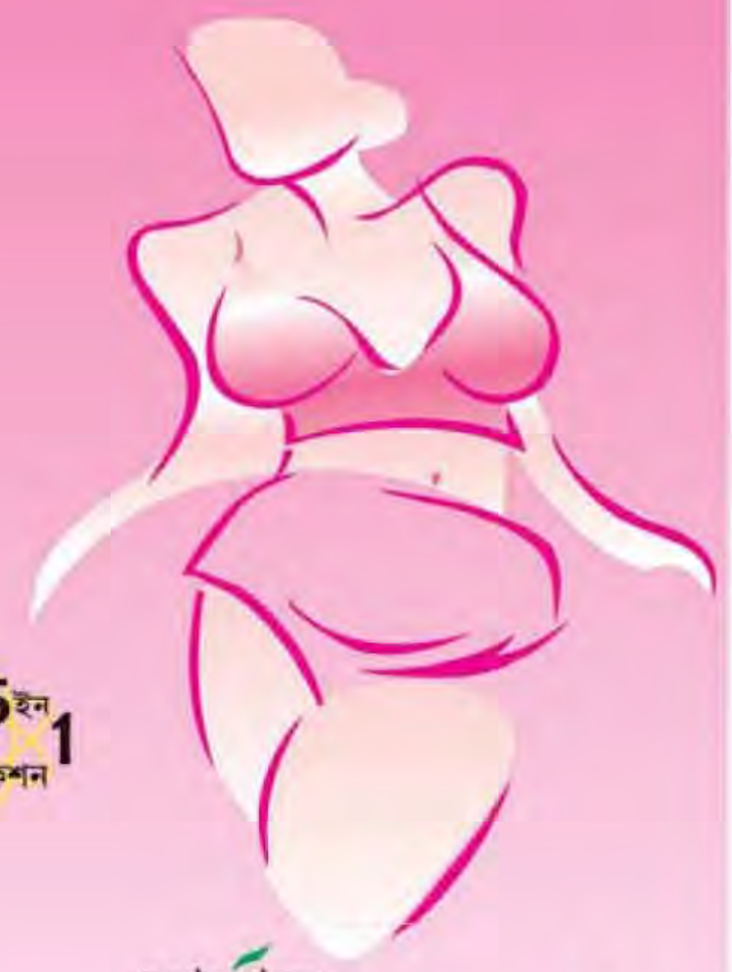

ইউনিক 5 ইন 1 অ্যাকশন

হার্বাল
ম্যাসোলিন®
মাল্টিপারপাস
ব্রেস্ট কেয়ার অয়েল এন্ড ক্যাপস্যুলস্

প্রাচীন ভারতীয় ভেষজ গুণ সম্পন্ন হার্বাল ম্যাসোলিন মাল্টিপারপাস বক্ষ মালিশের তৈল ও ক্যাপসুল আপনার আত্মবিশ্বাস **বাড়িয়ে তোলে** আর আপনাকে করে *পরিপূর্ণা*, কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই

• সুগঠিত বক্ষ সৌন্দর্য্য • মসৃণ ও উজ্জ্বল ত্বক
• নিপল্ এবং হিল ক্র্যাক্স নিরাময় • স্ট্রেচ মার্কস কমায়

নতুন উন্নত ফর্মুলা

তৈল : ৫০/১০০/৫০০ মি.লি প্যাকে, ক্যাপসুল : ৩০টির প্যাকে পাওয়া যায়

ভালো ফল পেতে ম্যাসোলিন তৈল ও ক্যাপসুল একসাথে ব্যবহার করুন

প্রসবের আগে ও পরে হার্বাল ম্যাসোলিন তৈলের ব্যবহার মাতৃদুগ্ধ বাড়ায়, স্ট্রেচ মার্কস কমায়, তল পেটের ব্যাথা উপশম করে ও গর্ভাবস্থায় বেড়ে ওঠা মেদ ঝরিয়ে আপনার ফিগার সুন্দর রাখতে সাহায্য করে।

সকল ঋতুর জন্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াহীন

AUTHENTIC AYURVEDA

মেসোলিন ✦ مسولين ✦ মেচোলিন
সকল দোকানে পাওয়া যায়
ব্যবসায়িক যোগাযোগ : 033 22435035 (১২টা- সন্ধে ৬টা)
e mail: masolinresponse@gmail.com

দেব? আমি তো এখানকার ঘর ছেড়ে দিচ্ছি না। সারাই-ফারাই করে আবার এসে থাকতে পারি। এখন তালা মেরে যাচ্ছি।"
বিজন, রতন জ্যেঠাকে ঘিরে একটা ছোটমতো ভিড় হয়েছে। দুর্গাবাড়ির বাসিন্দাদের ভিড়। সকলের মুখে কৌতূহল, আলোচনা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়? বিজন বলল, "তালা তুমি তখনই মারতে পার, যখন বকেয়া ভাড়া মিটিয়ে দেবে!"
"মিটিয়ে দিয়েছি। জিজ্ঞেস করে নাও তোমার ঠাকুরমাকে।"
বিজন থতমত খেয়ে গেল। ব্যাপার কী! দুর্গাবাড়ির ভাড়াটেরা কেউই নিয়মিত ভাড়া দেয় না, কারও ছ'মাস, এক বছর, অনেক ফ্যামিলির দেড় বছরের উপর ভাড়া বাকি পড়ে আছে। রতন জ্যেঠার যা আর্থিক অবস্থা, বেশিদের দলেই থাকার কথা। নতুন ভাড়া বাড়ির অ্যাডভান্স, দুর্গাবাড়ির ডিউ, সব একসঙ্গে মেটাচ্ছে মানে, ভালই টাকা এসেছে হাতে। সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনের শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে আছে বামুনবুড়ি। চেহারায় নিরুপায়, হতাশভাব। চোখের ইশারায় বিজন তাকে ভিতর বাড়িতে যেতে বলে, নির্দেশমতো বামুনবুড়ি সদরের দিকে এগোয়। ওয়র্কশপের বারান্দায় সাইকেল তুলে বামুনবুড়ির ঘরের সামনেটা দেখে বিজন, বাইরে নেই, দরজা খোলা। ঘরে ঢুকেছে। বারান্দা পেরিয়ে বিজন বামুনবুড়ির ঘরে আসে। খাটে ঝিম মেরে বসে আছে বুড়ি। বিজন জানতে চাইল, "ক'মাসের ভাড়া বাকি ছিল ওদের?"
"বছর দেড়েকের। সব মিটিয়ে দিয়েছে আজ সকালে। দরজায় নতুন তালাও মেরেছে।"
বিজন ফের জিজ্ঞেস করল, "কী মনে হচ্ছে, এত টাকা পেল কোথায়?"
বামুনবুড়ি বলল, "কোথায় আবার, নির্ঘাত প্রোমোটার একলপ্তে বেশি কিছু টাকা দিয়েছে উঠে যাওয়ার জন্য। টোপটা গিলল রতন। ওর দেখাদেখি আরও অনেকেই হয়তো গিলবে।"
"কত টাকা নিয়েছে, কিছু জানতে পেরেছ?"
বিজনের প্রশ্নে দু' পাশে মাথা নাড়ল বামুনবুড়ি, "না। তবে জানা যাবে ঠিকই। আজ না হয় কাল। তুই সেদিন মিটিংয়ে ওদের কত করে বোঝালি, ভবি ভোলার নয়। এককালীন কিছু টাকা দেখে, এতদিনের আশ্রয় ফেলে রেখে চলে গেল! ক'দিনের মধ্যেই ওই টাকা ফুরোবে। মোটর গ্যারেজে কাজ করে বিশ্বনাথের আর ক'পয়সা আয় হয়? দেখবি, বছর ঘুরতে না-ঘুরতে ওরা গাছতলায় ঘাঁটি গাড়বে।"
বড় করে একটা শ্বাস ফেলে বিজন বেরিয়ে এল বামুনবুড়ির ঘর থেকে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে উঠোনের ওপারে রতন জ্যেঠার ঘরের দিকে তাকাল। তালা মেরেছে, এখনও চৌকাঠে গত লক্ষ্মীপুজোর আবছা আলপনার দাগ!

পবন তেওয়ারির চাকরিটা ছেড়েই দিল বাপি। ঝগড়াঝাঁটি করে ছাড়েনি। কিছুক্ষণ আগে মাইনেটা নিয়ে বলেছে, কাল থেকে আর আসছে না। অবাক হননি পবনবাবু।
চাকরি ছাড়ার আভাস গত কিছুদিন ধরেই দিয়ে যাচ্ছিল বাপি। কাজ ছাড়ার আসল কারণটাও পবনবাবু জানেন। ক'দিন আগেই বাপি বুঝিয়ে দিয়েছে। বাপি যদি মাইনে না নিয়ে চাকরি ছাড়ার কথা বলত, ছুতোনাতায় টাকাটা আটকে রাখত পবনবাবু। শেষদিন হাত চলছিল না ঠিকমতো। এতদিন ধরে ব্যবহার করা সিল্ক স্ক্রিনের টেবিল, ফ্রেম, ব্রাশ যেন বলছিল, কেন আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ বাপি? আমরা কী দোষ করলাম। তোমার হাতের ছাপ আমাদের শরীরে। আবার নতুন কে আসবে, কেমনভাবে আমাদের চালাবে কে জানে...ওদের ওই কথাগুলো বাপির হাতে স্পিড আসতে দিচ্ছিল না। বাপি মনে-মনেও কোনও উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেনি। ও তো জানে, আসলে এই কথাগুলো ওরই মাথা থেকে উঠে আসছে! টানা প্রায় আট বছর কাজ করল এই অফিসে। আরও অনেক বছর হয়তো করত, যদি না পবনবাবুর লোভ, ডলির বেহায়াপনা সামনে এসে দাঁড়াত।
বাপি মালিকের ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পর সনাতন ঢুকেছিল মাইনে নিতে। পবনবাবু তাঁকে জানিয়ে দিলেন বাপির ডিসিশন। বস, খবরটা নিমেষে চাউর হয়ে গেল। ভীষণ অবাক হয়ে স্টাফরা একে-একে এসে বাপির কাছে জানতে চাইল, হঠাৎ এরকম একটা ডিসিশন নেওয়ার কারণ? বাপি সকলকেই উত্তর দিল কম কথায়, 'বেটার চান্স পেয়েছি।' মিলনদা বাপির কথা বিশ্বাস করেনি। পাকা মাথার লোক। এককালে একটা ইউনিয়নও প্রায় করেই ফেলেছিল কারখানায়। ও বলল, "এই তো ক'দিন আগে বলছিলি, তোকে প্রোমোশন দিয়ে ওয়র্কশপ ইনচার্জ করে দেবে। টাকাও বাড়াত নিশ্চয়ই। তুই কী এমন বড় চাকরি পেলি যে, এটা ছেড়ে দিচ্ছিস?" কথাগুলো শুনে যাওয়া ছাড়া বাপির কিছুই করার ছিল না। সত্যিটা জানলে কিছুই বলতে পারত না মিলনদা। খবরটা যদি ফাঁস করে দিত বাকি স্টাফদের কাছে, তখন খোরাকের পাত্র হত বাপি!
অফিস থেকে বেরিয়ে বাপি এখন রাস্তায়। মহাত্মা গাঁধী রোডে দাঁড়িয়ে কলেজ স্ট্রিট যাওয়ার জন্য ফাঁকা বাসের অপেক্ষায় আছে। বেশিক্ষণ দাঁড়ানো যাবে না। একটু পরেই ফার্স্ট শিফটের ছুটি হবে। বেরিয়ে আসবে স্টাফরা, ফের ধরবে বাপিকে। জানতে চাইবে, চাকরি ছেড়ে দেওয়ার আসল কারণ। বাস এসে দাঁড়াল সামনে। ফাঁকাই আছে। উঠে পড়ল বাপি। এই মুহূর্তে বেশি চাপাচাপির মধ্যে যেতে ইচ্ছে করছিল না বাপির। কেমন যেন ক্লান্ত লাগছে। আটবছর ধরে একটা জায়গায় কাজ করছে, রোজ বাড়ি ফিরে গেলেও, কিছু ক্লান্তি জমা হচ্ছিল লুকিয়ে। কাজটা ছেড়ে দিতেই সব যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছে! অবসন্ন হয়ে পড়লে কিন্তু চলবে না বাপির। কাজ সে সত্যিই জোগাড় করেছে। এখন চলেছে সেখানেই।
ডলিকে বিয়ে করা যে ভুল হয়েছে, টের পেতে বেশি সময় লাগেনি বাপির। কিন্তু ভুলটা যে কতটা, সেটা বুঝল ডলির মোবাইলে পবনবাবুর মিসডকল দেখে। মনে হচ্ছিল, কেউ যেন চোখ বেঁধে বাপিকে কুয়োয় ফেলে দিয়েছে! পবনবাবু ডলির মোবাইল নম্বর কীভাবে পেল, কিছুতেই মাথায় আসছিল না। সেই মুহূর্তে বুদ্ধিটাও গুলিয়ে গিয়েছিল! বিপদের গুরুত্ব বুঝে বাপি তখনই মাথাগরম করে ডলিকে কিছু বলেনি। খাওয়া সেরে অফিস বেরনোর জামাকাপড় পরতে-পরতে ডলিকে বলেছিল, "তোমার ফোনটা দাও। জেনারেলে সেট করে দিই। কাল থেকে তো সাইলেন্ট করা আছে। ফোন এলে বুঝতে পারবে না।"
ফোনটা নিয়ে এসেছিল ডলি। সেট করার আগে যেন প্রথমবার দেখল, এভাবে বাপি বলেছিল, "তিনটে মিস্‌ড কল। একটা দেখছি আমাদের মালিক পবনবাবুর। তোমার নম্বর কখন নিল?"
থতমত খেয়েছিল ডলি। তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বলেছিল, "ওই যে গো, তুমি যখন গাড়ি থেকে নেমে ওষুধ আনতে গেলে..."
সেদিনই কারখানায় গিয়ে বাপি পবনবাবুকে আকারে-ইঙ্গিতে জানিয়ে দিয়েছিল, ওর ধান্ধাটা সে ধরে ফেলেছে। মালিককে সরাসরি জিজ্ঞেস করে, "আমাকে কিছু বলার ছিল? ডলির মোবাইলে ফোন করেছেন দেখলাম।"
ডলির মতো অত তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলাতে পারেননি পবনবাবু। মুখ একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছিল! একটু সময় নিয়ে বোকা-বোকা হেসে বলেছিলেন, "আরে, নহি ভাই, গলতি সে

উহ নম্বর দবা দিয়া!”

বাপি আর কিছু বলেনি, যা জানানোর ছিল, হয়ে গিয়েছে। পরের দিন সকাল-সকাল অন্য কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। চাকরিতে প্রোমোশন দেওয়া, নারকেলডাঙার বাড়িতে বাপিদের থাকার ব্যবস্থা করা, সব কিছুর পিছনে ডলিকে নাগালের মধ্যে পাওয়া পবনবাবুর উদ্দেশ্য। লোকটার আসল রূপ চোখের সামনে চলে আসাতে, ওর কাছে কাজ করতে ঘেন্না হচ্ছিল বাপির। পুরো দোষ অবশ্য পবনবাবুকে দেওয়া যায় না। মাত্র একবার ডলিকে দেখেছে, বউভাতের দিন। ডলিকে না পছন্দ হওয়ারও কিছু নেই। যে-কোনও সুস্থ পুরুষ মানুষের ওকে ভাল লাগবে। ডলি যেটা করেছে, ওইটুকু সময়ের মধ্যে মালদার লোক দেখে, হাবে-ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে, তাকে পাওয়া সহজ। তাই না সাহস করে এত বড় প্ল্যান ফেঁদেছিলেন পবনবাবু! বাপি এখন ভাল মতো বুঝে গিয়েছে, ডলিকে কিছুতেই ঘরের বউ করে রাখা যাবে না। বাপিদের পরিবারে চুন-কালি সে মাখাবেই। যে করেই হোক, ডলিকে জীবন থেকে ঝেড়ে ফেলতেই হবে। কিন্তু ‘ফেলব’ বললেই তো আর ফেলা যায় না। একটা গেরস্থ বাড়ির বউ হয়ে ডলি নিজের ধান্দাবাজি চালাবে বলেই বিয়েটা করেছে। বদনামওয়ালা পাড়ায় বসে কারবার চালাতে গেলে মার্কামারা হয়ে যেত। ছোটলোক আর পুলিশ লোফালুফি করত ওকে নিয়ে। ভদ্র ঘরের বউ হলে বাজারে দামও বেশি পাবে। বড়লোকরা ভিড়বে, পুলিশের ঝুট-ঝামেলাও থাকবে না। সবকিছু বুঝে শুনেই বাপিদের ফ্যামিলিকে মুরগি করছে ডলির বাড়ির লোকজন। ডলি এখন বাপির আইনত স্ত্রী। ঘাড় ধরে বের করে দেওয়া যাবে না। সোজা থানায় গিয়ে কমপ্লেন করবে। ডলিকে ঝেড়ে ফেলতে হবে খুব

বুদ্ধি করে। প্ল্যান মোটামুটি ভাবা হয়ে গিয়েছে বাপির। জীবনের অনেক কিছু অদলবদল হয়ে যাবে। যার শুরুটা হল পবনবাবুর কাজটা ছেড়ে দেওয়া নিয়ে।

ক্রমশ

অলঙ্করণ: নির্মলেন্দু মণ্ডল

সানন্দা শব্দভেদ

সূত্র পা শা পা শি

১ স্বাভাবিক সময়ের পূর্বেই পেকেছে এমন। ৪ গলায় অনভিপ্রেত বোঝা। ৬ শান্তির জন্য মন্ত্রপূত জল যা উপাসকদের কল্যাণকামনায় তাদের দেহে ছিটানো হয়। ৮ বায়ুর অধিদেবতা। ১০ দৃষ্টি বা মনোবৃত্তি। ১১ গোত্রে জাত। ১২ এমন হাত মানেই খরচে হাত। ১৩ বিরুদ্ধে। ১৫ বিশ্রবা মুনির পুত্র। ১৭ কথায় আছে, ‘— বড় বালাই।’ ১৮ উপযুক্ত, শোভন। ১৯ বিষ্ণু। ২০ হাঙর। ২১ শ্রীকৃষ্ণ।

১	২		৩		■	৪			৫
■		■		■	■		■	■	
■		■	৬		৭		■	■	
■	৮	৯		■		■	১০		
১১			■	■	১২			■	■
■	■	১৩		১৪	■	■	১৫	১৬	
১৭			■		■	১৮			■
	■	■	১৯				■		■
	■	■		■	■		■		■
২০				■	২১				

গত সংখ্যার সমাধান

আ	প	দ	গ্র	স্ত	■	ম	ন্দা	কি	নী
পা	■	ল	■	■	ফা	■	■	না	লি
দ	■	ব	না	শ্র	য়	■	প	র	মা
ম	হ	ল	■	ম	দা	ল	সা	■	■
স্ত	■	■	র	ণ	■	ব	র	বা	দ
ক	ষ্ট	স	হ	■	অ	জ	■	■	লা
■	■	হা	স্য	ক	র	■	ম	রা	ই
আ	ল	স্য	■	ম	ণি	ম	য়	■	ম
দ	ক্ষ	■	■	ঠ	■	■	দা	■	লা
র	ণ	স	জ্জা	■	মা	না	ন	স	ই

সূত্র পাশাপাশি

২ প্রামাণিক লিখিত তথ্যাদি। ৩ ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। ৪ সাপের বিষ। ৫ ন্যায্য দাবিদার। ৭ জল দেয় এমন। ৯ পচে নরম হওয়ার ভাব। ১০ সেকালে রাজা-জমিদার বাড়িতে ঢুকতে হলে যা দিতে হত। ১৪ মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা। ১৬ বেল ফুল। ১৭ জানা বা অনুমান করা হচ্ছে এমন। ১৮ অল্পবয়স্ক ব্রাহ্মণ বালক। ১৯ রাজি নয় এমন।

ত্রিপদী

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

কলেজ স্ট্রিট, বউবাজারের বেশ ক'টা সিল্ক স্ক্রিন ফ্যাক্টরির কথা জানত বাপি। গত ক'দিন পাঁচটা কারখানায় ঘুরেছে। পবনবাবুর কারখানায় কাজ করে জেনে সকলেই ওকে রাজি হয়েছে নিতে। তবে মাইনে অত দিতে পারবে না। কলেজ স্ট্রিটে কাশীদার কারখানাতেই কাজের কথা পাকা হল। সাড়ে তিন হাজার দেবে। তার মানে রোজগার কমে গেল পাঁচশো, কমুক। এখন এসব নিয়ে ভাবার সময় নেই বাপির। একেবারে বে-রোজগেরে হয়ে গেলে ডলিদের সঙ্গে লড়াইটা ঠিক দিতে পারবে না। লড়াই ভাবা অবশ্য ভুল হল, বাপি এখন ময়দান ছেড়ে পালাতে পারলে বাঁচে। অবশ্যই মা'কে নিয়ে। নতুন চাকরির ঠিকানা এখন সে কাউকেই বলবে না। সেন্ট্রাল এভিনিউ ক্রস করে গেল বাস। এরপরই কলেজ স্ট্রিট। বাপি দরজার দিকে এগোল।

সন্ধের মুখে বাপি এসে নামল কানাইপুর স্টেশনে। বেশ দেরিই হল বাড়ি ফিরতে। মা নিশ্চয়ই চিন্তা করছে। এত দেরি হবে, ও আন্দাজ করতে পারেনি। ভদ্রতা দেখাতে বাপি আজ সশরীরে গিয়েছিল নতুন জায়গায়। গিয়ে ফেঁসে গেল। মালিক কাশীনাথ দলুই ওকে দিয়ে বেশ কিছুটা সময় ফ্রি-তে খাটিয়েও নিল! পবনবাবুর মতো বড় কারখানা এটা নয়। এখানে একটাই শিফ্‌ট। সকাল দশটা থেকে ছ'টা। আজকের খাটুনিটা কিন্তু জলে গেল। জয়েনিং ডেট ধরা হবে আগামীকাল থেকে। আশপাশের গোটাছয়েক স্টাফের মুখ দেখে আরও একটা জিনিস বুঝেছে বাপি। কাজে একটু বেশিই স্পিড দেখানো হয়ে গিয়েছে। স্টাফগুলো বেশ অবাক এবং সমীহর চোখে তাকিয়ে ছিল ওর দিকে! ছোট জায়গায় কাজ করে তো, এত স্পিড ওরা দেখেনি। বাপিকে ওদের তালেই কাজ করতে হবে, নচেত ওরা বাপিকে টিকতে দেবে না! কাশীদার কারখানা থেকে বেরনোর সময় বিকেলের আলো ভাল মতোই ছিল, মাকে ফোন করার কথা মনে হয়নি। বাসে, ট্রেনে আসতে-আসতেই সন্ধে নেমে গেল।

স্টেশনবাজার পেরিয়ে এসেছে। দু' পাশের দোকানগুলোয় আলো-ফালো জ্বললেও, রাস্তার ধারে সবজি বাজার, মাছ এখনও বসেনি। আরও রাতের দিকে বসে। এই বাজারে একটু সস্তায় জিনিস পাওয়া যায়। রেল গেটের ওপারে কানাইপুরের হিসেবি লোকেরা আর অফিস ফেরত পাবলিক এখানে বাজার করে। ক'দিন আগে বাপিও করত, এখন আর ইচ্ছে করে না। বাড়িতে কী রান্নাবান্না হবে, তা নিয়ে বাপির আর কোনও আগ্রহ নেই। ডলিই বাড়িটাকে সংসার হতে দিল না। পাড়ায় সবজি, মাছের ফেরিওয়ালা ঘুরে যায়, মা ওদের থেকে কিনে নিয়ে চালিয়ে দেয় রোজের রান্না।

আজ থেকে বাপির জীবন অন্য খাতে বইতে শুরু করল...কথাটা ভাবার সঙ্গে-সঙ্গে বাপি টের পায়, এতক্ষণ যে নিজের দেরি হওয়া নিয়ে মায়ের দুশ্চিন্তার

মস্তানমতো লোকটা তোর বউয়ের সঙ্গে বিশ্রী একটা ব্যাপার করল, বল

কথা ভাবছিল, সেটা আসল কারণ নয়। বাপিও চাইছে, তাড়াতাড়ি মায়ের কাছে পৌঁছতে। দু'জনে জোট বাঁধতে হবে। খুব বুদ্ধি করে বেরিয়ে আসতে হবে ডলির পরিয়ে দেওয়া ফাঁস থেকে। অনেক আলাপ-আলোচনা করার আছে মায়ের সঙ্গে। পবনবাবুর চাকরি

সঙ্গে বিশ্রী একটা ব্যাপার করল, বলা যাবে না সেটা, বাকি মেয়েগুলো খুব খিল্লি খাচ্ছিল। ওদের সঙ্গে হেসে-হেসে কথা বলছিল তোর বউ! বোঝা যাচ্ছিল, অনেকদিনের আলাপ। গাড়ি বেরিয়ে গেল হুস করে। সব মিলিয়ে কেসটা আমার সুবিধের

া যাবে না সেটা, বাকি মেয়েগুলো খুব খিল্লি খাচ্ছিল। ওদের সঙ্গে হেসে কথা বলছিল তোর বউ!

ছেড়ে দিয়ে নতুন চাকরিতে ঢুকেছে, এই খবরটাই মা এখনও জানে না। বড় রাস্তা ছেড়ে পাড়ার গলিতে ঢুকতে যাবে বাপি, কে যেন নাম ধরে ডাকল। কেমন একটা টেনশনওয়ালা ডাক! ঘাড় ফেরায় বাপি, মিষ্টির দোকানের কচি ডাকছে। বেরিয়ে আসছে দোকান থেকে। নিশ্চয়ই জরুরি কোনও দরকার, নয়তো দোকান থেকে বেরত না। বোঝা যাচ্ছে না দরকারটা কার, বাপির না কচির?

সামনে এসে দাঁড়িয়েছে কচি। চোখ-মুখ সিরিয়াস। আশপাশে কেউ নেই, তবু গলা নামিয়ে বলল, "তোকে একটা কথা বলার আছে। দোকানে ডেকে পাঁচজনের সামনে বলার মতো নয় বলে বেরিয়ে এলাম।"

"কী কথা?" কপালে ভাঁজ নিয়ে জানতে চাইল বাপি।

"তোর বউয়ের ব্যাপারে," বলে থেমে গেল কচি।

বাপি প্রমাদ গুনল! ডলি হয়তো কচিকে লাইন-ফাইন মেরেছে! সাদাসিধে ছেলে কচি, একসময় বাপির সঙ্গে খুবই বন্ধুত্ব ছিল। বন্ধুর বিপদে সতর্ক করতে এসেছে। বাপি জিজ্ঞেস করল, "আমার বউয়ের ব্যাপারে কী?"

কচি বলতে শুরু করল "বিকেলের দিকে বুঝলি, এই চারটে নাগাদ হবে। একটা নীল মারুতি ভ্যান এসে দাঁড়াল দোকানের সামনে। গাড়িতে ড্রাইভার ছাড়া একটা মস্তান টাইপের লোক, চারটে মেয়ে। মেয়েগুলো গেল তোদের বাড়িতে, তোর বউকে নিয়ে এসে গাড়িতে বসল। মস্তানমতো লোকটা তোর বউয়ের

লাগেনি। মনে হল, তোকে বলা দরকার।"

কথাগুলো শুনতে-শুনতে মাথা নিচু করে নিয়েছিল বাপি। কচির বলা শেষ হওয়ার একটু পরে মুখ তুলে বলল, "বলে ভালই করলি। বউ নিয়ে বেশ ঝামেলায় আছি। দেখছি, কী করা যায়।"

"যদি কোনও হেল্প লাগে বলিস। বলে কচি।"

অস্ফুটে 'বলব' বলে বাড়ির উদ্দেশে পা বাড়ায় বাপি। কচির দেওয়া খবরে বাপি যে খুব আশ্চর্য হয়েছে, তা নয়। এরকম ঘটনা ডলি আরও অনেক ঘটাবে। বাড়িতে শুঁটকি মাছ রান্না হলে পাড়ায় যেমন গন্ধ ছড়ায়, ডলির স্বভাবটাও সেভাবে জেনে যাবে সকলে। শত চেষ্টা করেও বাপি চাপা দিতে পারবে না। এই লজ্জা, অপমান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রেহাই পেতে হবে। সত্যি বলতে কী, ডলি বাড়ি নেই জেনে বাপি একটু স্বস্তিবোধ করছে। নিজের প্ল্যান নিয়ে মায়ের সঙ্গে নিশ্চিন্তে কথা বলা যাবে। ডলি থাকলে কথাগুলো লুকিয়ে-চুরিয়ে বলতে হত।

দিদিকে দরজা খুলতে দেখে অবাক হল বাপি, "তুই কখন এলি?"

"এই তো ঘণ্টাখানেক হল। তোর দেরি হবে, মাকে বলে যাসনি? চিন্তা করছে মা!"

কথার উত্তর না দিয়ে টিফিন নিয়ে যাওয়ার ব্যাগটা স্বপ্নার হাতে দিল বাপি। ব্যাগটা বাপির ঘরে রেখে মাঝের ঘরে ফিরে এল স্বপ্না। ফ্যানটা চালিয়ে দিল। হাওয়ায় পুরনো দিনের গন্ধ। আজ অনেকদিন পর বাড়িতে তারা তিনজন। সে, মা, বাপি। ডলি নেই। ওর জন্য ভারী হয়ে থাকে বাড়ির বাতাস। স্বপ্নার কল্পনা করতে

ইচ্ছে করে, বাপির যেন বিয়ে হয়নি। মাঝের সময়টা একটা দুঃস্বপ্ন!

গামছায় মুখ হাত মুছতে-মুছতে ফিরে এল বাপি। বাপির জন্য গ্লাসে জল নিয়ে এসেছে মা, "ডলি বাড়ি নেই।"

"জানি," গ্লাস নিয়ে নির্বিকারে জল খেতে থাকে বাপি, "বাড়ি ঢোকার আগে মিষ্টির দোকানের কচি বলল, 'একটা মারুতি এসেছিল, ডলি আর ওর বন্ধুরা মিলে কোথাও একটা চলে গেল।'"

সরমা ছেলের হাত থেকে জলের গ্লাস নিয়ে বলল, "আমাকে বলল, 'সিনেমা যাচ্ছি।' দলের একটা মেয়ে ডলিকে বলল, 'যা ড্রেস দিয়েছিস, স্টেজ কাঁপিয়ে দিবি'...আসলে কোথায় গেল, সেটা তো জানা দরকার?"

'স্টেজ' ব্যাপারটা যোগ হল ডলির বাইরে যাওয়ার সঙ্গে। কোথাও নাচতে-গাইতে গেল কি ডলি? গান সেভাবে কখনও গাইতে শোনেনি বাপি। এফ এম-এর গানের সঙ্গে নাচে, মায়ের কাছে শুনেছে। তবে এসব ভেবে এখন আর কোনও লাভ নেই। যে পাড়ায় থেকে বড় হয়েছে ডলি, কোথাও শুতে না গিয়ে, নাচতে গাইতে যাওয়া অনেক ভাল ঘটনা! বাপি স্বপ্নার দিকে তাকাল। একটু সময় নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোর জন্য জামাইবাবু যে ঘরটা ভাড়া নিয়ে ছিল, আছে এখনও?"

প্রশ্নের উদ্দেশ্য ধরতে না পেরে ভুরু জোড়া কাছাকাছি হল স্বপ্নার, "আছে। কেন বল তো?"

"ডলি যখন এভাবে বাইরে বেরতে শুরু করেছে, আবারও বেরোবে। সেরকম সময় আমি আর মা এবাড়িতে তালা লাগিয়ে তোর ওই ভাড়া বাড়িতে উঠে যাব। আমাকে চাবি দিয়ে রাখিস। ওবাড়ির মালিককে জানিয়ে দে, আমরা যে-কোনওদিন যেতে পারি।"

কথাগুলো মন দিয়ে শুনে স্বপ্না বলল, "এবাড়িটা পুরোপুরি ছেড়ে দিচ্ছিস না কেন? তোরা ফিরে এলে ডলিও ফিরে আসবে।"

"আমার মনে হয় না। কিছুদিন বাপের বাড়ি থাকলে ও আবার আগের লাইনে ফিরে যাবে। সংসারে থাকার চরিত্র ওর নয়। এই ক মাসে সেটা নিজেও বুঝে গিয়েছে। ওর বাপের বাড়ির লোক প্রথম দিকে কয়েকবার এবাড়িতে এসে বাড়িওয়ালার উপর চোটপাট করবে। জানতে চাইবে আমাদের ঠিকানা। বিজয়কাকাকে একটু শক্ত থাকতে বলব। কাকা যেন বলে দেয়, আমরা বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছি, কোথায় গিয়েছি জানে না। পাড়ার লোকও আমাদের দিকেই থাকবে। খুব বেশি ঝামেলা করতে পারবে না।"

বাপির বলা শেষ হলে স্বপ্না বলল, "কেন মিছিমিছি বিজয় কাকার উপর ঝামেলা চাপাচ্ছিস? ছেড়েই দে না এ বাড়িটা।"

অন্যমনস্ক গলায় বাপি বলল, "ছেড়ে দিতে কেমন যেন লাগছে। জন্ম থেকে আছি, বাড়িটা যেন নিজেদের হয়ে গিয়েছে। মায়েরও ভাল লাগবে না এই পাড়া ছেড়ে থাকতে। এত কম টাকায় এরকম বাড়ি আর কোথাও পাব না। খুব সমস্যা বুঝলে তখন না হয় অন্য ডিসিশন নেওয়া যাবে।"

ক্রমশ

অলঙ্করণ: নির্মলেন্দু মণ্ডল

সানন্দা শব্দভেদ

সূত্র পা শা পা শি

১ নরকপালধারী ও শ্মশানবাসী বামাচারী তান্ত্রিকবিশেষ। ৪ ভ্রমর, মৌমাছি। ৭ অনুচ্চ শব্দে ক্রমাগত হাসির শব্দ। ৮ লালন করা হয়েছে এমন। ১০ রীতি বা নিয়ম। ১১ কাজল তৈরি বা রাখার পাত্র। ১৩ স্বামী। ১৪ জমির সীমানা নির্দেশক বাঁধ। ১৬ সারি, পঙক্তি। ১৭ নতুন। ১৮ একই কালের বা সময়ের। ২০ সমবেদনা। ২১ শিখধর্মের প্রবর্তক। ২৩ শ্রীকৃষ্ণ। ২৫ মধুর অস্ফুট শব্দ। ২৬ মত্ততাজনিত কলধ্বনিকারী।

১		২	৩	■	৪		৫		৬
	■	৭				■		■	
৮	৯		■	■		■	১০		
■		■	১১			১২		■	■
১৩		■		■	■		■	১৪	১৫
১৬		■		■	■		■	১৭	
■	■	১৮		১৯			■		■
২০			■		■	■	২১		২২
	■		■	২৩		২৪		■	
২৫					■	২৬			

গত সংখ্যার সমাধান

অ	কা	ল	প	ক	■	গ	ল	গ্র	হ
■	গ	■	রে	■	■	র	■	■	ক
■	জ	■	শা	ন্তি	জ	ল	■	■	দা
■	প	ব	ন	■	ল	■	ন	জ	র
গো	ত্র	জ	■	■	দ	রা	জ	■	■
■	■	ব	না	ম	■	■	রা	ব	ণ
গ	র	জ	■	য়	■	মা	না	ন	■
ম্য	■	■	না	রা	য়	ণ	■	ম	■
মা	■	■	রা	■	■	ব	■	ল্লি	■
ন	ক্র	রা	জ	■	চি	ক	ন	কা	লা

সূত্র পা শা পা শি

১ মাথা মোটা মাছ। ২ লেখা হয়েছে এমন। ৩ বীজ থেকে জাত উদ্ভিদের প্রথম অবস্থা। ৪ মিহি ও নরম সুতিবস্ত্রবিশেষ। ৫ অতিশয় মিষ্টতা। ৬ দৃঢ়, মজবুত। ৯ এক ভাষার লিপিকে অন্য ভাষার লিপিতে লিখন। ১১ করণীয় কাজের ক্রমানুযায়ী তালিকা। ১২ প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে এমন। ১৩ সেতার ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের চাবি। ১৪ অন্যমনস্ক। ১৫ অতি অল্প অংশ। ১৮ হ্যাঁ-বোধক। ১৯ কৃতিত্ব, বাহাদুরি। ২০ এই সন্তান গর্ভজাত নয়। ২১ ঝগড়ার দেবতা। ২২ পদ্ম। ২৪ নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস।

চিপ

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

দু'বাটি মুড়ি মাখা নিয়ে ঘরে ঢুকল সরমা। ছেলে-মেয়ের হাতে বাটি দু'টো ধরিয়ে বলল, "বিজয়কে ডাকি? ওর সঙ্গে একটু আলোচনা করে নিলে হয় না? এখান থেকে যাওয়ার ব্যাপারে বিজয়ের অনেক হেল্প লাগবে। ও রাজি হয় কি না, সেটাও দেখতে হবে তো?"

"ডাকো," বাপি মুড়ি মাখায় বাদাম খুঁজতে থাকে। আসলে খোঁজে ডলির গন্তব্য। কোথায় যেতে পারে ডলি? আশপাশের অবাঙালিদের মধ্যে বিয়ে করতে যাওয়ার সময় প্রসেশন দেখেছে বাপি। সেখানে নাচাগানা হয়। তবে বাপি যেসব প্রসেশন দেখেছে, সেখানকার স্ট্যান্ডার্ড খুব লো, হিজড়েরা নাচে। বড় লোকদের বিয়েতে কেমন হয়, কে জানে! একগাদা আলোর মাঝে ডলি কি এখন কোনও রাস্তায় নাচছে? ভাবতে-ভাবতে বাপির মুখে অন্ধকার নেমে আসে।

রামকিশোরদার ধাবায় (এখন যার নাম 'লুক আউট') ক্রমশ কাস্টমারের ভিড় বাড়তে শুরু করেছে। বাইরে সন্ধে নামছে বোধ হয়। অমিতেশ একা ধাবায় এসেছে। পিছনে ঝিলধারে বসেনি, এয়ারকন্ডিশনড বার-রেস্তরাঁ এরিয়ায় বসেছে। উদ্দেশ্য, এখানকার দেওয়ালে টাঙানো একাকলে নিজেরই করা উডকাটটা আরও একবার মন দিয়ে দেখা। থামে সিমেন্টিং করে লাগানো আছে কাজটা। অমিতেশ বসে আছে উডকাটের মুখোমুখি টেবিলে। আগের দিন এসেছিল কুনাল, বিজনের সঙ্গে। ভাবতে পারেনি, সেই কতদিনের পুরনো কাজটা আবার এভাবে দেখতে পাবে! হারিয়ে যাওয়া প্রেমিকার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার মতো! হয়তো তার চেয়েও বেশি। প্রেমিকার বয়স বাড়বে, শিল্পকর্মটির বাড়বে না। রামকিশোরদা সযত্নে এবং খুব গুরুত্ব সহকারে কাজটার রক্ষণাবেক্ষণ করেছে। তার পিছনে যেমন ব্যবসায়িক কারণ আছে, আন্তরিকতাটাকেও উপেক্ষা করা যায় না। বাজারচলতি অনেক ধরনের উডকাট, টেরাকোটা টালি পাওয়া যায়, যা দিয়ে অনায়াসে বার এরিয়াটা সাজাতে পারত। তা না করে, কেবলমাত্র অমিতেশের কাজটা রাখার পিছনে এক ধরনের মমতা কাজ করেছে। বারের ইন্টিরিয়র ডেকরেশন খুবই সোজা-সরল, কোনও ধরনের আর্ট মেটেরিয়াল এখানে মানায় না। অমিতেশের কাজটা প্রায় জোর করেই রাখা হয়েছে। বোঝাই যায়, রামকিশোরদার ইচ্ছেই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে, পছন্দ নয়। কাজটা কতটা উন্নত মানের, এ ব্যাপারেও রামকিশোরদার কোনও ধারণা থাকার কথা নয়। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, কাজটা নেহাত ফেলনা গোছের হয়নি, অনেকদিন পর নিজের করা উডকাটটা দেখে মালুম হয়েছিল অমিতেশের। এখন তার যা স্কিল, ওই সূক্ষ্ম এবং একই সঙ্গে দৃঢ় কাটিং সে করতেই পারবে না। তার একটা কারণ, দীর্ঘদিন কোনও উডকাট করেনি। পরের কারণ, এই সহজ-সরল অথচ গভীর আবেদনময় চিত্রকল্প ইদানীং তার মাথায় আসে না!

ইতিমধ্যে ফোনে নন্দার সঙ্গে বারকয়েক কথা হয়েছে। জিজ্ঞেস করেছে, "কলেজের চাকরিটার কী হল?" অমিতেশ বলেছে, "হয়নি। অন্য চাকরির চেষ্টা

ইতিমধ্যে ফোনে নন্দার সঙ্গে বারকয়েক কথা হয়েছে। জিজ্ঞেস করেছে,

করছি।” কোনও ধরনের উদ্বেগ প্রকাশ করেনি নন্দা। একবারও জানতে চায়নি, কবে ফিরছে সে! কথা হয়েছে দুই ছেলে, পিয়াল-তুতুলের সঙ্গেও। তারাও বলেনি, কবে আসবে? নন্দা নিশ্চয়ই বারণ করে দিয়েছে প্রশ্নটা করতে। অমিতেশকে নিজের মতো থাকতে দিতে চেয়েছে। অ্যাড এজেন্সির চাকরি করে অমিতেশের কমার্শিয়ালিটি কম, সহজে বিক্রি হতে চায় না। তারপর ইদানীং আঁকতেই পারছে না। গোটাচারেক পেন্টিং বাঁধানো অবস্থায় দিল্লির বাড়িতে রাখা আছে। ওগুলো এগজিবিশনে যায় আর ফিরে আসে। নিজের ছবি শেষ কবে বিক্রি হয়েছে, অমিতেশ মনে করতে পারে না। নন্দার ছবি যে টুকটাক বিক্রি হয়, ব্যাপারটা বেশ

“কলেজের চাকরিটার কী হল?” অমিতেশ বলেছে, “হয়নি। অন্য চাকরির চেষ্টা করছি।”

না আঁকতে পারার অস্থিরতা নন্দা ভালমতোই উপলব্ধি করেছে। অমিতেশ কানাইপুর আসার পর থেকে প্রায় এক সপ্তাহ নন্দা কোনও ফোন করেনি। পাছে অমিতেশের ভাবনার জগতে কোনও ব্যাঘাত হয়। এদিকে অমিতেশও এমন ঘোরের মধ্যে ছিল, দিল্লির বাড়ির কোনও খোঁজখবরই নিত না। নন্দা অমিতেশের খবর ঠিকই নিয়েছে। এবাড়িতে ফোন করে। মাঝে ক'দিন আঁকার জন্য যখন খেপে উঠেছিল অমিতেশ, নিজের ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে কাগজে, ক্যানভাসে একের পর এক ড্রয়িং অ্যাটেম্পট করে চলেছে, কিছুটা করেই বাতিল করে দিচ্ছে কাজ, নাওয়া-খাওয়ারও ঠিক নেই, তখন বাড়ির লোকই ভয় পেয়ে সম্ভবত ফোন করেছিল নন্দাকে। তারপরই নন্দা ফোন করে অমিতেশের মোবাইলে। এবাড়ি থেকে যে ফোন গিয়েছে, সেটা একেবারেই বুঝতে দেয়নি। সাধারণ সাদামাঠা কথা চলাচল হল। কালকেরটা বাদ দিয়ে গত সবক'টা ফোনে নন্দা আভাস ইঙ্গিতে আশ্বস্ত করেছে, অমিতেশের অবর্তমানে দিল্লির সংসার মোটামুটি স্বাভাবিক চলছে। ওদিকের ভাবনা এখন না ভেবে অমিতেশ আঁকায় মন দিক। গতকালের ফোনটাও নন্দার হিসেবে অত্যন্ত নিরীহ ছিল। বেচারি জানতেই পারেনি, ওর দেওয়া খবরগুলো কতটা নাড়িয়ে দিয়েছে অমিতেশকে। নন্দা ভেবেছিল, কথাগুলো জানলে অমিতেশ আরও রিল্যাক্সড হয়ে আঁকায় মন দেবে। খবরটা হল, নন্দার একটা পেন্টিং বিক্রি হয়েছে তিন লাখ টাকায়! এর আগেও নন্দার ছবি বেশ ক'টা বিক্রি হয়েছে, কিন্তু এত দাম কখনও ওঠেনি। লাস্ট একটা ছবি ৭০ হাজারে বিক্রি হয়েছিল। অমিতেশের ছবিতে উপভোগ করে অমিতেশ। বাড়ির চারজন মিলে কোথাও খেতে যাওয়া হয় অথবা ছোট কোনও টুর। শখের কোনও গ্যাজেট কেনা হয়। কিছু টাকা জমে যায় নন্দার অ্যাকাউন্টে, ক'টা দিন একটা খুশির পরত লেগে থাকে নন্দার শরীরে। সব মিলিয়ে সেই দিনগুলো আনন্দেই কাটে। নন্দার সাফল্যে অমিতেশ কোনও ধরনের কমপ্লেক্সে ভোগে না। সে জানে নন্দার ছবি উৎকৃষ্ট না হলেও, বিক্রয়যোগ্যতা আছে। নন্দার এই প্রাপ্তি অত্যন্ত স্বাভাবিক। তা বলে তিন লাখে একটা ছবি বিক্রি হয়ে যাবে নন্দার, সুদূর কল্পনাতেও ছিল না অমিতেশের! যে-ছবিটা বিক্রি হয়েছে, কমপ্লিট অবস্থায় দেখেছে অমিতেশ। বেশ বড়-সড় অয়েল পেন্টিং, প্রচুর কালার, শেডস, নিখুঁত পার্সপেক্টিভ, কম্পোজিশন। একটা জমজমাট ব্যাপার আছে। যদিও সেটা বিষণ্ণতার দৃশ্য। কিন্তু জমাটি বিষণ্ণতা! ঠিক এই কারণেই শিল্পকর্মটি উচ্চাঙ্গের হয়ে ওঠেনি। তবে চোখ টানে তো বটেই। ছবিটার সম্বন্ধে নিজের মতামত নন্দাকে জানিয়েছিল অমিতেশ। সমালোচনাটা একবাক্যে মেনে নেয় নন্দা। সেই ছবিটাই এত দামে বিক্রি হয়ে অমিতেশকে যেন ভুল প্রমাণ করে দিল! ছবির দৃশ্যটা এরকম, পুরাকালের যুদ্ধক্ষেত্র। ভারী নির্জন আবছা অন্ধকার। ইতি-উতি ছিন্নভিন্ন রথ। ঘোড়া উধাও, কোনও সৈনিক নেই। এক সেনা অধিনায়ক খসে পড়া শিরস্ত্রাণের পাশে আহত অবস্থায় তীব্র যন্ত্রণা নিয়ে অপেক্ষা করছে মৃত্যুর। অন্ধকারের আড়ালে ওত পেতে লুব্ধ শিয়াল, শকুনি। দূরে রংমশাল শোভিত শিবির। বোঝাই যায়, ওটা বিজয়ী পক্ষ। ছবিটা সত্যিই অনেকক্ষণ ধরে দেখার মতো। দেখা শেষ করে অমিতেশ

জানতে চেয়েছিল, "কোন যুদ্ধের ছবি?" "কুরুক্ষেত্রের," বলে নন্দা জিজ্ঞেস করেছিল, "আহত লোকটা মহাভারতের কোন ক্যারেক্টর বলতে পারবে?" আরও খানিকক্ষণ ছবিটা খুঁটিয়ে দেখেও বলতে পারেনি অমিতেশ। নন্দা সামান্য হতাশ হয়ে বলেছিল, "ছবিটাকে নিয়ে এই হয়েছে মুশকিল। মহাভারতটা মন দিয়ে পড়া না থাকলে ক্যারেক্টরটা লোকে চিনতে পারবে না। এটা দুর্যোধনের মৃত্যুর সময়কার ছবি।" চরিত্রর নাম জানার পর ছবিটা আরও ভাল লেগেছিল অমিতেশের। একজন দাম্ভিক, দুরাচারীর কী করুণ পরিণতি! কিন্তু চরিত্রের পরিচয় না জানা অবধি দর্শকের কাছে ছবিটা ততটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে না। ওই ক্যানভাসেই এমন কিছু আঁকতে হবে, যা দিয়ে দুর্যোধনকে নির্দিষ্ট করা যায়। কী আঁকা যায়, তা নিয়ে ক'দিন ভেবেছে অমিতেশ। অফিসের কাজের চাপে একসময় ভুলেও গিয়েছে ছবিটার কথা। ফোনে নন্দা বিক্রির খবরটা দেওয়ার পর ছবিটা ফের চোখে ভেসে উঠেছিল কাল। অমিতেশ জিজ্ঞেস করে, "তুমি কি ছবিটার উপর আর কোনও কাজ করেছিলে?"

নন্দা বলল, "না।"

"যে কিনল, সে কি দুর্যোধনকে চিনতে পেরেছে?"

নন্দা হাসতে-হাসতে বলল, "এখন আর চেনার জন্য কষ্ট করতে হচ্ছে না। ছবিটার টাইটেল দিয়েছি 'দুর্যোধন'!"

আর চাকরির মাথাব্যথা নিতে হবে না। টাকাকড়ি ভাল দেবে এরা। সব ব্যাঙ্কে ফেলে দিয়ে ইন্টারেস্টের টাকায় সংসার চালাব।" খুবই উৎসাহব্যঞ্জক প্রস্তাব। কিন্তু যে মানুষটা মাসের পর মাস চেষ্টা করেও একটা সম্পূর্ণ ছবি এঁকে উঠতে পারেনি, হঠাৎ টাকার আশ্বাসে তার পক্ষে কি আঁকা সম্ভব? নন্দাকে অবশ্য একথা বলেনি অমিতেশ, বলেছে, "দেখি, কতটা কী করতে পারি।" নন্দার দেওয়া খবরগুলোর রি-অ্যাকশন খুব ঢিমেতালে শুরু হল। যেভাবে ধীরে প্ল্যাটফর্ম ছাড়ে গাড়ি, তারপর অস্থিরতা বাড়তে বাড়তে এখন চূড়ান্ত পর্যায়। অমিতেশ যেমন নিশ্চিত, তার পক্ষে এখনই পাঁচ-ছ'টা ছবি এঁকে ফেলা কোনওমতেই সম্ভব নয়। এটাও জানে, নন্দা টাকার উৎসাহে পর পর অনেকগুলো পেন্টিং নামিয়ে দিতে পারবে। কোনও কারণে ড্যানিয়েল যদি ছবিগুলো না-ও নেয়, একটাও পড়ে থাকবে না। ধীরে-ধীরে সব বিক্রি হয়ে যাবে। একবার যখন তিন লাখ দাম উঠেছে ওর ছবির, পরে আরও উঠবে। সত্যিই অমিতেশের আর চাকরি করার দরকার পড়বে না। তখন কী করবে অমিতেশ? সে যে আঁকতেও পারছে না! সে ক্রমশ অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে দিল্লির সংসারে। শুধু দিল্লির বাড়িতে কেন, সর্বত্র অমিতেশের অস্তিত্বের আর কোনও মূল্য থাকবে না। বউ-সন্তানদের প্রতি কোনও কর্তব্য থাকবে না তার। বাবা, মা, বোন তার কাছ থেকে কোনও কিছুই প্রত্যাশা করে না। তাহলে অমিতেশের বেঁচে থাকার মানে কী? ছটফটানিটা তীব্র আকার নিল তখন থেকেই। সেটা কাটাতে অমিতেশ ভাবতে শুরু করল তার পুরনো, ভাল সৃষ্টির কথা।

মেয়েটা দাঁড়াল টেবিলের সামনে। একটু ঝুঁকে এল, মুখের হাসিতে এখন আর চাপল্য নেই, মো

আর একটু হলেই সেলটা হাত থেকে পড়ে যাচ্ছিল অমিতেশের। বিশ্বাসই হচ্ছিল না নন্দার কথা! এ কী ব্লান্ডার করল সে! নিজের শিল্পকর্মকে এভাবে অপমান করা যায়? এত খেটেখুটে ছবিটা করার পর 'মানে' বোঝানোর জন্য ওই নামটা দিয়ে দিল? অমিতেশ নিশ্চিত, ওই নামের কারণেই ছবিটা অত দামে বিক্রি হয়েছে। দুর্যোধনকে ওভাবে মরতে দেখতে কে না চায়? যে কিনেছে, সে যুদ্ধক্ষেত্রের বিষাদময়তাকে তেমনভাবে খুঁটিয়ে দেখার আগেই চরিত্রের উপর আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। আড়ালে চলে গিয়েছে নন্দার ডিটেলের দক্ষতা, শ্রম। নন্দা এসব নিয়ে একেবারেই ভাবিত নয়। হয়তো মাথাতেই আসেনি পয়েন্টটা। হাতে গরম টাকা পেয়ে খুব খুশি। অমিতেশও চায়নি ওর আনন্দ মুহূর্তটা নষ্ট করতে। একথার পর নন্দা আর একটা ভাল খবর দেয়। যে গ্যালারিতে ওর ছবিটা বিক্রি হয়েছে, সেখানে এক জার্মান আর্ট কালেক্টরের সঙ্গে আলাপ হয়েছে নন্দার। 'কালেক্টর' কথাটা ভদ্রতা করা বলা হয়, এরা আসলে দালাল। একসঙ্গে অনেক ছবি কিনে রাখে, বাজারে চাহিদা অনুযায়ী বিক্রি করতে থাকে। ভদ্রলোকের নাম ড্যানিয়েল কোলার। থাকে মিউনিখে। এগজিবিশনে দুর্যোধনের ছবি ছাড়াও নন্দার আরও তিনটি পেন্টিং ছিল। ছবিগুলো দেখে এতটাই ইমপ্রেসড হয়েছেন ভদ্রলোক, নন্দার সঙ্গে আলাপ করে আরও ছবি দেখতে চান। নন্দা তাঁকে বাড়ি নিয়ে আসে। নিজের যে ক'টা ছবি বাড়িতে ছিল, সেগুলো এবং অমিতেশের চারটে কাজ দেখায়। অমিতেশের পেন্টিংয়ে সমান উৎসাহ দেখিয়েছেন ড্যানিয়েল। বলেছেন, নন্দার তো বটেই, অমিতেশের ছবি কিনতেও তিনি আগ্রহী। তবে একটা-দু'টো ছবি তিনি কেনেন না। একলপ্তে অনেকগুলো কিনলে ব্যবসায় সুবিধে হয়। ফোনে বিশদে সব জানিয়ে নন্দা বলেছিল, "তুমি দেখো না, ওখানে থেকে যদি কয়েকটা কাজ করে ফেলতে পার। তা হলে তখনই মনে পড়ে, রামকিশোরদাকে দেওয়া উডকাটটার কথা। কিছুদিন আগে এসেই দেখে গিয়েছে। যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য কাজ। আজ দুপুরে মাথায় চাপল, কাজটা ফেরত নিয়ে আসা যাক। কাজটা মোটেই পূর্ণ মর্যাদায় রাখা নেই। শুঁড়িখানা সাজানো হয়েছে। কাজটা বোঝার মতো কোনও মানুষ ওখানে যায় না। অমিতেশ এটাও জানত, উডকাটটা ফেরত চাইলেই পাওয়া যাবে না। নিজের কাজ হয়তো নিজেকেই কিনে নিতে হবে। সেই মতো ক্রেডিট কার্ড, চেকবুক নিয়ে বিকেলবেলা 'লুক আউট' এসে পৌঁছে ছিল অমিতেশ। রামকিশোরদার ছেলে কাউন্টারে ছিল, চিনতেও পারল অমিতেশকে। অন্য দুই বন্ধু মানে কুনাল, বিজন কেন এল না জানতে চাইল। অমিতেশ বলেছিল, "ওরা কাজে ব্যস্ত। আসবে পরে। আজ আমি একাই এলাম।"

"ভালই করেছেন," রামকিশোরদার ছেলে ইন্দ্রজিৎ জানতে চেয়েছিল, "আপনি তো ঝিলের ধারে বসবেন। টেবিল পরিষ্কার করতে বলি?"

এরপরই এখানে আসার আসল উদ্দেশ্যটা অমিতেশ বলে। একই সঙ্গে জানায় উডকাটটার বদলে সে টাকাও দিতে রাজি। রামকিশোরদার ছেলে যতটা সম্ভব সবিনয়ে প্রত্যাখান করল প্রস্তাব। বহু লোক ওই কাজটা কেনার জন্য তাকে টাকা অফার করেছে, সে দেয়নি। ওটা তার বাবার স্মৃতি। কিছুতেই কাউকে দিতে পারবে না।

অমিতেশ অসহায় কণ্ঠে বলেছিল, "কাজটা তো আমার করা। রামকিশোরদার কাছে একটা টাকাও নিইনি। এখন সেটা আমি কিনতে চাইছি। তাও পাব না?"

ইন্দ্রজিতের কাছে উডকাটটা নিছকই শোপিস। ওটার আর্ট ভ্যালু ও বোঝে না। খুবই নিরাশ হয়ে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে ছিল অমিতেশ। জিৎ মোলায়েম গলায় বলল, "আপনি ওটার কথা ভুলে যান। যদি

খুব ইচ্ছে করে দেখতে, চলে আসবেন এখানে। আপনার জন্য দ্য ডোর ইজ় অলওয়েজ় ওপেন।”

“আমি কি এখন কাজটা একবার দেখতে পারি?” অনুনয়ের সুরে বলেছিল অমিতেশ।

“হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কেন দেখবেন না? যান না, ওই এরিয়াটা এখন ফাঁকাই আছে। টেবিলে বসে পড়ুন। কিছু লাগলে ওয়েটারকে বলে দেবেন।”

সেই বিকেল থেকে উডকাটের সামনের টেবিলটায় বসে আছে অমিতেশ। তাকিয়ে আছে কাজটার দিকে আর ভেবে যাচ্ছে কত কী! এক পেগ হুইস্কি অর্ডার করেছিল প্রথমে। ধীরে-ধীরে খাচ্ছিল। গ্লাস শেষ হয়েছে, দিয়ে গিয়েছে ওয়েটার। এখন বোধ হয় ছ'নম্বর পেগ চলছে। ভারী-ভারী লাগছে মাথাটা। বেশি নেশা হয়ে গেলে প্রবলেম হবে বাড়ি ফিরতে। আসার সময় বাসে এসেছে অমিতেশ, ফেরার সময় বাস পাওয়া যাবে কি না, কে জানে! রাতের দিকে বাস কমে যায়। তলপেটে চাপ লাগছে, বাথরুম পেয়েছে। টয়লেটটা কোথায়? বারের চারপাশে চোখ বোলায় অমিতেশ। খুঁজে পায় না। এই মুহূর্তে সব টেবিলেই লোকজন। ভিড় যে হারে বাড়ছে, অমিতেশের টেবিলের ফাঁকা তিনটে চেয়ারে এখনই হয়তো লোক এসে যাবে। তখন আর বসে থাকার কোনও মানে হয় না। টয়লেটে যাবে বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় অমিতেশ। ওকে উঠে দাঁড়াতে দেখেই হয়তো ওয়েটার এসে দাঁড়িয়েছে পাশে। সামনে আলো ঝলমল স্টেজটা দেখিয়ে অমিতেশ জানতে চাইল, “ওখানে কী হবে এখন?”

“ডান্স হবে স্যার।”

বার এরিয়া জুড়ে চলতি হিন্দি গান বাজতে শুরু করেছে। গানের সুর বাজছে নিচু পর্দায়, বাদ্যযন্ত্র উঁচুতে। ড্রামের আওয়াজ সরাসরি বুকে এসে লাগছে। টয়লেট থেকে হালকা হয়ে বেরিয়ে এসে নিজের টেবিলের দিকে এগোতে যাবে, দেখে আলোকিত মঞ্চে এখন গোটাকয়েক মেয়ে। মিউজ়িক সিস্টেমের সুরের তালে তারা শরীর দোলাচ্ছে। অমিতেশ অবাক হয়, এ তো একেবারে মুম্বইয়ের ডান্স বার তুলে এনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে মনে হচ্ছে! মুম্বইয়ের মতো এখানেও ফ্লোরের সব মেয়েরা সমান উদ্যমে নাচছে না, সামনের তিন-চারজন বেশি অ্যাক্টিভ, বাকিরা পিছনে সুরের তালে আলতো করে শরীর দোলাচ্ছে। খানিক বাদে সামনের মেয়েরা বিশ্রাম নেওয়ার কারণে চলে যাচ্ছে পিছনের দিকে, এগিয়ে আসছে অন্য তিন-চারজন। অমিতেশের ভাল লাগা মেয়েটি একইভাবে সামনে পিছনে আসছে-যাচ্ছে। ও তাকে চোখ ছাড়া করছে না। মেয়েটিও অমিতেশের মুগ্ধতাকে চিহ্নিত করেছে। হাসছে মিটিমিটি। হাসির মধ্যে যৌন ইশারার বদলে মজা পাওয়ার ভাবটাই বেশি। নেশার কারণে কি না, কে জানে, মেয়েটাকে দেখা যেন ফুরোচ্ছে না অমিতেশের! গ্লাস ফাঁকা হতেই আর এক পেগ দিয়ে গিয়েছে ওয়েটার। নাচ যতক্ষণ চলবে, ততক্ষণ কি বসে থাকবে অমিতেশ? বাড়ি ফেরার কী হবে?

অমিতেশের হার্টবিট বাড়িয়ে দিয়ে এবার পছন্দের মেয়েটি স্টেজ ছেড়ে এগিয়ে আসছে। যেন পুকুর থেকে স্নান করে উঠে এল রাজহাঁস! মেয়েটিকে কী-ই বা দিতে পারে অমিতেশ! তড়িঘড়ি পার্স থেকে একশোর নোট বের করে হাতে ধরে থাকে। মেয়েটা দাঁড়াল টেবিলের সামনে। একটু ঝুঁকে এল, মুখের হাসিতে এখন আর চাপল্য নেই, মোহঘোর ভাব। হয়তো অভিনয়। ক্লিভেজ অনেকটাই দেখা যাচ্ছে। অমিতেশ টের পাচ্ছে, কপাল ঘেমে উঠছে তার! মেয়েটা এতটা সময় নিচ্ছে বা দিচ্ছে কেন? নোটটা দু' আঙুলে ধরে রেখেছে অমিতেশ। অবশেষে নিল। তবু যাচ্ছে না। টেবিলে দু'হাত কাছাকাছি রেখে বুকে চাপ দিয়ে প্রলোভিত করছে অমিতেশকে। বোঝা যাচ্ছে, মেয়েটা কিছু শুনতে চায়। ঠিক এই সিচুয়েশনে মুম্বইয়ের বার ডান্সারের সঙ্গে রাতের কন্ট্রাক্ট করে নিত কাস্টমার। সে ধরনের কোনও ইচ্ছের কথা ভাবতেই পারে না অমিতেশ। মেয়েটাকে কিছু না বলাটা খারাপ দেখাচ্ছে বলে অমিতেশ জিজ্ঞেস করে, “নাম কী তোমার?”

“ডলি।”

উচ্চারণ শুনেই বোঝা গেল, মেয়েটি বাঙালি। ছোট্ট ওই প্রশ্নটুকুর

হঘোর ভাব। ক্লিভেজ অনেকটাই দেখা যাচ্ছে। মেয়েটা এতটা সময় নিচ্ছে বা দিচ্ছে কেন?

প্রত্যাশাই যেন তার ছিল। অসম্ভব আবেদনময় মেয়েটার ফিরে যাওয়া, সরু নমনীয় কোমর, নিতম্বের অল্প কাঁপুনি, সামান্য ঝুঁকে থাকা পিঠ, হেলান ঘাড়... সব দেখতে-দেখতে অমিতেশের ভিতরে একটা অস্থিরতা তৈরি হয়। কানে বাজতে থাকে ছোট বাটালিতে কাঠ কাটার খুটখুট আওয়াজ। অমিতেশ বুঝতে পারে, মনে-মনে ডলিকে কাঠে খোদাই করে চলেছে। থামে লাগানো নিজের উডকাটটার দিকে তাকায়। কাজটা আর ততটা উল্লেখযোগ্য মনে হচ্ছে না। গ্লাসে পড়ে থাকা মদটুকু একচুমুকে মেরে দিয়ে অমিতেশ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে। একটা টাকাও নিল না জিৎ। আজকের মদটা পুরো ফ্রি। পরের বারটাও যে এরকম হবে, এতটা আশা না করাই ভাল। উডকাটটা ফেরত দিতে না পারার প্রায়শ্চিত্ত করল ইন্দ্রজিৎ। তবে অমিতেশের এখন আর কোনও আক্ষেপ নেই। ডলিকে দেখার পর থেকে সে ভাল মতোই বুঝতে পারছে, খুব তাড়াতাড়ি একটা কমপ্লিট কাজ নামাতে পারবে!

বার থেকে বেরিয়ে মেন রোডের পাশে দাঁড়িয়েছে অমিতেশ, এখন পর্যন্ত একটাও বাস চোখে পড়েনি। পরের পর চলেছে লরি, ট্যাঙ্কার, প্রাইভেট কার। অনেক রাত হল কি? হাতে ঘড়ি নেই, অভ্যেসটা চলে যাচ্ছে ক্রমশ। পকেট থেকে মোবাইল বের করে সময় দেখে অমিতেশ, পড়তে পারে না। রুমাল বের করে চশমাটা মুছে নিল। এবার পড়া যাচ্ছে, এগারোটা পনেরো। বাসের আশা না করাই ভাল। হেঁটেই বাড়ি ফিরতে হবে, রাস্তা কিন্তু অনেকটা। হাঁটতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে যায়, পা তো টলছেই, বারে-বারে চলে যাচ্ছে রাস্তার মাঝখানে। ধার ঘেঁষে হাঁটতেই পারছে না। অ্যাক্সিডেন্ট মনে হচ্ছে হবেই। পাশ দিয়ে হুস হাস করে চলে যাচ্ছে গাড়ি। এক-দু'জন ড্রাইভার গালাগালও দিল। তবু অমিতেশ নিজেকে সামলাতে পারছে না। এই মুহূর্তে আবার রাস্তার উপরে চলে যাচ্ছে, কে যেন কনুই ধরে টান মারল! ঘাড় ফেরাতে অমিতেশ দেখল ডলিকে, চোখে শাসন! হাত ছেড়ে দিয়েছে ডলি। নিমেষে উধাও হয়ে গেল। দৃষ্টিভ্রমে হেসে ফেলে অমিতেশ। হেঁটে যায় টলতে-টলতে। কেমন একটা ভয় গ্রাস করতে থাকে... আর হয়তো বাড়ি ফিরতে পারবে না। অমিতেশ যতটা সম্ভব সর্তক হয়ে হাঁটতে থাকে। খেয়াল করে, সে কাঁদছে! কেন কাঁদছে ঠিক মতো ঠাহর করতে পারে না। যে-কোনও মুহূর্তে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মরে যেতে পারে বলে, নাকি অল্প বয়সের আবেগটা লুপ্ত হয়ে যাওয়ার দুঃখে? অমিতেশকে হেডলাইটের চাবুক মারতে-মারতে চলে যায় লরি, বাস, প্রাইভেট কার।

ক্রমশ

অলঙ্করণ: নির্মলেন্দু মণ্ডল

সানন্দা শব্দভেদ

সূত্র পা শা পা শি

১ এই সন্তান গর্ভজাত নয়। ৩ তল পাওয়া যায় না এমন। ৫ সুন্দরী নারী। ৭ ঝলক বা বিস্ময়। ৯ পথে ডাকাতি। ১১ হ্রাস পাওয়া। ১৩ নির্মাণ। ১৫ উদ্ধারকারী। ১৬ আলংকারিক অর্থে জঘন্য স্থান। ১৭ মান্য। ১৮ কবিগানজাতীয় লোকসংগীত। ২০ মুরগিজাতীয় পাখি। ২৩ নেতা। ২৫ কখনও। ২৭ শূন্য থেকে ধরে নেওয়া। ২৮ অপরকে কর দেয় এমন। ২৯ ব্যয়। ৩১ ক্ষত। ৩৩ অল্প। ৩৫ নিবারণকারী। ৩৭ চকচকে। ৩৯ হাত। ৪০ সুন্দর। ৪১ অগ্নি।

১		২	■	৩		৪	■	৫	৬
	■	৭	৮		■	৯	১০		
১১	১২	■	১৩		১৪	■	১৫		
■	১৬			■		■		■	■
১৭		■	১৮	১৯		■	২০	২১	২২
২৩		২৪	■	২৫		২৬	■	২৭	
■	■		■		■	২৮			■
২৯	৩০		■	৩১	৩২		■	৩৩	৩৪
৩৫			৩৬	■	৩৭		৩৮	■	
৩৯		■	৪০			■	৪১		

গত সংখ্যার সমাধান

কা	পা	লি	ক	■	ম	ধু	ম	ক্ষি	কা
ত	■	খি	ল	খি	ল	■	ধু	■	য়ে
লা	লি	ত	■	■	ম	■	র	স	ম
■	প্য	■	কা	জ	ল	ল	তা	■	■
কা	ন্ত	■	র্য	■	■	বে	■	আ	ল
ন	র	■	ক্র	■	■	জা	■	ন	ব
■	■	স	ম	কা	লী	ন	■	ম	■
দ	র	দ	■	র	■	■	না	ন	ক
ত্ত	■	র্থ	■	দা	মো	দ	র	■	ম
ক	ল	ক	ল	নি	■	ম	দ	ক	ল

সূত্র পাশাপাশি

১ আকস্মিক বেগ। ২ চুল। ৩ কেশহীন। ৪ পৃথিবী। ৫ নিয়মিত ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান। ৬ সত্যজিৎ রায়ের ডাকনাম। ৮ সবুজ রঙের দামি পাথর। ১০ হাত দিয়ে মারামারি। ১২ সম্মানের যোগ্য। ১৪ বিখ্যাত। ১৭ বারণ। ১৯ রকে বসে আড্ডা দিতে অভ্যস্ত। ২১ তিলমিশ্রিত জল। ২২ নিষ্পত্তি। ২৪ জঘন্য আচরণ। ২৬ তীব্র ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ। ২৯ কয়লাখনির মধ্যে কর্মরত শ্রমিক। ৩০ এর দ্বারা পেনসিলের লেখা মোছা যায়। ৩২ জড়িত। ৩৪ মনের ক্রিয়া। ৩৬ যন্ত্র। ৩৮ অজয়, দামোদরকে যা বলা হয়।

ত্রিপটে

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

দুর্গাবাড়ির দালানে চলছে বিকট প্রহসন! এই সময় যদি বিজনের বিশেষ অতিথিটি চলে আসে, প্রেস্টিজ পাংচার হয়ে যাবে! দালানে বুলার বর ওঠবোস করছে। এরকমটাই শর্ত ছিল। বিধান দিয়েছিল বামুনবাড়ি, মানে বিজনের ঠাকুরমা। সেই শাস্তিদান পর্ব এখন চলছে দালানে। সমস্ত ভাড়াটে জমা হয়েছে। বাইরের লোককে এসব ঘটনায় এন্ট্রি দেয় না তারা। বিষয়টাকে ঠাট্টা হিসেবে দেখে না নিজেরাও। দালানে অত ভিড়, কিন্তু কোনও আওয়াজ নেই। গুরুত্বসহকারে শাস্তি পর্বটা দেখছে সবাই। বুলাকে নিয়ে খানিক উদ্বেগ সকলের মুখেই ছায়া ফেলে রেখেছে। ভাবছে, বুলাকে ছেলেটার সঙ্গে ছাড়া কি ঠিক হচ্ছে? বুলা বোধ হয় এখানেই ভাল ছিল। দুর্গাবাড়ির ভাড়াটেরা যেমন সামান্য কোনও ইসুতে পরস্পর ঝগড়া শুরু করে দেয়, তেমনই ইউনিটিটাও দেখবার মতো। একটু আগে ওয়র্কশপের বাইরে পা রেখে দেখে এসেছে বিজন। মহিলা পুরুষ কেউ উবু হয়ে বসে, কেউ বা দাঁড়িয়ে, দেওয়ালে হেলান দিয়ে নির্নিমেষে দেখে যাচ্ছে বুলার বরের ওঠবোস। এক-দু'জন শব্দ করে কাউন্ট করছে। বুলাকেও দেখা গেল, পায়ের কাছে কিটব্যাগ রেখে ছেলেকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। বুলার বরের যা চেহারা, এক হাজার ওঠবোস দেওয়ার পর বউকে নিয়ে আর বাড়ি ফিরতে পারবে না। সেই কথা বিবেচনা করে বামুনবাড়ি তাকে ইচ্ছেমতো রেস্ট নেওয়ার অনুমতি দিয়েছে। ছেলেটা পঞ্চাশ-ষাট'টা ওঠবোসের পর দাঁড়িয়ে জিরিয়ে নিচ্ছে একটু। তাতে আরও বেশি আশঙ্কিত হচ্ছে বিজন, ঘটনাটা কতক্ষণ গড়াবে, কে জানে! এদিকে বিজনের গেস্ট আসার সময় হয়ে এল। অতিথিটি হচ্ছে, বিজনের মেয়ে বুলানের বয়ফ্রেন্ড, যার সঙ্গে নাকি মেয়েকে কানাইপুরের রাস্তায় একত্রে দেখা যাচ্ছে। কৃষ্ণাও একদিন দেখেছে। মেয়েকে বকাঝকা করে জানতে চেয়েছে, ছেলেটার নাম, ঠিকানা। মেয়ে বলেনি। শুধু এটুকু বলেছে, সে ওর বন্ধু। এক কোচিংয়ে পড়ে। কৃষ্ণা এরপর দায়িত্ব দেয় বিজনকে, ছেলেটার নাম-ঠিকানা জোগাড় করতে হবে। জানতে হবে বাড়িঘর, ফ্যামিলি হিস্ট্রি। বিজন পড়েছিল অকুলপাথারে! যাকে সে চোখেই দেখেনি, খোঁজ কীভাবে শুরু করবে ভেবে পাচ্ছিল না। সবচেয়ে শর্টকাট রাস্তাটাই ধরেছিল, কৃষ্ণার অনুপস্থিতিতে মেয়েকে বলেছিল, "ছেলেটার সম্বন্ধে আমাকে সব বল। আমি তোর মাকে ম্যানেজ করে নেব। তোর কোনও চিন্তা নেই।" বুলান রাজি হয়নি কিছু বলতে। উল্টে বলেছিল, "তোমাকে বিশ্বাস নেই আমার। মায়ের ধ্যাতানি খেলে সব কথাই বলে ফেলবে!" বাবাকে এতটাই আন্ডার এস্টিমেট করে বুলান। ওকে দোষ দেওয়া যায় না। বাহ্যত বিজনকে দেখলে তেমনটাই মনে হয়, বউয়ের উপস্থিতিতে সদাই সন্ত্রস্ত। আসলে তা তো নয়, বিজনের প্রতি উচ্চারিত কৃষ্ণার প্রতিটি কথার মধ্যে ঝগড়ার প্ররোচনা থাকে। আপ্রাণ চেষ্টা করে বিজন তার থেকে নিবৃত্ত রাখে নিজেকে। এটা এক ধরনের নিঃশব্দ যুদ্ধ। কৃষ্ণার ফাঁদে পা দিয়ে ঝগড়া শুরু করে দেওয়া মানেই তো, ওকে

বোঝাই যাচ্ছে, বেশ নার্ভাস হয়ে আছে! প্রেমিকার বাবার সঙ্গে দেখা ক

জিতিয়ে দেওয়া। এই পলিটিক্স বুলান বুঝবে না।
বিজন এখন ঘুরে-ফিরে ভেবে যাচ্ছে, সায়নের, মানে বুলানের বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে কী-কী বিষয়ে কথা বলবে? একটু গম্ভীর হয়ে থাকতে হবে তো নিশ্চয়ই, কিন্তু কতটা? বেশি ডাঁট নেওয়াটাও বেমানান লাগবে। বিজনদের তুলনায় ছেলেটার বাড়ির অবস্থা অনেক উপরে। বিজনের গাম্ভীর্য দেখে মনে-মনে হাসতে পারে। ছেলেটাকে যদি আড়াল থেকেও একবার দেখে রাখতে পারত বিজন, ফেস করা নিয়ে এত ভাবতে হত না। এ ব্যাপারে একমাত্র হেল্প করতে পারে বুলান, জানাতে পারে সায়নের ধরন-ধারণ। কিন্তু সে যে বাবার সঙ্গে কিছুতেই চোখাচোখি করছে না। অভিমানে ভারী করে রেখেছে মুখটা। এমন সময় দরজার কাছ থেকে কে যেন বলে উঠল, "আসব?" কণ্ঠস্বরে সজীব তারুণ্য। ঘাড় ফেরাল বিজন, চৌকাঠের ওপারে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা, ফর্সা, একটু রোগা, কাটা-কাটা চোখমুখের অত্যন্ত সুদর্শন বছর আঠেরোর একটি ছেলে। নিশ্চয়ই সায়ন। বিজন বলল, "এসো।" ছেলেটি মাথা নিচু করে ভিতরে ঢুকল। বিজনের চেয়ারটা রিভলভিং, ঘুরে গিয়ে মুখোমুখি রাখা প্লাস্টিকের টুলটা দেখিয়ে ছেলেটাকে বসতে বলল সে। ছেলেটি বসল। বিজন এবার রায়কে বলল, "আপনি এখন একটু বাইরে যান। আমি না ডাকা অবধি ঢুকবেন না। সুবল যদি আসে, ওকে বাইরে দাঁড়াতে বলবেন। চা খাবে?" শেষ প্রশ্নটি ছেলেটির উদ্দেশে।
আপ্যায়নটা বোধ হয় অতিরিক্ত হয়ে যাচ্ছে, ছেলেটি বিস্ময় আর অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে বিজনের দিকে তাকিয়ে খুব নিচু গলায় বলল, "না, আমি কিছু খাব না।"
বোঝাই যাচ্ছে, বেশ নার্ভাস হয়ে আছে! প্রেমিকার বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে বলে কথা! ভেবেছিল, ভর্ৎসনা জুটবে। বদলে খাতিরযত্ন দেখে ধন্দে পড়ে গিয়েছে! ছেলেটিকে ইতিমধ্যে বেশ ভাল লেগে গেছে বিজনের। ওর সৌন্দর্যের মধ্যে থেকে একটা আভিজাত্য ঠিকরে বেরচ্ছে। এ বুলানের মতো চাপা রঙের, মাঝারি দেখতে মেয়ের প্রেমে পড়ল কী করে, সেটাই অবাক করছে বিজনকে। ওর দীর্ঘ নীরবতায় ছেলেটির অস্বস্তি বাড়ছে। দৃষ্টি কোথায় রাখবে, ঠিক করে উঠতে পারছে না। ওকে আর বিড়ম্বনার মধ্যে না রেখে বিজন বলল, "তুমিই তা হলে সায়ন, আর কে স্ট্রিটে 'মিত্র ভিলা' তোমাদের বাড়ি?"
ধীরে মাথা উপর-নীচ করে 'হ্যাঁ' বলল সায়ন।
চোখ থেকে রিডিং গ্লাসটা নামিয়ে কম্পিউটার টেবিলে রেখে বিজন জিজ্ঞেস করল, "তুমি যেন কী পড়?"
"এবছর হায়ার সেকেন্ডারি দেব। সায়েন্স স্ট্রিম।"
"বুলান তো ক্লাস এইট, তোমার সঙ্গে বন্ধুত্বটা হল কী সূত্রে?"
"আমি নিরুপম স্যারের কোচিংয়ে জুনিয়রদের একটু-আধটু গাইড করি। সেখানেই শ্রীতমার সঙ্গে আলাপ।"
'শ্রীতমা' শব্দটা তুলোর উপর দামি রত্ন রাখার মতো করে উচ্চারণ করল সায়ন। বুলানের ভাল নাম। বাবা হিসেবে বেশ গর্ববোধ হচ্ছে বিজনের! কিন্তু আর কী জিজ্ঞেস করবে বুঝে উঠতে পারছে না। প্রশ্নের স্টক শেষ! সেভাবে কিছু ভাবাও ছিল না। ছেলেটিকে দেখেশুনে বেশ ভালই লাগছে, পছন্দ হয়েছে বিজনের। সায়নকে কি চলে যেতে বলবে? সমস্যা হচ্ছে, এই সামান্য সাক্ষাৎপর্বের বর্ণনা শুনে মোটেই খুশি হবে না কৃষ্ণা। বাধ্য হয়েই বিজন সরাসরি জিজ্ঞেস করল, "তোমার আর বুলানের সম্পর্কটা এখন কোন পর্যায়ে আছে, বন্ধুত্ব না প্রেম?"
সায়ন মুখ তুলে তাকাল বিজনের দিকে। একটু সময় নিয়ে বলল, "শ্রীতমার দিক থেকে শুধুই ফ্রেন্ডশিপ।"
"আর তোমার দিক থেকে?"
"লাভ। স্পেশ্যাল রিলেশনশিপ," মাথা নিচু করল সায়ন।
বাইরে হঠাৎ দমছাড়া শোরগোল শোনা যাচ্ছে। শান্তিদান পর্ব শেষ হল মনে হয়। বিজনের মন আর ওদিকে নেই, সায়ন তাকে

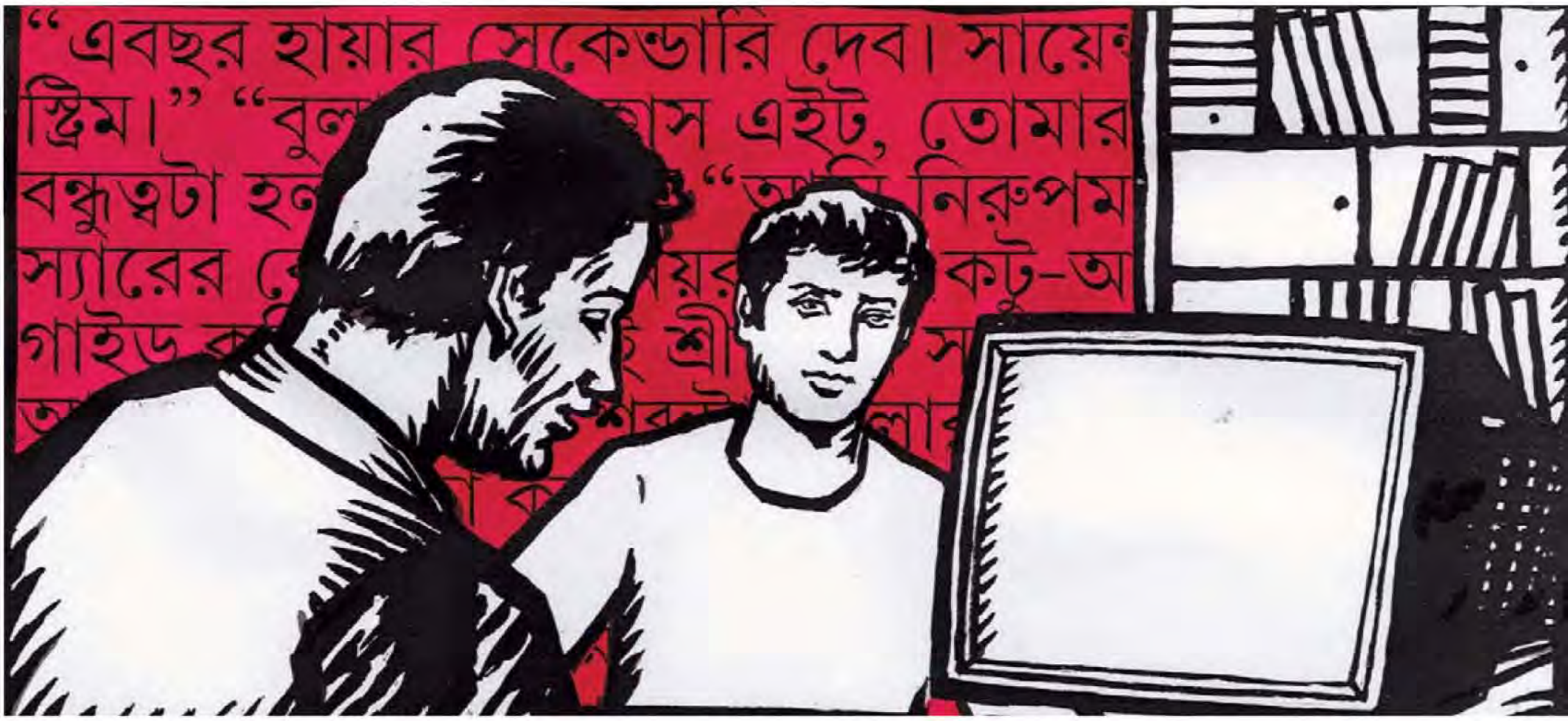

রতে এসেছে বলে কথা! ভেবেছিল, ভর্ৎসনা জুটবে। বদলে খাতিরযত্ন দেখে ধন্দে পড়ে গিয়েছে!

গোলমালে ফেলে দিয়েছে, কৃষ্ণার কাছে গুছিয়ে রিপোর্ট করতে বেশ মুশকিলে পড়তে হবে! খুবই গুরুত্বসহকারে সে জানতে চাইল, "তোমরা তো একসঙ্গে অনেকটা সময় কাটাও?"

সায়ন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। দরজার বাইরে দালানের দিকে চোখ রেখে বলল, "হ্যাঁ, তা কাটাই। কিন্তু শ্রীতমা বলে, প্রেম-ট্রেম সব বোগাস ব্যাপার! ওসব ন্যাকামির মধ্যে ও নেই।"

"তোমার মতো শ্রীতমার আর ক'জন বন্ধু আছে?"

প্রশ্নের আসল উদ্দেশ্য ধরতে পেরে সায়ন সঙ্গে-সঙ্গে বলল, "না, আমার সঙ্গে যে ফ্রেন্ডশিপ ওর আছে, তা আর কারও সঙ্গেই নেই। তবে আমি যেটা বুঝতে পারি, 'প্রেম' ব্যাপারটাতে ওর এক ধরনের বিতৃষ্ণা আছে!"

বিজন ভাবছে, কৃষ্ণা জোর বেঁচে গেল! প্রেম সম্বন্ধে মেয়ের ধ্যান-ধারণা যদি প্রথমে ওকে শুনতে হত, হয়তো বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত! এখন বিজনের থেকে শুনে নিয়ে অনেক বুদ্ধি-টুদ্ধি আঁটতে পারবে। সায়নের থেকে মেয়ের ভাবনাচিন্তার গতিপ্রকৃতি আরও কিছু জানতে পারলে ভাল হয়। প্রশ্ন সাজাচ্ছিল বিজন, এমন সময় ওয়র্কশপে ঢোকে দুর্গাবাড়ির উপদ্রব! ছেলে কোলে বুলা, পিছনে বর, বরের কাঁধে বুলার ব্যাগ! চৌকাঠের ওপারে থমকে আছে এবাড়ির বাসিন্দাদের ভিড়। স্বাভাবিকভাবেই বিজন বেশ বিব্রত বোধ করে। বিশেষত সায়নের উপস্থিতির কারণে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় বিজন। বুলা সামনে এসে ঝুঁকে পড়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল বিজনকে। দেখাদেখি ওর বরও করল। অজান্তেই সংস্কারজাত কারণে বিজনের হাত দু'টো আশীর্বাদের ভঙ্গি নিয়ে ওদের মাথার উপর চলে গেল।

কোলে থাকা ছেলেকে হাতের চাড়ে তুলে ফের ঠিকঠাক বসিয়ে নিয়ে বুলা বলল, "কাকা, এবাড়ির বড়দের কথামতো শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি। জানি না, কতদিন থাকতে পারব। ইতিমধ্যে দুর্গাবাড়ি যদি বিক্রি হয়ে যায়, তুমি বাবা-মাকে বলে রেখো, নতুন বাড়িতে আমাকে যেন একটু জায়গা দেয়!"

বিজনের পক্ষে সম্ভব নয় বুলার শঙ্কা উপলব্ধি করা। ভিড় চলে গিয়েছে দালান ছাড়িয়ে। বিজন তাকাল সায়নের দিকে। বেচারির চোখে-মুখে বিহ্বলভাব। এই মাত্র ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারেনি। ব্যাপারটা কিছুই নয়, এমন ভাব করে বিজন বলে, "হ্যাঁ, আমাদের কথা কোথায় এসে যেন থামল?"

সায়ন বলল, "শ্রীতমার বিতৃষ্ণা!"

প্রসঙ্গটা মনে পড়ল বিজনের। প্রসঙ্গ তো নয়, যেন বিরাট গাড্ডা!

ক্রমশ

অলঙ্করণ: নির্মলেন্দু মণ্ডল

সানন্দা শব্দভেদ

সূত্র পা শা পা শি

১ যা পরাজিত বা পরাস্ত হয়নি। ৪ অনুসরণ বা অবলম্বন করা হয়েছে এমন। ৬ ঘনিষ্ঠ মেলামেশা বা বন্ধুত্ব। ৮ মেষাদি পশুর লোম। ১০ গোলা, কেনাবেচার কেন্দ্র। ১১ মামাবাড়িতে বাচ্চারা যা পায়। ১২ মুসলমান শাসনকর্তা। ১৩ জমিতে জন্মেছে এমন। ১৫ প্রকার। ১৭ আভরণ, অলংকার। ১৮ খাঁটি, সত্য। ১৯ অকালে বা অসময়ে উৎপন্ন। ২০ নারীর অবিবাহিতকাল। ২১ উদ্দীপনাপূর্ণ, জমজমাট।

১	২		৩			৪			৫
			৬		৭				
	৮	৯					১০		
১১					১২				
		১৩		১৪			১৫	১৬	
১৭						১৮			
			১৯						
২০					২১				

গত সংখ্যার সমাধান

দ	ত্ত	ক		অ	গা	ধ		বা	মা
ম		চ	ম	ক		রা	হা	জা	নি
ক	মা		র	চ	না		তা	র	ক
	ন	র	ক		ম		হা		
মা	নী		ত	র	জা		তি	তি	র
না	য়	ক		ক	দা	চ		লো	ফা
		দা		বা		ক	র	দ	
খ	র	চা		জ	খ	ম		ক	ম
নি	বা	র	ক		চি	ক	ন		ন
ক	র		ল	লি	ত		দ	হ	ন

সূত্র চলতি

২ শ্রেষ্ঠ অবস্থা বা স্থান। ৩ সর্বদা, অনবরত। ৪ সমান নয় এমন। ৫ নিমগ্ন বা অভিনিবিষ্ট। ৭ আস্বাদনের ইন্দ্রিয়। ৯ লক্ষ্য বিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তির ছোড়া। ১০ অপক্ক বা অপরিণত রসধাতু। ১৪ জোঁক। ১৬ বস্ত্রাদিতে মোরগফুলের মতো বা তার পাতার মতো নকশাযুক্ত। ১৭ কল্পনার রাজ্য। ১৮ শ্রেষ্ঠ মুঘল সম্রাট। ১৯ বুদ্ধি-বিবেচনা।

ত্রিপদী

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

বিজন ভাবতে থাকল, বুলানের এই ধরনের মনোভাবের কারণ কী? ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে বুঝে নিতে বিজন সায়নের উদ্দেশে বলল, "বুলানের মা, মানে, আমার স্ত্রী তোমাদের একসঙ্গে ঘোরাফেরার খবর পেয়ে তোমার মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল। সত্যিই যদি ঘটনাটা ঘটত, তুমি তো মুশকিলে পড়ে যেতে! বুলানের মাকে তত্ত্বটা বোঝানো যেত না। ও তোমাদের রিলেশনটাকে 'প্রেম' ধরে নিয়ে, একটা হেস্তনেস্ত করতে যেত!"

"আমার তাতে কোনও অসুবিধে ছিল না। আমি সেকথা জানিয়েছিলাম শ্রীতমাকে। ও রাজি হয়নি। বলেছে, 'সম্পর্কটা যখন 'প্রেম' নয়, মা তোমাদের বাড়িতে গিয়ে কী কথা বলবে? তার চেয়ে তুমি একদিন আমার বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করে ব্যাপারটা গুছিয়ে বলো'," থামল সায়ন।

বিজনের মাথা আর কাজ করছে না! এমন নয়তো বুলান আর সায়ন প্ল্যান করে ঘোল খাওয়াচ্ছে বিজন, কৃষ্ণাকে? বিয়ের মতো সিরিয়াস কমিটমেন্টে হয়তো এখনই ওরা যেতে রাজি নয়! তাই পরিস্থিতিটাকে একটু ঘেঁটে দিচ্ছে? সায়নের থেকে কি আর কিছু জানার আছে? তলিয়ে একবার ভেবে নেয় বিজন। না, মাথায় কিছু আসছে না। সাক্ষাৎপর্ব শেষ করতে চেয়ে বিজন বলল, "ঠিক আছে সায়ন, তোমাদের ব্যাপারটা নিয়ে আমি বুলানের মায়ের সঙ্গে আলোচনা করি। আর তোমারও রাস্তায় বেশি ঘোরাঘুরি কোরো না। লোকে বন্ধুত্ব হিসেবে দেখবে না ব্যাপারটাকে, প্রেম বলেই ধরে নেবে।"

সায়ন চুপ করে আছে। একটু বিষণ্ণ দেখাচ্ছে ওকে। উঠে দাঁড়াল টুল ছেড়ে। কত দূর কী বুঝল বা ভাবল, কে জানে! মুখে একরাশ সংশয় নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

দরজার বাইরে দালান-উঠোনের দিকে তাকিয়ে থাকে বিজন, ঝিম মারা রোদ। এতগুলো লোক, তবু গোটা দুর্গাবাড়ি এখন নিঃশব্দ। দালানে একটা-দুটো চড়াই এসে বসছে, আবার উড়ে যাচ্ছে। উঠোনের লেবুগাছে বসে দু'টো শালিক ডেকে যাচ্ছে গলা পাল্টে। শীত একেবারেই বিদায় নিয়েছে। বিজনের এখন একবার কৃষ্ণাকে ফোন করা উচিত। বলেছিল, সায়ন চলে যাওয়ার পরই করতে। ইচ্ছে করছে না। কেমন একটা আলস্য লাগছে। সায়ন কি এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে দেখা করবে বুলানের সঙ্গে? কীরকম ইমপ্রেশন নিয়ে গেল, বোঝা গেল না। যে পাহাড়প্রমাণ ধারণা নিয়ে এসেছিল, সেটা নিশ্চয়ই খাটো হয়েছে। তার উপর দেখেছে এ বাড়ির সার্কাস...

আজও দিনটা বিফল গেল। অনেক ঘোরাঘুরি, তিনটে মিটিং, কোনও কাজেই এল না। নতুন কোনও সিরিয়াল পরিচালনার অফার পেল না কুনাল। মুম্বাইয়ের যে হাউজ় বাংলা টিভি চ্যানেল লঞ্চ করছে, তাদের সেই এক কথা, চারটে পাইলট এপিসোড নিজের পয়সায় তৈরি করে জমা দিতে হবে। এখনও কোনও ফান্ডের ব্যবস্থা করে ওঠা যায়নি। টাকার জন্য

কুনাল না চাইলেও খুকু মনে-মনে ওকে চাইত। কুনাল ওর সঙ্গে সময় ক

AMARBOI.COM

আজ দু'জনের কাছে গিয়েছিল কুনাল, সুবিধে কিছু হল না। তবু এই যে সারাদিনের পর রাতে বাড়ি ফিরছে কুনাল, মন কিন্তু খুব একটা দমে নেই। কারণ, আর একটু পরেই ছেলে-বউয়ের সঙ্গে দেখা হবে। তারা কুনালের জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে। কুনালের সাফল্য-ব্যর্থতা নিয়ে তাদের কোনও মাথাব্যথা নেই।

করিয়ে ফেলেছিল বেশি! তুলিকার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল কলকাতায়। ও ক্যামেরাম্যান শিখরদার পাড়ার মেয়ে। কুনাল সেসময় একটি মেগা সিরিয়ালের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরের কাজ করছে, শিখরদা সেই সিরিয়ালের ক্যামেরা হেড। খুবই গুণী মানুষ। বেশ কিছু সিরিয়াস ছবির ক্যামেরা করছে। দেশে-বিদেশে

টিয়েছে। চুমু অবধি গড়িয়ে ছিল সম্পর্কটা। মুখে তখনও প্রোপোজ় করে উঠতে পারেনি খুকু।

AMARBOI

বাবা বা স্বামীর সন্নিধ্য পেলেই হল। সংসার যে একটা ভাল জায়গা, বিয়ের আগে বিশ্বাসই করত না কুনাল। তুলির জোরাজুরিতে বিয়েটা হয়েছে। তুলি বলেছিল, "আমাকে বিয়ে করে আপনি ছ'টা মাস একসঙ্গে থাকুন! তারপর যদি মনে হয় বিয়ে, ঘর-সংসার ব্যাপারটা খারাপ, আপনি বললেই আমি ডিভোর্স দিয়ে দেব।"

খারাপ লাগেনি। সেটা তুলিকার গুণের জন্য নাকি কুনালের একটু থিতনোর মতো গৃহকোণ দরকার হয়ে পড়েছিল সেই কারণে, এখনও পরিষ্কার নয়। থিতোনো বলতে সিনেমা পরিচালক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য যে যুদ্ধ তখন জারি ছিল, তার থেকে খানিকক্ষণের ছুটি এবং সেই ছুটিতে যুদ্ধের আগাম পরিকল্পনা শেয়ার করা কোনও প্রিয়জনের সঙ্গে। কানাইপুরের বাড়িতে অনেক আপনজন থাকা সত্ত্বেও এই সুবিধেটা পাওয়া যেত না। তার কেউই সিনেমার ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড নয়। কুনালকে তারা কোনও ধরনের সাপোর্ট দিত না। বরং মনে করত এম এতে সিক্সটি পার্সেন্ট পাওয়া কুনালের মাথা থেকে সিনেমার ভূতটা যত তাড়াতাড়ি নেমে যায়, ততই মঙ্গল! বাবা আজও কুনালের কাজ নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। ভাল মতোই জানে, এই সিনেমার পোকাই বড় ছেলেকে কলকাতায় থাকতে বাধ্য করেছে। এক্ষেত্রে সচরাচর পুত্রবধূকে দোষারোপ করা হয়। তুলিকা যে সেরকম নয়, বাড়ির সকলেই জানে।

সত্যি বলতে কী, বিয়ের আগে তুলিকা পাত্রী হিসেবে নিজেকে যতটা না পছন্দ করাতে পেরেছিল কুনালকে, বাড়ির লোককে

প্রাইজ়ও পেয়েছে একটা ছবির জন্য। আর্ট ফিল্মের ক্যামেরাম্যান হিসেবে তকমা পড়ে গিয়েছিল শিখরদার, মেনস্ট্রিমের ছবি করার ডাক পেত না, মাস খরচ চালানোর জন্য বাধ্য হয়ে সিরিয়ালে কাজ করত। ক্রাইসিসের এই জায়গাটায় কুনালের সঙ্গে শিখরদার ছিল অনেকটাই মিল। একই পাড়ায় থাকার সুবাদে শিখরদার বাড়িতে প্রায়ই আসত তুলিকা। তার অভিনেত্রী হওয়ার ইচ্ছে। আবৃত্তি খারাপ করত না। অভিনয় করত ছোটখাটো একটা থিয়েটার গ্রুপে। নাটকে তুলিকার অভিনয় দেখেছে কুনাল, ফিজ়িক্যাল অ্যাক্টিং বেচারির একেবারেই আসে না। ভীষণ আড়ষ্ট। সেকথা তাকে বললেও বুঝত না। একটা সুযোগ পাওয়ার জন্য হত্যে দিয়ে বসে থাকত শিখরদার বাড়িতে। শিখরদা পাড়ার মেয়েকে এড়াতে না পেরে চাপিয়ে দিল কুনালের ঘাড়ে। এর পিছনে বেলা বউদিরও অবদান ছিল, যদিও তার উদ্দেশ্য ছিল সৎ। বলত, "দ্যাখো না, মেয়েটার জন্য যদি কিছু করতে পার।" তুলিকার সামনেই কুনাল বলেছে, "বউদি, ওর অ্যাক্টিংটা একেবারেই আসে না। দেখতেও আহামরি কিছু নয়। কী বেসিসে রেফার করব বলো তো?" তুলিকার অভিব্যক্তিটাই হত সব চেয়ে মজার, নিজের অযোগ্যতা মেনে নিয়ে অপরাধী মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকত! কিন্তু নিজের বাসনা থেকে নড়ত না! কুনাল শিখরদার বাড়িতে থাকলেই কীভাবে যেন গন্ধ পেয়ে চলে আসত সেই যে সামনে এসে বসত, ওঠার নাম নেই! অনেক সময় বাড়ি থেকে কোনও রান্না নিয়ে আসত চারজনের জন্য। খেতে-খেতে গল্পগাছা হত। অথচ সুযোগ দেওয়ার জন্য মোটেই ঘ্যানঘ্যান করত না

তুলিকা। সেদিন কুনাল ফ্লোরে কী কাজ করল, না করল খোঁজ নিত। লাঞ্চ কখন করেছে, কী মেনু ছিল? কাজের চাপে বেশি চা, সিগারেট যেন খেয়ে না ফেলে, সে ব্যাপারে সতর্ক করত। কুনাল ঠিক বুঝে ইঠতে পারত না, তুলিকা আসলে তার কাছে কী চায়? তবে ওর প্রশ্নের উত্তর দিতে ভালই লাগত কুনালের। সারাদিনের লড়াইটা কাউকে বলতে পারলে, হতাশা-আনন্দগুলো বেরিয়ে গিয়ে কাজে নতুন উদ্যম পাওয়া যায়। সে সময় তুলিকার মতো একজন শ্রোতা খুবই দরকার ছিল। একই সঙ্গে কুনাল খেয়াল রাখছিল তুলিকা যেন তার প্রেমে না পড়ে যায়! সরল মেয়েটাকে ঠকাতে মন চায়নি। এই ভুলটা সে জীবনে একবারই করেছে, অমিতেশের বোন খুকুর বেলায়। খুকু মনে-মনে কুনালকে চাইত, কুনালের দিক থেকে সেরকম কোনও ফিলিংস ছিল না। খুকুর মন পড়তে পেরেও, কুনাল ওর সঙ্গে সময় কাটিয়েছে। চুমু অবধি গড়িয়ে ছিল সম্পর্কটা। মুখে তখনও প্রোপোজ করে উঠতে পারেনি খুকু। যেদিন বলল, সপাটে 'না' বলে সরে এসেছিল কুনাল!

তুলিকা সেরকমই সরল-সহজ মেয়ে, ওকে কোনও রকম ধন্ধে না রাখতে চেয়ে কুনাল তার সেই সময়কার চার বান্ধবীর কথা বলেছে। তাদের সঙ্গে যে কুনালের অল্পবিস্তর শারীরিক সম্পর্ক আছে, সেকথাও জানিয়েছিল তুলিকাকে। ওর মধ্যে কোনও ভাববিকার দেখা যায়নি। আগের মতোই কুনালের সঙ্গে গল্প

আপনজনদের দেখার। আপনি ওই পরিবেশে বড় হয়েছেন। অনেকবার আপনাকে বলেছি, কানাইপুরে নিয়ে যেতে। এড়িয়ে গিয়েছেন। তাই নিজেই চলে গেলাম। জন্মদিনের সারপ্রাইজ় গিফ্‌টটা দেওয়ার লোভও সামলাতে পারিনি।"

কুনাল বলেছিল, "তোমার শখ তো মিটল। কিন্তু বাড়ির লোক যে এক্সপেক্ট করে বসে রয়েছে, তোমাকে বিয়ে করব আমি? এরকম ভুল মেসেজ দেওয়ার কোনও মানে হয়!"

এতটুকু ইতস্তত না করে তুলিকা বলেছিল, "হ্যাঁ, আমারও মনে হয় আপনার আমাকে বিয়ে করা উচিত। আপনার সঙ্গে যে ক'টা দিন মিশেছি, বুঝেছি বিয়ে করার লোক আপনি নন। বাঁধা পড়তে চান না কোনও সম্পর্কে। কিন্তু একজন ক্রিয়েটিভ মানুষের ঘরসংসার থাকা খুবই জরুরি। কাজে ইন্সপিরেশন পাওয়া যায়।"

"তা তোমাকেই বিয়ে করতে হবে, সেটা কেন?"

সত্যিকারের কৌতূহল থেকে জানতে চেয়েছিল কুনাল। তখনই তুলিকা ওই কথাটা বলেছিল, "আমাকে বিয়ে করে আপনি ছ'ন মাস এক সঙ্গে থাকুন। তারপর যদি মনে হয় বিয়ে, ঘর-সংসার ব্যাপারটা খারাপ, আপনি বললেই আমি ডিভোর্স দিয়ে দেব!"

শুধুমাত্র এই সুবিধের জন্য যে তুলিকাকে বিয়ে করেছে কুনাল, এমনটা নয়। বোধ-বুদ্ধি পাকা হওয়ার পর থেকেই 'বিয়ে' নামক প্রতিষ্ঠানটিকে সে ঘোর অপছন্দ করে এসেছে। ভালবাসা না থাকলেও, স্ত্রী-স্বামীই আইনত পরস্পরের সবচেয়ে কাছের লোক। স্থাবর সম্পত্তির ভাগীদার! যৌনতার ব্যাপারে একে-অপরকে ভাল

বিয়ের পর থেকে কুনাল নিজের এবং সংসারের কোনও কাজই করত না। টাকাকড়ির ব্যাপার সব

AMARBOI.COM

করতে চলে আসত। ধীরে-ধীরে কুনাল উপলব্ধি করে, যতটা সম্ভব বেশি সময় তুলিকা তার সঙ্গ চায়। ওর সঙ্গ মন্দ লাগত না কুনালেরও। কাজ না থাকলে তুলিকাকে নিয়ে কখনও রবীন্দ্রসদন চত্বর, কফি হাউজ়েও গিয়েছে। শিখরদা-বউদি বাড়ি না থাকাকালীন তুলিকার সঙ্গে বেশ কয়েকবার শারীরিক সম্পর্কও হয়েছিল। কিন্তু কোনওবারই তুলিকা সম্পর্কটাকে প্রেম বা বিয়ের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বায়না করেনি। যা কিছু ঘটছে, সবই যেন খুবই স্বাভাবিক। তারপরই এমন একটা মাস্টারস্ট্রোক দিয়েছিল তুলিকা, তাতেই ধরাশায়ী হয় কুনাল। ব্যাপারটা যে বুদ্ধি করে ঘটিয়েছিল, তা নয়। ওর স্বভাবজাত কারণেই বিষয়টা ঘটে যায়। ১ জানুয়ারি কুনালের জন্মদিন। আউটডোর শুটিংয়ে কুনাল তখন বাইরে। রাতে কানাইপুরের বাড়িতে ফেরার কথা। রুটিনটা জানত তুলিকা। রাতে বাড়ি ফিরে কুনাল দ্যাখে, তার শোওয়ার ঘরে টেবিলের উপর ফুলদানিতে প্রচুর ফুল সাজানো আছে। অবাক হয়ে মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "এসব কে করল?" মুচকি হেসে মা বলেছিল, "তুলিকা এসেছিল। ও-ই সাজিয়ে দিয়ে গিয়েছে!"

কুনাল পুরোপুরি থ'! তুলিকার নামও বাড়িতে কোনওদিন তোলেনি। কোনও বান্ধবীকেই সচরাচর বাড়িতে নিয়ে আসে না কুনাল। এলেও বাড়ির লোকের সামনে তাকে একলা ছাড়ে না। পাছে মেয়েটি খাতির জমিয়ে ফ্যালে! তুলিকা কোনও কিছুর তোয়াক্কা না করে নিজেই চলে এসেছে। সেই মুহূর্তে তুলিকার ওপর ভীষণ রাগ হয়েছিল কুনালের। মনে হয়েছিল, পুরো ঘটনাটাই ছক কষে করেছে। পরে শিখরদার বাড়িতে দেখা হতেই সমস্ত রাগ উগরে দিয়েছিল কুনাল। মাথা নিচু করে সমস্তটাই শুনল তুলিকা। মুখে সামান্য অভিমান কিংবা চোখ ছলছল কিছুই দেখা গেল না। খুব শান্ত গলায় জানিয়েছিল, "আমি অত সব ভেবে আপনাদের বাড়ি যাইনি। আমার খুব ইচ্ছে ছিল, আপনার বাড়ি,

না লাগলেও, বিশ্বস্ত থাকতেই হবে...এরকম আরও অনেক কিছু। মানুষ যে কেন স্বেচ্ছায় এই শিকলে জড়ায়, বুঝতে পারত না কুনাল! শারীরিক চাহিদা যেটুকু থাকে, বিয়ে না করেও তা মিটিয়ে নেওয়া যায়। সেটা মেটানোর মতো সাহস থাকে না বলেই একজন স্থায়ী যৌনসঙ্গী করে নেয়। তবে কুনাল এটাও ভাবত, এই যে এত লোক বিয়ে করেছে, তারা সবাই বোকা আর সেই-ই একমাত্র চালাক, এটা হতে পারে না! তাই দাম্পত্য নিয়ে তার সামান্য কৌতূহল ছিলই। তুলিকার সঙ্গে মিশে কুনালের এইটুকু অন্তত মনে হয়েছিল, মেয়েটা খুব একটা অশান্তির কারণ হয়ে উঠবে না। কাজের জায়গায় নিজেকে প্রতিষ্ঠার লড়াইটা ক্রমশ একঘেয়েমির পর্যায় চলে যাচ্ছিল, জীবনে একটু বদল আনার জন্যই বিয়ে করতে রাজি হয়ে গেল কুনাল। ততদিনে বিজন, অমিতেশ, অর্ক বিয়ে করে ফেলেছে। বাচ্চাকাচ্চাও হয়ে গিয়েছে। কুনাল বিয়ে করছে শুনে তিন বন্ধু চমকে ছিল খুব! বেশ ধুমধাম করে হয়েছিল বিয়ের অনুষ্ঠান। খরচ সব বাবা করেছিল। পরের প্রজন্মের প্রথম বিয়ে বলে কথা! বাড়ির লোকের উৎসাহে কোনও ধরনের আগল টানেনি কুনাল। যৌথ পরিবার বলে উৎসবের আবহাওয়াটা বিয়ের আগে-পরে অনেকদিন ছিল। নিখুঁত বরবেশে বিয়ে করতে গিয়েছিল কুনাল। মন্ত্র পড়েই বিয়ে করেছে। একই দিনে রেজিস্ট্রিও হয়েছিল।

বিস্মিত চোখমুখ নিয়ে ছায়ার মতো সঙ্গী হয়েছিল অর্ক, বিজন, অমিতেশ। তিনজনই বুঝে গিয়েছিল, কুনালের জীবনে তুলিকা অনিবার্য ছিল। কুনাল নিজেও খেয়াল করে দেখেছে, বিয়ের পর থেকেই তার স্বভাবে মেয়েবাজি প্রবণতাটা কমে গিয়েছিল। তার মানে এই নয় যে, তুলিকা মেয়ে হিসেবে ইউনিক। কিন্তু এই ধরনের মেয়েরা নিজেরাই একটা আশ্রয় হয়ে উঠতে পারে। অনিশ্চিত জীবনের সঙ্গে যুঝতে থাকা কুনালের ব্যক্তিগত পর্যায়ে

একটা আশ্রয়ের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তবে তুলিকাকে কানাইপুরের বাড়ি থেকে তুলে এনে কলকাতায় সংসার পাতাটা ঠিক কাজ হয়নি। আজও এটা নিয়ে এক ধরনের অপরাধবোধে

ঘণ্টার জার্নি। প্রতি উইক-এন্ডে আসব। তোমরাও যাবে। কিছুদিনের মধ্যে একটা গাড়িও কিনব। তখন তো যাতায়াতের আরও সুবিধে।" আশ্বাসে কাজ হয়নি। ওবাড়ি থেকে চলে আসার সময়

ব তুলিকাই সামলাত। কুনাল শুধু রোজগার করে এনে তুলিকার হাতে সেই অর্থ তুলে দিত।

AMARBOI.COM

ভোগে কুনাল। ওবাড়ির সকলের কাছে তুলিকা খুব প্রিয় ছিল। বাবা, মা, ভাই তো বটেই, কাকা-পিসিরাও যে-কোনও ছোটখাটো ব্যাপারে তুলিকার পরামর্শ নিত। এদিকে কুনালের কলকাতা-কানাইপুর যাতায়াত করতে বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। টিভি সিরিয়ালের কাজ তো আর দশটা-পাঁচটার অফিসের মতো নয়। সকালে বেরিয়ে ফিরতে-ফিরতে রাত হয়ে যেত। একটা পরিপূর্ণ ঘুম হওয়ার আগেই ফের বেরিয়ে যেতে হত। ততদিনে আজানও এসে গিয়েছে পৃথিবীতে। ছেলেটাকে ভাল করে একটু আদরও করা হত না। রোজই কাজের শেষ দিকে এসে বাড়ির জন্য মন ছটফট করত কুনালের। অনেক সময় বাড়ি ফেরার তাড়ায় জরুরি মিটিং বা কাজ বাতিল করতে হত। স্টুডিও পাড়া থেকে ট্রেনে বাসে প্রায় দু'-আড়াই ঘণ্টা লেগে যায় কানাইপুর ফিরতে। লাস্ট ট্রেন মিস করার ভয় থাকত। কুনাল টের পাচ্ছিল, তার রোজের এই তাড়াহুড়ো দেখে লোকে কাজ দিতে ইতস্তত করছে। অজ্ঞাতেই হাত থেকে চলে যাচ্ছে অনেক সুযোগ। সমস্যাটা বলেছিল তুলিকাকে। অখুশি মুখে কলকাতায় থাকার যুক্তিটা মেনে নিয়েছিল তুলিকা। ও হয়তো খেয়াল করেনি, কুনাল গুরুত্বপূর্ণ একটা সমস্যা ওর কাছে চেপে যাচ্ছে। সেটা হল, তুলিকার উপর কুনালের নির্ভরতা। বিয়ের পর থেকে কুনাল নিজের এবং সংসারের কোনও কাজই করত না। টাকাকড়ির ব্যাপার সব তুলিকাই সামলাত। রোজগার করে এনে হাতে তুলে দিত কুনাল। বাড়ি থেকে বেরনোর সময় তুলিকা হাতখরচ দিয়ে দিত পার্সে, সেটা কত, দেখার পরিশ্রমটুকুও করত না কুনাল। সুতরাং, তুলিকা ছাড়া কলকাতায় থাকতে হলে সে বেশ ফ্যাসাদে পড়ে যেত।

সময়-সুযোগ বুঝে কলকাতায় থাকার সিদ্ধান্তটা বাড়ির লোকদের জানাল কুনাল। মুষড়ে পড়ল সকলেই। কুনাল নিজে থেকেই বাড়ির লোকেদের আশ্বাস দেয়, "আরে বাবা, কলকাতা তো মাত্র দু'

মা, পিসি, বোনেরা আড়ালে চোখের জল ফেলল। তুলিও কাঁদল খুব। বাবা সেই সময় বাড়ি থেকে সরে গিয়েছিল। প্রথম দিকে মাসে এক-দু'বার আজান, তুলিকে নিয়ে কানাইপুরে গিয়েছে কুনাল। তারপর যা হয়, যাওয়ার রেট কমতে লাগল। ওবাড়ি থেকেও বড় একটা কেউ আসত না। কিন্তু এভাবে বাড়ি ছেড়ে এসে আদতে কোনও লাভ হল না। কাজ বাড়ল কই? এখন তো হাত শূন্য!

"ও স্যর, সিগারেট নিলেন না?"

দোকানির ডাকে সম্বিত ফেরে কুনালের। মোড় ঘুরে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিল। ফিরতে থাকে। রোজ অটো থেকে নেমে মোড়ের এই দোকানটা থেকে সিগারেট কেনে কুনাল। আজ ভাবনার ঘোরে ভুলেই গিয়েছিল। দোকানি কুনালের পরিচয়টা জানে। যেমন জানে এ পাড়ার সকলেই। ঠিক এই সময় এখান থেকে ভাড়া উঠে অন্য কোথাও চলে গেলে ভাল হত। কিন্তু তার জন্য হঠাৎ কিছু খরচ বেড়ে যাবে। অ্যাডভান্সের টাকা, বাড়ি ভাড়াও এত সস্তায় পাওয়া যাবে না। সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত, যদি কানাইপুরে চলে যাওয়া যেত। কিন্তু তা আর সম্ভব নয়। কাজের দোহাই দিয়ে ছেড়ে ছিল বাড়ি, শূন্য হাতে ফিরে যাওয়া অত্যন্ত লজ্জার। এই বয়সে এসে বউ-ছেলে নিয়ে বাবার গলগ্রহ হওয়াটাও মানায় না। যদিও তাতে কোনও অসুবিধে হবে না বাবার। টাকা-পয়সা যা আছে, স্বচ্ছন্দে কুনালদের টানতে পারবে। তবু এই হেরে যাওয়ার অপমানটা সহ্য করা কঠিন। তা ছাড়া সংসারের পরিস্থিতি বুঝে তুলি এখন অনেকটাই সময় দিচ্ছে ওর বুটিকে। কানাইপুর থেকে যাতায়াত করে সেই সময়টা দেওয়া যাবে না। ব্যবসা নিয়ে এতটাই উঠেপড়ে লেগেছে তুলি, মনে হচ্ছে সংসারের আর্থিক সঙ্কটটা কাটিয়ে উঠবে। কুনাল আর একটু সময় পাবে কাজ খোঁজার। তুলিকা কৃচ্ছ্রসাধন কেন করছে? তার শ্বশুরবাড়ি, বাপের বাড়ি, দু'দিকের আর্থিক অবস্থাই ভাল। কুনালের সম্মানের কথা

ভেবেই লড়াইটা চালিয়ে যাচ্ছে। কারণ, কুনালকে সে ভালবাসে। এতটা ভাল কুনাল কি কোনওদিন ওকে বেসেছে? আদৌ ভালবেসেছে কি? কানাইপুরের বাড়ি তো দূর অস্ত, এখন নাকতলার বাড়ির একান্ত, ছোট্ট সংসারে ঢোকার আগে মাথা নিচু হয়ে গিয়েছে কুনালের!

বাড়ি ঢোকার পর থেকে একটু বুঝি বাড়াবাড়ি সময় ধরে মাথা নিচু করে রেখেছিল কুনাল। মাথা নামিয়ে জুতো খুলেছে, পকেট থেকে মোবাইল, পার্স, রিডিং গ্লাস বের করে টেবিলে রেখেছে। ওই অবস্থাতেই বাথরুম গিয়েছে। পোশাক বদলেছে। এমনকী, তুলি এই মুহূর্তে জলের গ্লাসটা যে বাড়িয়ে ধরেছে, সেটাও ওর মুখের দিকে না তাকিয়ে হাতে নিল কুনাল! অন্যদিন এসময় ফিরলে চা খায় কুনাল, তুলিকাও খায়। ওর হয়তো নেশাটি চাড়া দেয় একটু আগে। কুনালের অপেক্ষায় বসে থাকে। আজ মাথা নেড়ে 'চা' না করে দিল কুনাল, তুলিকার দিকে না তাকিয়েই!

কুনালের বেমানান আচরণে বেশ অবাক হল তুলিকা, "কী হয়েছে গো? এত আপসেট কেন?"

দ্রুত নিজেকে সামলাল কুনাল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে গিয়ে স্লো-মোশন করে নিয়ে বলল, "না, সেরকম কিছু না। চা করো এক রাউন্ড, খাই।"

"নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। এত মনমরা তো তোমাকে কখনও দেখি না! কেউ কিছু বলেছে?"

পরিস্থিতি হালকা করার জন্য কুনাল হাসার চেষ্টা করল। কিন্তু টের পেল, হচ্ছে না হাসিটা। বরং ফুটে উঠল মরিয়া ভাব, "কে কী বলবে! আমার সঙ্গে লোকের দরকার এতটাই কমে গিয়েছে, কেউ আর বিশেষ কথাই বলে না।"

তখনই কোনও উত্তর করল না তুলিকা। চেয়ে রইল কুনালের দিকে। কয়েক সেকেন্ড বিরতি পর কুনাল সেন্টার টেবিল থেকে রিমোট তুলে নিয়ে অন করে টিভি বাংলার নিউজ় চ্যানেল চলতে শুরু করেছে। তুলিকা রিমোটটা কুনালের হাত থেকে নিয়ে মিউট করল, "হঠাৎ এত ভেঙে পড়ার কী আছে, বুঝতে পারছি না। তোমাদের লাইনে তো এরকম হয়ই। এই তো গত কালই ফোন করেছিল বেলাবউদি। বলল, শিখরদার হাতেও এখন কোনও কাজ নেই। ওরা ভাবছে, কোনও একটা লং টুর করবে। কই, শিখরদা তোমার মতো মনখারাপ করে বসে নেই তো!"

"শিখরদা অনেক হিসেবি লোক তুলি। অসময়ের কথা ভেবে টাকা জমা করে রেখেছে। আমি সেটা পারিনি।"

"তাতে কি তোমার সংসার মুখ থুবড়ে পড়েছে। আমি কি চালাচ্ছি না? তোমাকে তো কতবার বলেছি, সংসার নিয়ে একদম ভাববে না। নিজের কাজ নিয়ে ভাব।"

ক্রমশ

অলঙ্করণ: নির্মলেন্দু মণ্ডল

AMARBOI.COM

সানন্দা শব্দভেদ

সূত্র পা শা পা শি

১ আবহমানকাল ধরে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এমন। ৫ যার কামনা সফল হয়েছে। ৮ জামাকাপড় কাচা এঁর পেশা। ৯ সাধনপ্রণালীপ্রধান শাস্ত্রবিশেষ। ১০ অনুকূল ধারণা। ১২ সদ্য জন্মেছে এমন। ১৫ বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তায় অভ্যস্ত। ১৮ সাধু আচরণ। ২০ বশীভূত। ২২ বিশিষ্ট কবি। ২৪ নদীগর্ভে উৎপন্ন গোয়েন্দা। ২৬ শেষ, খতম। ২৮ নাট্যকার অমৃতলাল বসুর উপাধি। ২৯ লজ্জার কারণযুক্ত।

১	২	৩		৪		৫		৬	৭
৮								৯	
				১০			১১		
১২	১৩		১৪						
					১৫	১৬		১৭	
১৮		১৯							
					২০				২১
		২২	২৩						
২৪	২৫						২৬	২৭	
২৮					২৯				

গত সংখ্যার সমাধান

অ	প	রা	হ	ত		অ	নু	সৃ	ত
	র		র			স			দ
	ম		দ	হ	র	ম			গ
	প	শ	ম		স		আ	ড়	ত
আ	দ	র			না	জি	ম		
		ক্ষে	ত্র	জ			র	ক	ম
ক	লা	প		লৌ		আ	স	ল	
ল্প			আ	কা	লি	ক		কা	
লো			ক্কে			ব		দা	
ক	ন্যা	কা	ল		স	র	গ	র	ম

সূত্র চলতি কথায়

১ সারাজীবন। ২ রাজা। ৩ জমিদারির অংশ। ৪ ঋণের দলিল। ৫ কথার মাত্রারূপে ব্যবহৃত অর্থহীন শব্দ। ৬ পাশ। ৭ পরামর্শদানে পটু। ১১ দাঁত। ১৩ বরদাত্রী। ১৪ গুটিপোকার সুতো থেকে প্রস্তুত কাপড়। ১৬ বিন্ধ্যপর্বত থেকে উৎপন্ন নদী। ১৭ চর্চা। ১৮ চরাচরসহিত। ১৯ বিস্ময়। ২০ মত্যুর পরে প্রাপ্ত অবস্থা। ২১ দেখাশোনা। ২৩ সগৌরবে অবস্থান। ২৫ স্বাদ। ২৬ যা না থাকলে বেকার। ২৭ জলপ্লাবন।

চিত্রপট

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

চা করতে কিচেনে ঢুকে গেল তুলিকা। কুনালের একবার গলা তুলে বলতে ইচ্ছে করল, 'বুঝলে তুলিকা, শিখরদা যেমন অসময়ের জন্য টাকা তুলে রেখেছিল, আমি রেখেছি তোমাকে! নিশ্চয়ই সেটা বুঝতে পার?' বলতে পারলে ভাল লাগত, কনফেস করে হালকা হত মনটা। এমনও হতে পারে, কথাটার বিরুদ্ধে এমন কোনও যুক্তি দিল তুলিকা, সেটা আঁকড়ে নিজের কাছে নিজের সম্মানটা বাঁচাতে পারত কুনাল। তবে ঝুঁকিটা নেওয়া ঠিক হবে না। কথাটাকে কীভাবে গ্রহণ করবে তুলি, আগাম আন্দাজ করা মুশকিল।

"যাও না, ছেলের কাছে গিয়ে একটু বোসো না। এসে থেকে তো ওর সঙ্গে একটাও কথা বলোনি," কিচেন থেকে ভেসে এল তুলির গলা।

সঠিক অ্যাডভাইস। বাড়ি ঢোকার পর থেকে আজানের কাছে একবারও যায়নি কুনাল। রোজই যায়। গল্পগাছা, আদরটাদর হয় একটু। যদিও সবই একতরফা! কুনালই এগিয়ে যায় ওর কাছে, অন্য বাচ্চাদের মতো ঝাঁপিয়ে আসে না আজান। ছেলেটা ভারী অদ্ভুত।

"একটা ইম্পর্ট্যান্ট কথা বলতে তোমায় ভুলে গিয়েছি। এমন মুড করে ঘরে ঢুকলে!" চায়ের মগ নিয়ে ঘরে ঢুকল তুলিকা।

"কী কথা?"

ডিভানে বসে তুলিকা চায়ে চুমুক মেরে বলল, "খোকনদা আজ অফিস থেকে ফিরে তোমার খোঁজ করছিল। বলল, একটা আর্জেন্ট দরকার আছে। যত রাতেই ফেরো, একবার দেখা কোরো ওঁর সঙ্গে!"

বুক ছমছম করে উঠল কুনালের! খোকনদা অর্থাৎ বাড়িওয়ালা জরুরি দরকারে খোঁজ করছে মানেই ধার হিসেবে দেওয়া দেড় লাখ টাকা ফেরত চাইবে! এতদিনে নিশ্চয়ই জেনে ফেলেছে কুনালের হাতে কোনও কাজ নেই। এই সময় চাপ না দিলে টাকা হয়তো আর পরে পাবেই না। সাক্ষাৎপর্বটা আর কোনওভাবেই এড়ানো যাবে না বুঝে নিয়ে কুনাল ডিভান থেকে উঠে দরজার দিকে পা বাড়াল।

দোতলার ডোরবেল টেপার সঙ্গে-সঙ্গে দরজা খুলল খোকনদা। চোখমুখ কেমন যেন একটু থমথমে। বলল, "আসুন।"

খোকনদার পিছু পিছু সোফায় গিয়ে বসল কুনাল।

"চা খাবেন?"

"নাঃ, খেয়েছি। তা বলুন কী ব্যাপার?" প্রশ্নটা কিঞ্চিৎ হাসি-হাসি মুখ করে করল কুনাল।

খোকনদা ইতস্তত করে বলল, "আপনাকে না জানিয়ে ইতিমধ্যে দু'টি কাজ করেছি।"

বিপদ কোনদিক থেকে আসছে ধরতে পারল না কুনাল। নিস্তেজ গলায় জানতে চাইল, "কী কাজ?"

"এক হচ্ছে, মধুপর্ণার সঙ্গে গত পনেরো দিনে দু'বার দেখা করেছি। দুই, আপনার কথা পেড়েছি তার কাছে।"

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গিয়েছে কুনাল! মধুপর্ণা বাংলা সিনেমার একনম্বর নায়িকা! খোকনদা মধুপর্ণার ব্যাপারে অবসেসড। বহুদিন কুনালকে বলেছে, 'ওকে

পরের দিনই, দীপেন আমাকে পাঠাল মধুপর্ণার ফ্ল্যাটে। সঙ্গে দিল স্ক্রিপ্ট

নিয়ে একটা সিনেমা ডিরেক্ট করুন, আমি ফ্লোরে বসে শুধু দেখব।' সেই আশাতেই খোকনদা বাড়ির ভাড়া বাড়ায়নি। কুনালই নিজের সাধ্য অনুযায়ী ভাড়ার টাকা বাড়িয়েছে। ধারের দেড় লাখ এখন অবধি শোধ দিতে বলেনি খোকনদা। কারণ, ওই একটাই। কাছ থেকে মধুপর্ণাকে অনেকটা সময় ধরে দেখবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, কুনালের সাহায্য ছাড়াই মধুপর্ণার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছে খোকনদা। ব্যাপারটা ভাল ভাবে বুঝে নেওয়ার জন্য কুনাল জানতে চাইল, "কোন সূত্রে আলাপ হল মধুপর্ণার সঙ্গে?"

"আমার এক বন্ধু আলাপ করিয়ে দিল। কলেজে ক্লাসমেট ছিলাম। ওই বন্ধু, মানে, দীপেন থাকে মুম্বইয়ে, এক ফিল্ম প্রোডাকশন হাউজ়ে চাকরি করে। কলকাতায় এসেছে টলিউডের কয়েকজন আর্টিস্টের সঙ্গে মিটিং করতে। যাদের আগামী ছবিতে কাস্ট করবে ওদের প্রোডাকশন হাউজ়।"

"ওই আর্টিস্টদের মধ্যে মধুপর্ণার নাম ছিল?"

কুনালকে অবাক করে খোকনদা বলল, "না, ছিল না। আমার অনুরোধে কাস্ট করল। আমিও ভাবিনি ব্যাপারটা এরকম ঘটবে! ব্যাপারটা হয়েছে কী, দীপেনের সঙ্গে আচমকা দেখা হয়ে গেল পার্ক স্ট্রিটের একটা হোটেলের লাউঞ্জে। এতদিন পর বন্ধুকে পেয়ে আপ্লুত হয়ে পড়েছিল," থামল খোকনদা।

"আপনি বলে যান।"

"তা এটা-সেটা গল্প করতে-করতে জানতে পারলাম, ওর কলকাতায় আসার উদ্দেশ্য। জিজ্ঞেস করলাম, কোন-কোন আর্টিস্টের সঙ্গে কথা বলবে? ও ছ'জনের নাম করল। মধুপর্ণার নাম করল না। ভেবে দেখলাম, বন্ধু যখন, মধুপর্ণার প্রতি আমার দুর্বলতার কথা বলাই যায়। তারপর কী হল জানেন? দীপেন বলল, অন্য একজনকে বাদ দিয়ে ও মধুপর্ণাকেই নেবে, স্রেফ আমার জন্য! একে তাকে ফোন করে জেনে নিল মধুপর্ণার নম্বর। মিটিং ফিক্স করল ঠিক দু' ঘণ্টা পর," আবার থামল খোকনদা।

গল্পটা এমন টানটান অবস্থায় চলে এসেছে, কুনালের আর তর সয় না। রেগে গিয়ে বলল, "দূর মশাই, থামছেন কেন! বলুন না।"

"আমার তখন কী অপ্রস্তুত অবস্থা! যে মেয়েটাকে এত বছর ধরে চোখের সামনে একবার দেখতে চেয়েছি, সেই আমি কি না তারই বাড়িতে দু' হাতের দূরত্বে বসে আছি। ঘণ্টাখানেক ওর ফ্ল্যাটে থেকে ফিরে এলাম আমরা।"

"মধুপর্ণা এখন থাকে কোথায়? এমনিতে তো বেহালার মেয়ে," বলল কুনাল।

"দেখেছেন আপনার অবস্থাটা, নিজে ইন্ডাস্ট্রির লোক হয়ে আমার কাছে খোঁজ করছেন একনম্বর নায়িকার রেসিডেন্স? এই জন্যই আপনি বড়-সড় কাজ কিছু করতে পারছেন না! এবার থেকে আপনাকে এসবের খোঁজ রাখতে হবে। সেই ব্যবস্থা করে এসেছি। এটা বলতেই আপনাকে আজ ডেকেছি উপরে। পরের দিনই, দীপেন আমাকে পাঠাল মধুপর্ণার ফ্ল্যাটে। সঙ্গে দিল স্ক্রিপ্ট আর কন্ট্রাক্ট পেপার। রোলটা ইমপর্ট্যান্ট হলেও, খুবই ছোট। আমার খারাপ লাগছিল স্ক্রিপ্টটা হাতে তুলে দিতে। দেখলাম, ওর কোনও আক্ষেপ নেই। স্ক্রিপ্ট দেখে বেশ উৎসাহিতই হল। হিন্দি ছবিতে চান্স পাচ্ছে বলে কথা! বলিউডের সুযোগ কে-ই বা ছাড়তে চায়? সই করে দিল কন্ট্রাক্ট পেপারে। চা খেতে-খেতে অনেক গল্প হল, তখনই আপনার কথা তুললাম!"

থামল খোকনদা। কুনাল জানতে চাইল, "কী বললেন?"

"দেখলাম, আপনার সম্বন্ধে জানে। কিছু কাজ দেখেছে। বলল, 'ওঁর কাজ তো খুবই ভাল। বলুন ভাল কোনও গল্প নিয়ে ফিল্ম করতে। আমি অভিনয় করতে রাজি। কম পয়সাতেই করে দেব। বাজারি ছবি করতে করতে বোর হয়ে যাচ্ছি। নায়িকা থাকতে-থাকতে কয়েকটা ভাল রোল করে যেতে চাই। কুনালবাবুকে বলুন, নায়িকাপ্রধান ভাল গল্প নিয়ে আসতে।" কথা শেষ করে কুনালের দিকে তাকিয়ে রইল খোকনদা।

আর কন্ট্রাক্ট পেপার। রোলটা ইমপর্ট্যান্ট হলেও, খুবই ছোট। স্ক্রিপ্ট দেখে বেশ উৎসাহিতই হল ও।

কুনাল বুকভরে শ্বাস নিয়ে বলল, "আমি এখন যে গল্পই নিয়ে যাই না, ওর পছন্দ হবে না, আরও ভাল গল্প চাইবে। কাজটা আল্টিমেটলি হবে না।"

"আপনি এত পেসিমিস্ট কেন বলুন তো! চেষ্টা করতে দোষ কি? এই মুহূর্তে আপনার হাতে কোনও কাজ নেই। ক'টা গল্প ভাবতে অসুবিধে কোথায়?"

লোকটা তার মানে অনেকদিন ধরেই জানে, কুনালের হাতে কাজ নেই। বুঝতে দেয়নি। ধারের টাকা শোধ করতেও বলেনি। উল্টে কুনালের কাজের ব্যবস্থা করছে! কতটা কুনালের জন্য, কতটা মধুপর্ণার কারণে, আলাদা করা মুশকিল। মধুপর্ণা খোকনদার মেয়ের বয়সি। ওর উপর কিসের যে এত দুর্বলতা, আজ পর্যন্ত বোঝা গেল না! কুনাল বলল, "দেখুন খোকনদা, আপনি আমাদের ইন্ডাস্ট্রির অনেক খবর হয়তো রাখেন, কিন্তু পাল্‌স বোঝেন না। বোঝা সম্ভবও নয়। আমি যেহেতু ভিতরে থাকি, আর্টিস্টদের মন পড়তে পারি। সেই কারণেই বলছি, আপনার সঙ্গে মধুপর্ণার যে র‍্যাপোটা তৈরি হয়েছে, ওটা মেনটেন করুন। ছবি প্রোডিউস করতে বলুন আপনার বন্ধুর প্রোডাকশন হাউজটিকে। ছবিতে অবশ্যই মধুপর্ণাকে নেব।"

গম্ভীর মুখ করে কথাগুলো শুনে সামান্য বিরতি নিয়ে খোকনদা বলল, "নিজেই বুদ্ধি করে দীপেনকে বলেছিলাম। কিন্তু ওদের হাউজ় বাংলা ফিল্মে ইনভেস্ট করতে রাজি নয়। তবে দীপেন একথা বলেছে, যদি লাভজনক কোনও প্রজেক্ট ওকে দেখানো যায়, কিছু টাকা ইনভেস্ট করতে পারবে।"

প্রস্তাব সঙ্গে-সঙ্গে লুফে নিল কুনাল, "কতটা পারবে? তিরিশ, চল্লিশ? তা হলেই কিন্তু কেল্লা ফতে! বাকি টাকা ব্যাঙ্ক থেকে লোন বের করে নেব।"

খোকনদা বিরসমুখে বলল, "আপনি গল্প-স্ক্রিপ্ট রেডি করুন। দেখি, দীপেনের সঙ্গে কথা বলে..."

খোকনদাকে হতভম্ব অবস্থায় ফেলে কুনাল এগিয়ে গেল দরজার দিকে। সিঁড়ি ধরে নামতে-নামতে ভাবল, যদি এখন 'জাগরী'টা ফিল্ম করতে যায়, খোকনদার বন্ধুর টাকাতেই হয়ে যাবে। ছবিটার বাজেট খুব একটা বেশি হবে না। তবে মনে হয় না, 'জাগরী'র গল্প শুনে টাকা দেবেন ভদ্রলোক। তাই কুনালকে প্রথমে একটা সো-কল্ড কমার্শিয়াল ছবি তৈরি করতে হবে যার থেকে লাভ করে হাত দেবে 'জাগরী'তে। কমার্শিয়াল ছবিটার বাজেট যেহেতু বেশি, টাকা দেবে তিন পার্টি, খোকনদা, খোকনদার বন্ধু আর মধুপর্ণা। মধুর জন্য বড় রোলই ভাবা হবে। এক্ষেত্রে কুনাল যদি ওয়ান-ফোর্থ ইনভেস্ট করতে পারত, ব্যাপারটা আস্থাজনক হত। কিন্তু কুনালের হাত একেবারেই খালি।

ক্রমশ

অলঙ্করণ: নির্মলেন্দু মণ্ডল

সানন্দা শব্দভেদ

সূত্র পা শা পা শি

১ নিজ কথা, নিজ ভাষায়। ৩ বহুপ্রচলিত উক্তি। ৭ মাঞ্জা দেওয়া রেশমি সুতো। ৮ দলবল। ১০ রকম। ১১ তাৎপর্য জানে এমন। ১২ মন্ত্রপূত নলচালানো। ১৪ স্বর্গ। ১৫ ক্রমাগত দপ করে জ্বলা। ১৭ পুরাণের সপ্তপাতালের নিম্নতমটি। ১৯ রাজসভা। ২০ নমনীয় পদার্থের আন্দোলনের ভাব। ২২ সংগীতের বাঁধুনি। ২৩ উৎসব। ২৫ শক্তিশালী। ২৬ রাজ্য। ২৭ ক্লান্তি দূর হয়েছে এমন। ২৮ পরীক্ষাকেন্দ্রের পরিদর্শক।

১		২			■	৩		৪	৫
	■		■	■	৬	■	■	৭	
	■	৮		৯		■	১০		
১১			■	১২		১৩		■	■
	■	■	১৪		■	১৫			১৬
১৭		১৮		■	১৯		■	■	
■	■	২০		২১		■	২২		
২৩	২৪		■	২৫				■	
২৬		■	■		■	■		■	
২৭				■	২৮				

গত সংখ্যার সমাধান

চি	রা	চ	রি	ত	■	ল	ব্ধ	কা	ম
র	জ	ক	■	ম	■	ব	■	ত	ন্ত্র
দি	■	■	■	সু	ন	জ	র	■	কু
ন	ব	জা	ত	ক	■	■	দ	■	শ
■	র	■	স	■	ম	ন	ন	শী	ল
স	দা	চ	র	ণ	■	র্ম	■	ল	■
চ	■	ম	■	■	প	দা	ব	ন	ত
রা	■	ক	বি	ব	র	■	■	■	দা
চ	র	■	রা	■	কা	■	কা	বা	র
র	স	রা	জ	■	ল	জ্জা	জ	ন	ক

সূত্র চিরকুমার

১ সাধারণ মানুষকে নিয়ে যে দরবার। ২ সংসার, মর্ত্যলোক। ৪ নাড়া পাওয়ায় উপছে পড়া। ৫ নখ। ৬ আগুন। ৯ রামায়ণের মিথিলার রাজা। ১০ অর্থহীন উক্তি। ১৩ উড়ানি। ১৪ জাতককাহিনি নিয়ে অবনীন্দ্রনাথের লেখা। ১৬ সত্যজিৎ রায়ের বিখ্যাত চলচ্চিত্র। ১৮ ডেকে পাঠানো। ১৯ গাছের ছাল। ২১ বাচনভঙ্গি। ২২ বনে বিচরণকারী। ২৩ ফুলের রেণু। ২৪ রুপো।

টাকার আসার একটা রাস্তা কিছুদিন ধরেই দেখা যাচ্ছিল। আজ দুপুরে সেটা অনেকটাই ধূসর হয়ে গিয়েছে। দেবরাজের ভাই পারিজাত আজ ডেকে পাঠিয়েছিল ওর সাইটে, বেলেঘাটায়। হাউজিং কমপ্লেক্স তুলছে। কাজ প্রায় শেষের মুখে। অফিসে নিয়ে গিয়ে বসাল। জানতে চেয়েছিল, দুর্গাবাড়ির কত দূর কী হল?

কুনাল আশ্বস্ত করেছিল এই বলে, "হয়ে যাবে। চিন্তা করো না। প্রোপোজাল পুরোপুরি উড়িয়ে দেয়নি বিজন। আমার মনে হয়, ও চাইছে তোমার সঙ্গে একবার বসতে। ও বাড়ির ভাড়াটেরা তো খুবই গরিব পাবলিক, মোটামুটি ভদ্রস্থ একটা কমপেনসেশন না পেলে বেচারারা ভেসে যাবে। সেসব নিয়েই আলোচনা করবে তোমার সঙ্গে।"

উত্তরে পারিজাত বলেছিল, "তোমার বন্ধুকে ওই বেচারাদের কথা ভাবতে বারণ করো। ওদের ব্যাপারটা আমি বুঝে নেব। ওখান থেকে উঠতে ওর নিজের কত লাগবে বলুক আর ঠাকুরমাকে বাড়ি বিক্রির দলিলে সই করতে রাজি করাক। তুমি নিজেই কেসটা ম্যানেজ করতে পারবে। আমি ও বাড়ি থেকে একটা-একটা করে ভাড়াটে তুলতে শুরু করেছি। ওখানকার লোক যত কমবে, বিজনদা তত একা হয়ে যাবে। একটা সময়ের পর তোমার বন্ধু রাজি হবেই। মাঝখান থেকে তোমার যে কামাইয়ের সুযোগ এসেছিল, সেটা বেরিয়ে যাবে হাত থেকে!"

পারিজাতের সঙ্গে মিটিং সেরে ওঠার সময় কুনাল বুঝে গিয়েছিল, লাভের লাভ কিছুই হবে না। পারিজাতের থেকে টাকা পাওয়ার কোনও আশা নেই! দুর্গাবাড়ির লোকদের ব্যাপারে বিজন যে কতটা সহানুভূতিশীল, শেষবার কানাইপুরে গিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলে তা বুঝেছে কুনাল। পারিজাতের সাইট থেকে বেরনোর পরই মাথা থেকে তাই দুর্গাবাড়ির ব্যাপারটা ঝেড়ে ফেলেছিল কুনাল। তারপর আরও দু'টো মিটিং করল, একজন প্রোডিউসরের সঙ্গে আর একটা টিভি চ্যানেলের অফিসে। কোথাও কোনও টাকা বা কাজের আশ্বাস পাওয়া যায়নি। রোজকার মতোই নিরাশ চিত্তে বাড়ি ফিরে ছিল। খোকনদার সঙ্গে কথা বলার পর মনে হচ্ছে, পারিজাতের দেওয়া সুযোগটা এভাবে হেলায় হারানো ঠিক হচ্ছে না। দুর্গাবাড়ি বিক্রির ব্যাপারে একটু উদ্যোগ নেওয়া উচিত। যদি লাখদশেক মতো এসে যায়, খোকনদাদের নিয়ে একটা জয়েন্ট ভেঞ্চারে নেমে পড়া যেতে পারে।

এখনও দুপুর পুরোপুরি ফুরোয়নি, তাতেও প্ল্যাটফর্মের ভিড় দেখে অবাক হয়ে গেল অমিতেশ! ব্যান্ডেল লোকাল আসতেই অন্য প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে অমিতেশও উঠে পড়েছিল। ভেবেছিল, প্ল্যাটফর্ম এবার বুঝি ফাঁকা হয়ে গেল। বীরনগরে এসে ধারণাটা বদলেছে। যে ট্রেনটা চড়ে এখানে নেমেছে অমিতেশ, তারপর আরও তিনটে ট্রেন প্ল্যাটফর্মে থেমে চলে গিয়েছে, ভিড় কমেনি।

কানাইপুর থেকে বীরনগরের দূরত্ব তিন স্টেশনের।

কিছুক্ষণ পরই ফ্লোরে চলে এল এক দঙ্গল নর্তকী। ওদের মধ্যে ডলিকে দে

বীরনগর কানাইপুরের তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ শহর। কোর্ট আছে, মহকুমা সদর আরও কী সব সরকারি অফিস আছে। এই মুহূর্তে বীরনগর প্ল্যাটফর্মে ভিড় থাকায় সুবিধেই হয়েছে অমিতেশের। সে যে একের পর এক ট্রেন ছাড়ছে, কোথাও যাচ্ছে না, এটা কেউ লক্ষ করছে না! ইতিমধ্যে আরও দু'টো ট্রেন চলে গেল।

সময়টুকুর মধ্যে হয়তো কিছু বলতে বা শুনতে চেয়েছিল। সৌজন্যের খাতিরে অমিতেশ ওর নামটা শুধু জানতে চেয়েছিল। নাম বলে নাচের জায়গায় ফিরে গিয়েছিল ডলি।

সেদিন প্রায় ছ'-আট পেগের নেশা নিয়ে ডলিকে দেখেছিল অমিতেশ। পরের দিন ঘুম ভাঙার পর ও খেয়াল করল, নেশা

খে নিশ্চিন্ত হয় অমিতেশ। ডলিকে একই রকম আকর্ষণীয় পেন্টিং চরিত্র বলেই মনে হচ্ছিল!

প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চগুলো ট্রেন এলেই ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে, বসব-বসব করেও বসছে না অমিতেশ। মেয়েটা যদি ভিড়ের আড়ালে তাকে দেখতে না পেয়ে চলে যায়! নির্দিষ্ট সময়ের আগেই চলে এসেছে অমিতেশ। ইচ্ছে করে নয়, ট্রেন পেয়ে গিয়েছিল তাই। ডলি বলেছিল, 'মঙ্গলবার বিকেল চারটের সময় বীরনগর স্টেশনে আসবেন। মঙ্গলবার আমার ডিউটি থাকে না।' ডিউটি বলতে বার-এর ফ্লোরে নাচা। ডলি যে খুব ভাল নাচে, তা নয়। বার ডান্সারদের কেউই ভাল নাচে না। এরা শুধু মিউজ়িক সিস্টেমে বাজা গানের সঙ্গে শরীরী ছন্দের ঠেকা দেয়। যৌনতার একটা মিহি আবহ তৈরি করে মাত্র। ডলিরা তাই করছিল। ওই সামান্য নৃত্যশৈলীতেও ডলি পিছিয়ে ছিল অন্যদের চেয়ে। কিন্তু ডলি সেদিন সঙ্গিনীদের প্রগলভতার আড়ালে থেকেও তার প্রতি অমিতেশের মোহাবিষ্ট দৃষ্টিকে চিহ্নিত করেছিল। অমিতেশের ডলিকে কিছু বলার ছিল না, শুধু ডলির দেহসৌষ্ঠব পেন্টিংয়ের সাবজেক্ট হয়ে স্পার্ক দিচ্ছিল মাথায়! ওর হেঁটে আসাটা দেখেও মনে হচ্ছিল মিউজ়িয়ামে রাখা ফ্রেমে বাঁধানো বড় কোনও প্রাচীন পেন্টিং থেকে নেমে আসছে! অমিতেশ আশঙ্কা করছিল, মেয়েটি কাছাকাছি এলেই ধরা পড়ে যাবে ওর আসল রূপ। তা কিন্তু হয়নি, কী অমলিন কোমল রূপ! অমিতেশের মুগ্ধতাকে উদগ্র যৌন বাসনা বলেই ধরে নিয়েছিল ডলি। না নেওয়ারও কিছু নেই, ওই ধরনের মানুষই বসে থাকে ডান্স বারে। অমিতেশের মাথায় কী চলছে, ডলি কীভাবে বুঝবে? রীতি অনুযায়ী অমিতেশ ডলির দিকে টাকার নোট এগিয়ে ধরেছিল। খানিকটা সময় ব্যয় করে টিপসটা নিয়েছিল ডলি। ওই কেটে গেলেও, ডলি যেমনকার তেমন তার মনের চোখে রয়ে গিয়েছে! অমনই অমিতেশের মনে হতে থাকে, ডলিকে সেন্টার করে দারুণ কোনও পেন্টিং হওয়া সম্ভব।

কাল রাতে ফোন করেছিল নন্দা। বলেছিল, "পারলে কিছু স্টার্ট করতে?" অমিতেশ উৎসাহের সঙ্গে বলেছে, "এবার মনে হচ্ছে পারব।" উৎসাহের কারণটা অবশ্যই ডলি। প্রথম দিনই ওর ডলিকে বেশি ভাল লেগেছিল। এই বিভ্রম যে প্রতিবারই হবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। নেশা ছাড়া ডলিকে কেমন দেখতে লাগে, তা বোঝার জন্য লুক আউট বারে ফের গিয়েছিল অমিতেশ। কিছুক্ষণ পরই ফ্লোরে চলে এল এক দঙ্গল নর্তকী। ওদের মধ্যে ডলিকে দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছিল অমিতেশ। না, আগের বারের দেখায় কোনও বিভ্রম হয়নি, ডলিকে একই রকম আকর্ষণীয় পেন্টিং চরিত্র বলেই মনে হচ্ছিল! প্রায় আধঘণ্টা একটাই পেগ নিয়ে বসে রইল অমিতেশ। কিন্তু চোখছাড়া করছিল না ডলিকে। আগের দিনের মতো ডলি এগিয়ে এল এরিনা ছেড়ে। তবে এবার কোনও সঙ্গিনী ওকে ঠেলে পাঠায়নি। ডলি কাছে আসতেই একশো টাকার নোট এগিয়ে দিয়েছিল অমিতেশ। টাকাটা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ডলি। বোঝাই যাচ্ছিল, আলাপ জমাতে চায়। কথা খুঁজে না পেয়ে অমিতেশ বলেছিল, "তোমাকে ভীষণ সুন্দর লাগছে!"

খুব মজা পেয়েছিল ডলি। হাসতে হাসতে চলে গিয়েছিল টেবিল থেকে। অনেকটা সময় পার করে ফের এসেছিল অমিতেশের টেবিলে। ডলিকে আগের দিনের তুলনায় সপ্রতিভ লাগছিল। ডলি

দ্বিতীয়বার সামনে আসতে, অমিতেশ আগের মতোই টাকা বাড়িয়ে ধরে।
নোট ব্লাউজে ঢুকিয়ে ডলি বলেছিল, "তুমি তো কিছু খাচ্ছই না। হাঁ করে তাকিয়ে বসে আছ।" ডলি ঝকমকে শাড়ি পরেছিল সেদিন। ব্লাউজের কাটিং খুবই বিপজ্জনক। শরীরের আউট লাইন আরও ধারালো হয়ে উঠেছিল।
উত্তরে অমিতেশ বলেছিল, "বেশি ড্রিঙ্ক নিলে তোমাকে আবছা দেখছি। তাই আর খাচ্ছি না।"
সেদিন বাড়ি ফিরতে-ফিরতে অমিতেশের মনে হতে থাকে, এতদিন বসে থাকা আঙুলে ক্রমশ সাড় ফিরে আসছে। ইচ্ছে করলে এখনই সে বাড়ি ফিরে গিয়ে ডলিকে এঁকে ফেলতে পারবে! কিন্তু আঁকেনি অমিতেশ। তাগিদটাকে আরও জোরদার করার জন্য অপেক্ষা করেছে। মনে হয়েছে, ডলিকে আরও খুঁটিয়ে দেখতে পারলে ভাল হত। আরও বিভিন্ন ভঙ্গিমায়।
একটা দিন গ্যাপ দিয়ে অমিতেশ আবার গিয়েছিল লুক আউট বার-এ। ডলি নাচছিল ফ্লোরে। বেশি সময় না নিয়ে চলে এল কাছে। টাকা বের করেছিল অমিতেশ, সেদিকে না তাকিয়ে ডলি কৈফিয়ত তলবের সুরে বলেছিল, "সেদিন আমাকে না জানিয়ে চলে গেলে কেন?"
অমিতেশ অবাক হয়ে গিয়েছিল! উত্তর কী হবে, ভেবে পাচ্ছিল না। হতভম্ব অমিতেশকে আরও একবার চমকে দিয়েছিল ডলি। ওর চমশাটা চোখ থেকে খুলে নিয়ে রেখে দিল টেবিলে। তারপর একবার জিভ ভেঙিয়ে হাসতে-হাসতে ফিরে গেল! এই ছলাকলার অর্থটা ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি অমিতেশ।
সামনে এল পাক্কা আধ ঘণ্টা পরে। পকেট থেকে তৎপরতার সঙ্গে নোট বের করেছিল অমিতেশ। আগের বার হয়তো নিতে ভুলে গেছে ডলি। টাকাটা নিল ডলি। এই সুযোগে অমিতেশ বলেছিল, "তোমার সঙ্গে আমি আলাদা কোথাও দেখা করতে চাই।"
হাসি সরিয়ে ডলি সিরিয়াস মুখে জানতে চেয়েছিল, "নাইটে?"
তাড়াতাড়ি মাথা নেড়েছিল অমিতেশ, "না না, দিনের বেলা। কোনও রেস্তরাঁ হলে ভাল হয়।"
"বলুন, কোথায় যেতে হবে?" বলেছিল ডলি।
"আমি এখানকার রেস্তরাঁগুলো ভাল চিনি না। তুমি তোমার পছন্দ মতো বলো।"
"বীরনগর স্টেশন চেনেন?"
ঘাড় কাত করে 'হ্যাঁ' বলেছিল অমিতেশ। তখনই আজকের অ্যাপয়েন্টমেন্টটা করে। কিন্তু এখনও তো ডলি এল না। ঘড়ি দেখে অমিতেশ, চারটে পঁয়ত্রিশ। কথা ছিল চারটেয় আসবে। ইতিমধ্যে কত গাড়ি এল গেল, ডলির দেখা নেই। ডলি কোথায় থাকে, জানা নেই অমিতেশের। বীরনগর স্টেশনে দাঁড়াতে বলার কারণটাও জানে না। কিছু একটা সুবিধে নিশ্চয়ই হবে। তবুও পাত্তা নেই কেন?
চোখ সরিয়ে অমিতেশ যেদিকে তাকাল, সেখানেই পাওয়া গেল ডলিকে। পরনে বট্‌ল গ্রিন কামিজ, বুকের সামনে লাল-সোনালি জরির ঘন কাজ। চুল ক্লিপ করা। মেয়েটার হাইট অ্যাভারেজ বাঙালি পুরুষের চেয়ে একটু বেশি। ডলি এদিক-ওদিক তাকিয়ে খুঁজছে ওকে। অমিতেশ দৃষ্টি আকর্ষণের কোনও চেষ্টা করল না।
"কী হল, চিনতে পারছেন না, নাকি?" মুখোমুখি হয়ে কথাটা বলল ডলি।
চিন্তার ঘোরে এতটাই আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল অমিতেশ, ডলিকে এগিয়ে আসতে দেখেও মুখে কোনও ভাবান্তর হয়নি। এখন সম্বিত ফিরতে স্মিত হাসল।
ডলি বলল, "ফালতু একটা কাজে দেরি হয়ে গেল। আমি তো ভাবলাম আপনি কেটে পড়েছেন!"
স্বাভাবিক ঘরের মেয়ে হলে এক্ষেত্রে 'সরি-টরি' বলে কথা শুরু করত। ডলির কাছে সে ধরনের ব্যবহার আশা করা বৃথা। ওর সঙ্গে থাকতে গেলে এই অমার্জিত আচরণ সহ্য করতেই হবে। ডলি আচার-আচরণ অমিতেশের কোনও কাজে লাগবে না। ওটা নিয়ে তাই না ভাবলেও চলবে।
"কী হল, চলুন! হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলেন যে বড়?"
ডলির তাড়ায় সচল হল অমিতেশ, "হ্যাঁ, চলো।"
রেস্তরাঁ পছন্দ করার দায়িত্ব ছিল ডলির। অমিতেশকে নিয়ে একটা দোতলা মার্কেট কমপ্লেক্সে ঢুকল। কলকাতার মতো ঝাঁ চকচকে কোনও কমপ্লেক্স নয়। খোপ-খোপ দোকান, সরু প্যাসেজ। বোঝাই যাচ্ছে দায়সারা করে তৈরি। সম্ভবত মিউনিসিপ্যালিটি থেকে করে দেওয়া। দিনের বেলাতেই দোতলায় যাওয়ার সিঁড়ি অন্ধকার। এদিক ওদিক পড়ে আছে বিড়ি, সিগারেট, প্লাস্টিকের প্যাকেট। দেওয়াল চিত্রিত হয়েছে পানের পিকে। নিয়মিত ঝাড়পোঁছের কোনও বালাই নেই।
দোতলার একটা বিবর্ণ রেস্তরাঁর সামনে এসে দাঁড়াল ডলি। তার চেহারা দেখে পা এগোতে চায় না অমিতেশের। বাইরে থেকে দেখে নিয়েছে চেয়ার-টেবিলের অবস্থা, একেবারেই পুরনো, অপরিচ্ছন্ন। ভিতরে এই মুহূর্তে কোনও কাস্টমারও দেখা যাচ্ছে না।
অমিতেশ ডলিকে বলল, "এখানে নয়। কাছাকাছি কোনও এসি রেস্তরাঁ নেই?"
ডলি একটু ভেবে বলল, "আছে। তবে সেখানে কেবিন নেই।"
"চলো, ওখানেই যাই।"
একটু ঘুরে 'স্ট্যান্ডার্ড' নামে একটি রেস্তরাঁয় বসল অমিতেশরা। ব্যবস্থা খারাপ নয়। মালিক দোকানের নামের উপর বিশ্বস্ত থাকার চেষ্টা করেছে। পুরোটাই এসি। কেবিন না থাকলেও, কিউবক্‌ল আছে। যার একটাতে মুখোমুখি বসেছে অমিতেশ, ডলি। প্রথমে ডলি খুব সহজ ভঙ্গিতে অমিতেশের পাশে বসতে এসেছিল। কিন্তু অমিতেশ বাধা দিয়ে বলল, "তুমি উল্টো দিকে বসো। তাতে কথা বলতে সুবিধে হবে। ভাল করে দেখতেও পাব তোমাকে।"
"যাঃ শালা!" বলে উঠল ডলি। তারপর গিয়ে বসল মুখোমুখি।
স্টার্টার হিসেব সুপ অর্ডার করেছিল অমিতেশ। বয় দিয়ে গিয়েছে। এক চামচ মুখে দিয়ে ডলি বলেছে, "অ্যাঃ, কী বিচ্ছিরি খেতে! একেই সুপ বলে?" সুপের সঙ্গে দেওয়া ব্রেড স্টিক দুটো নিয়ে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না ডলি। আড়চোখে খেয়াল করছে অমিতেশ কী করে! সমাজে ডলির অবস্থানটা ওর আদবকায়দা থেকেই ধরা যায়। ওর বয়স অমিতেশের প্রায় অর্ধেক। অমিতেশ ধরেই নিয়েছিল, এই অসমবয়সি যুগলকে দেখে পথচারী, হোটেলের লোক একটু থমকাবে। তার উপর যদি ডলির পোশাক প্রসাধন চড়া মাপের হয়, তা হলে তো আর কথাই নেই — ভাবনা শেষ করেই নিজেকে শোধরায় অমিতেশ। ভাবে, আমি কেন এত রক্ষণশীল হচ্ছি। আমার প্রয়োজনেই তো ডলিকে আমি ডেকেছি। ডেকেছি, ওর পরিচয় জেনেই। তা হলে এত বাধো-বাধো ঠেকার কী আছে! সম্মানহানির ভয়?
সুপ অর্ধেক খেয়ে ফেলে রেখেছে ডলি। এখন স্টিক চিবোচ্ছে।

অমিতেশ ধরেই নিয়েছিল, এই অসমবয়সি যুগলকে দেখে হোটেলের লোক একটু থমকাবে।

শান্ত গলায় বলল, "কী বলবে বলছিলে? বলে ফ্যালো।"
ঠোঁট থেকে সুপের চামচ নামিয়ে অমিতেশ বলল, "আমি একজন আর্টিস্ট। তোমার ক'টা ছবি আঁকতে চাই।"
ডলি কিছুক্ষণ চেয়ে রইল অমিতেশের দিকে। তারপর বলল, "কী রকম ছবি, ন্যাংটো?"
সরাসরি 'ন্যাংটো' শব্দটা শুনে একটু হকচকিয়ে গেল অমিতেশ! কিন্তু কথাটা তো সত্যি, ডলিকে নানা ভাবে আঁকতে চায় সে। মাথা নিচু করে বলল, "ধরে নাও তাই। তবে সব কটাই ন্যুড ছবি হবে না।"
"কী ছবি?"
"তুমি যেরকম ছবির কথা বললে।"
সুপের প্লেট-বোওল একটু সরিয়ে হাত ঝেড়ে নিয়ে ডলি বলল, "না বাবা, আমি ওসবে নেই! বুলবুলি একবার বহুত ফেঁসে গিয়েছিল। একটা লোককে বিশ্বাস করে ছবি তুলিয়েছে, সেই ঢ্যামনাটা জনে-জনে ফটো বিক্রি করেছে। আমাদের পাড়াতেও চলে এসেছিল সেই ছবি। বুলবুলির তখন কী অবস্থা, ঘর থেকে বেরতে পারে না পর্যন্ত!"
ডলির ভুল ভাঙাতে অমিতেশ বোঝানোর সুরে বলল, "আমি ক্যামেরা দিয়ে ফোটো তুলব না। রং-তুলি দিয়ে আঁকব তোমাকে। অথবা কাঠে খোদাই করব তোমার শরীর। ফোটোর মতো সেগুলোর অনেকগুলো কপি করা যায় না। আর সেই ছবি যে এগজ্যাক্ট তোমার মতোই দেখতে হবে, তারও কোনও মানে নেই। ওখান থেকে তোমাকে না-ও চেনা যেতে পারে, আবার পারেও। তবে ওই ছবি গাদাগুচ্ছের তৈরি করা যায় না।"
বেয়ারা প্লেট-বোওল নিয়ে যাওয়ার পর ডলি জিজ্ঞেস করল, "ছবিগুলো নিয়ে তুমি কী করবে?"
দৃষ্টি শূন্যে ভাসিয়ে অমিতেশ বলল, "জানি না। আগে দেখি, কতটা কী আঁকতে পারি!"
ডলি কী বুঝল, বোঝা যাচ্ছে না। মাথা নিচু করে বসে রইল। বয় এসে প্লেট সাজাতে লাগল, মূল খাবারটা আনবে। অর্ডার আগেই দিয়ে রেখেছে অমিতেশ।
বয় চলে যেতেই ডলি জিজ্ঞেস করল, "তা এসব করতে আমায় কোথায় যেতে হবে?"
কথাটা বুঝতে সেকেন্ড খানেক সময় নিল অমিতেশ। তারপর বলল, "এখানেও হতে পারে। মানে, এই হোটেলে। ঢোকার সময় দেখলাম, এখানে থাকার বন্দোবস্তও আছে।"
"আমাকে রাতে থাকতেও হবে নাকি?" খানিক উদ্বিগ্ন হয়ে বলে উঠল ডলি।
"না, না। ঘরটা বুক করে রাখব। তুমি ছ'-সাত ঘণ্টা সিটিং দিয়ে চলে যাবে।"
"সিটিংটা আবার কী?"
ক্রমশ
অলঙ্করণ: নির্মলেন্দু মণ্ডল

সানন্দা শব্দভেদ

সূত্র পা শা পা শি

১ অধিকার না থাকা। ৫ আগাম বা বায়না। ৮ ধর্মীয় বিশ্বাসে মৃত্যুর পরে পাপীদের স্থান। ৯ বিলম্ব, দেরি। ১০ পুত্রস্থানীয়কে স্নেহসম্বোধনবিশেষ। ১২ সাধারণত, প্রায়শ। ১৫ শ্রদ্ধা দেখানো। ১৮ তল সমান নয় এমন। ২০ সংঘবদ্ধভাবে রান্না ও খাওয়াদাওয়া। ২২ জঘন্য বা বিশ্রী আচরণ। ২৪ যা না থাকলে বেকার। ২৬ দেবরাজ ইন্দ্র। ২৮ বিনা নিমন্ত্রণে হাজির হওয়া। ২৯ দখল করে আছে এমন।

১	২	৩		৪	■	৫		৬	৭
৮			■		■		■	৯	
	■	■	■	১০			১১	■	
১২	১৩		১৪		■	■		■	
■		■		■	১৫	১৬		১৭	
১৮		১৯			■		■		■
	■		■	■	২০				২১
	■	২২	২৩			■	■	■	
২৪	২৫	■		■		■	২৬	২৭	
২৮				■	২৯				

গত সংখ্যার সমাধান

আ	ত্ম	জী	ব	নী	■	প্র	ব	চ	ন
ম	■	ব	■	■	অ	■	■	ল	খ
দ	■	লো	ক	জ	ন	■	প্র	কা	র
র	সি	ক	■	ন	ল	চা	লা	■	■
বা	■	■	না	ক	■	দ	প	দ	প
র	সা	ত	ল	■	বা	র	■	■	র
■	■	ল	ক	ল	ক	■	ব	ন্দি	শ
প	র	ব	■	ব	ল	বা	ন	■	পা
রা	জ	■	■	জ	■	■	চ	■	থ
গ	ত	ক্ল	ম	■	ন	জ	র	দা	র

সূত্র পাশাপাশি

১ ক্লান্তিহীন। ২ সারি। ৩ শব্দটি দিয়ে নিন্দা, লজ্জা ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়। ৪ সপ্তাহের প্রথম দিন। ৫ তল পাওয়া যায় না এমন। ৬ মনোগতভাব। ৭ প্রীতিভরে পরস্পর হাত ধরে ঝাঁকুনি। ১১ অন্যথায়। ১৩ চামচ। ১৪ চমকিত। ১৬ মিষ্টান্ন তৈরির কাজ। ১৭ মুক্ত। ১৮ অপকার। ১৯ মহামারী। ২০ একেবারে নষ্ট। ২১ শ্রীকৃষ্ণ। ২৩ দান করানো হয়েছে এমন। ২৫ গন্ধহীন লাল ফুল। ২৬ বালিকা। ২৭ সব সময়।

অমিতেশ বলল, "তোমাকে আমি যেভাবে বসে অথবা দাঁড়িয়ে থাকতে বলব, সেভাবে থাকবে। তোমাকে দেখে ছবি আঁকতে থাকব আমি।"

"অতক্ষণ টানা একভাবে থাকতে হবে?" আশঙ্কিত হয়ে জানতে চাইল ডলি।

হেসে ফেলল অমিতেশ, "না না, রেস্ট নিতে পারবে। ফিরে এসে আবার পোজ় দেবে আগের মতো। সেসব আমি বুঝিয়ে দেব।"

কাঁটা-চামচ দিয়ে নুডল্‌স মুখে পুরল ডলি।

অমিতেশের প্রস্তাব ডলির কাছে নতুন। বোধ হয় এর আগে কেউ কখনও দেয়নি। রাজি হওয়া উচিত হবে কি না, সেটা ভেবেই একটু হয়তো অস্থির হয়ে পড়েছে।

"এই হোটেলে হবে না," হঠাৎ বলে উঠল ডলি।

অমিতেশ নিশ্চিন্ত হয়। যাক, প্রস্তাবে রাজি হয়েছে অন্তত, "এই হোটেলে নয় কেন?"

"এই এলাকায় আমার অনেক চেনা-জানা। খবর চলে যাবে পাড়ায়। ঝামেলা হতে পারে।"

ডলির বাড়ি যে কাছাকাছি কোথাও, এমনটাই আন্দাজ করেছিল অমিতেশ। ডলিকে যখন দেখতে পেল প্ল্যাটফর্মে, তার আগে কোনও ট্রেন থামেনি। তার মানে, ও আশপাশ থেকেই এসেছিল। কিন্তু ঠিক কী ধরনের ঝামেলার কথা বলছে ডলি, আন্দাজ করা যাচ্ছে না। এটুকু বোঝা যাচ্ছে, ডলি নিজের পেশা চালায় বাড়ি এবং পাড়াকে লুকিয়ে।

খাবার খেতে-খেতে অমিতেশ বলল, "তা হলে কোন হোটেলে যাওয়া যায়? তোমার চেনাজানা কিছু আছে? আচ্ছা, 'লুক আউট' মানে তোমরা যেখানে নাচো, ওখানে যদি কিছু ব্যবস্থা করতে পারি, তোমার অসুবিধে হবে?

"ওরে বাবা, ওখানে একদম চলবে না! আমাদের দাদা রাজিই হবে না। যদি বা হয়, তুমি যা টাকা দেবে হাফ ঝেড়ে দেবে দাদা।"

"দাদা মানে, ইন্দ্রজিৎ? ও কিন্তু আমার খুব চেনা।"

"ইন্দ্রজিৎটা আবার কে?"

"কেন, লুক আউট-এর মালিক!"

"না, না, ও নয়। বারের মালিক উল্টে দাদাকে টাকা দেয়। আমাদের ওখানে নাচতে নিয়ে গিয়েছে বলে," তারপর একটু থেমে বলল, "তুমি এত সব চক্কর বুঝবে না। অন্য জায়গা দেখো।"

ইতিমধ্যে অমিতেশের মাথায় অন্য একটা আইডিয়া এসেছে। ইন্দ্রজিৎকে বললে, ও নিশ্চয়ই আশপাশের কোনও হোটেলের সন্ধান দিয়ে দেবে। ও ডলিকে বলল, "ঠিক আছে, আমি দেখছি হোটেল। এবার তুমি কত চার্জ নেবে বল?"

"আমি তো এ ধরনের কাজ আগে কখনও করিনি। রেট কী করে বলি বলতো? তুমি অন্য মেয়েদের যা দাও, তাই দেবে না হয়।"

হেসে ফেলল অমিতেশ, "আমিও অনেক বছর হল লাইভ মডেল নিয়ে কাজ করিনি। এখন কী চার্জ চলছে, জানি না। তোমার যতটা পেলে সুবিধে হয়, সেটাই বল।"

খাওয়া শেষ হল ডলির। ন্যাপকিনে মুখ মুছতে-মুছতে ডলি তাকিয়ে রইল অমিতেশের দিকে। ঠোঁটের ফাঁকে মিহি একটা হাসি,

বলল, "মডেলরা এসবও করে! বইয়ে যাদের ছবি দেখি, তারা নিশ্চয়ই অনেক টাকা নেয়!"

এবার আর হাসি পায় না অমিতেশের। ডলির এই অজ্ঞতা আসলে প্রতিবন্ধকতা। প্রতিবন্ধীকে পরিহাস করার চেয়ে অন্যায় আর কিছুতে হয় না। ডলিকে বোঝাল, "মডেল অনেক ধরনের হয়। কাজও আলাদা-আলাদা। যেমন ধরো..."

অত শোনার ধৈর্য নেই ডলির। কথার মাঝেই জিজ্ঞেস করল, "কতদিন যেতে হবে তোমার কাছে? মানে, কতদিনের কাজ?"

"এখনই এগজ্যাক্ট বলতে পারব না। এক-দু' মাস তো লাগবেই।"

"পার ডে এক হাজার করে দিও," সটান বলে দিল ডলি।

এতটা চার্জ শোনার জন্য তৈরি ছিল না অমিতেশ, দমে যায় বেশ। খাবার বেশ খানিকটা পড়ে রইল। ন্যাপকিনে হাত-মুখ মুছে নিয়ে বলল, "রেটটা আমার পক্ষে বড্ড বেশি হয়ে গেল। হোটেল ভাড়া কত লাগবে, এখনই বোঝা যাচ্ছে না। সব মিলিয়ে চাপ পড়ে যাব।"

ডলি কোনও উত্তর করল না। তাকিয়ে রইল অমিতেশের মুখের দিকে। ঠোঁটের ফাঁকে মিহি একটা হাসি, যাতে খানিক ব্যঙ্গের আভাস! ডলির অভিব্যক্তি যেন বলছে, আমাকে কি এতটাই সস্তা ভেবেছিলে!

অতি বিনয়ে দাম কমানোর একটা ক্ষীণ প্রয়াস চালাল অমিতেশ, "এই কাজে নাচের মতো অত পরিশ্রম নেই। জাস্ট কয়েকটা পোজ় নিয়ে স্থির হয়ে থাকা। মাঝে রেস্ট, খাওয়া-দাওয়া সব থাকছেই।"

হঠাৎই বুঝতে পারে, ওর চটি পরা পায়ের উপর ডলি নিজের খালি পা-টা তুলে দিয়েছে! আদর করছে পা দিয়ে! গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায় অমিতেশের! মেয়েটার মধ্যে যে হাই ভোল্টেজ কাম আছে, রীতিমতো উপলব্ধি করে সেটা! খুব সাবধানে থাকতে হবে, ওকে আঁকার আগেই পুড়ে না যায় অমিতেশ! ধীরে-ধীরে পা সরিয়ে নিয়ে অমিতেশ ডলির মুখের দিকে তাকায়। মেয়েটার চোখে-মুখে এখন সর্বনাশা হাসি।

"গায়ে লাগছে, অত টাকা দিতে? ঠিক আছে বাবা, তুমি যা ভাল বোঝো দিও," একটু থেমে বলল, "আসলে বেশি কেন চাইছি জানো, তোমার কাজটা করতে হলে নাচের ধান্দাটা ছেড়ে দিতে হবে। দু'তিন মাসের বেশি আমাকে তোমার লাগবে না। তখন নাচের কাজটা ফেরত না-ও পেতে পারি। সেই জন্যই কিছু টাকা জমিয়ে রাখব ভাবছিলাম।"

যাতে ব্যঙ্গের আভাস! ডলির অভিব্যক্তি যেন বলছে, আমাকে কি এতটাই সস্তা ভেবেছিলে!

কথাটায় যুক্তি আছে। সেটা বুঝে অমিতেশ বলল, "তোমার ঠিক কত টাকা প্রয়োজন, স্পেসিফিক্যালি বলো। আমার সাধ্য থাকলে দেব, নয়তো কাজটা করবই না।"

অমিতেশের মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল ডলি। তারপর বলল, "একটা সত্যি কথা বলি? তোমাকে আমার ভাল লেগেছে বলেই কাজটাতে রাজি হচ্ছি।"

ডলি যে এভাবে অতর্কিতে বাঁক নেবে, বিন্দুমাত্র আন্দাজ করতে পারেনি অমিতেশ। এখন একেবারে হতবাক হয়ে বসে রইল সে। ডলি ফের বলল, "কথাটা কী বললাম, মাথায় ঢুকল কিছু? বুঝতে পারলে মানেটা?"

মানেটা বুঝেছে অমিতেশ। খুবই সহজ! একই সঙ্গে ঝুটো পয়সার মতো অচলও! বোকা মেয়েটা তা জানে না।

গত কয়েকদিনের মতো আজও ধড়ফড় করে ঘুম ভাঙল বিজনের। উঠে বসেছে মশারি ঘেরা বিছানায়। ঘর ফাঁকা। জানলা, দরজার পর্দা গলে ঢুকে এসেছে সকালের আলো। এ পাড়ার পুরনো দু'টি স্মারক হল, পাড়ার নাম আর বিজনদের বাড়ি! এতদিন পরও একেবারে অপরিবর্তিত। বিজনদের বাড়িটা পাকা ছাদের হলেও, একটা ইতিহাস-ইতিহাস টাইপ ব্যাপার আছে। বিজনদের বাড়ির চৌহদ্দিতে রয়ে গিয়েছে পুরনো সময়টা। সেটা আরও জীবন্ত হয়ে ওঠে ভোরবেলা কেরোসিন স্টোভের গন্ধে! ভিড় করে আসে

অনেক স্মৃতি। বিজনের মনেই হয় না, জীবন থেকে চুয়াল্লিশটা বছর খরচ হয়ে গিয়েছে। ঘুম থেকে ওঠার পর মায়ের চা দেওয়া অবধি বিজন অপেক্ষা করে কারও ফিরে যাওয়ার খবর শোনার জন্য। চায়ের কাপ হাতে দিয়ে মা বলবে, 'অমুক এসেছিল। আমি বললুম তুই ঘুমোচ্ছিস, ডেকে দেব কি না? সে বলল, না থাক। পরে আসব।' দিনপাঁচেক হয়ে গেল বিজন কৃষ্ণার ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে এসেছে এ বাড়ি। হ্যাঁ, 'কৃষ্ণার ফ্ল্যাট'। ঝগড়ার চূড়ান্ত মুহূর্তে ঠিক এই কথাটাই মনে করিয়ে দিয়েছিল কৃষ্ণা। বলেছিল, 'আমার বাড়িতে থাকতে হলে, আমার কথা মানতে হবে বইকি।'

কৃষ্ণার হাবেভাবে একথা হামেশাই প্রকাশ পায়। কিন্তু এভাবে মুখের উপর বলে দেবে, তা-ও আবার মেয়ের সামনে, ভাবতে পারেনি বিজন। তড়িঘড়ি ব্যাগ গুছিয়ে সাইকেল চেপে এ বাড়ি চলে এসেছে। মায়ের একটা বড় গুণ হচ্ছে, দুশ্চিন্তা গোপন করতে পারা। কোনও অবস্থাতেই মাকে কোনওদিন গোমড়ামুখো হয়ে বসে থাকতে দেখেনি বিজন! ছেলেকে কাঁধে ব্যাগ নিয়ে ঢুকতে দেখে, মা মুচকি হেসে বলেছিল, "বেশ বড় ধরনের মান অভিমান মনে হচ্ছে! ভাল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এরকম একটু না হলে টান তৈরি হয় না।" মা কথাগুলো এমনভাবে বলছিল, যেন সদ্য বিয়ে দেওয়া মেয়ে রাগ করে ফিরে এসেছে বাপের বাড়ি! বিজনের মাথা তখন খুব গরম, মায়ের কথার উত্তর দেয়নি। ঘরে ঢুকে ফ্যান চালিয়ে বিছানায় চিত হয়েছিল। বাবা-মা কিছুই জানে না। চুয়াল্লিশ বছরের পরিণত সন্তানের দাম্পত্য সমস্যার সমাধান তারা কতটুকুই বা করতে পারবে! বিশেষত পুত্রবধূ যখন অত শিক্ষিত, উঁচুঘরের মেয়ে। দু'জনেই হয়তো অপেক্ষা করছে, বিজন নিজে থেকে যদি কিছু বলে! কী বলবে বিজন? বলা মানেই অপমানিত হওয়ার ঘটনাটা বর্ণনা করা। ছেলের অপমান কি বাবা-মার শুনতে ভাল লাগবে? তা ছাড়া আর একটা সমস্যাও আছে, ছেলের নিগৃহীত হওয়ার ঘটনা শুনে তারা খুবই ব্যথিত হবে। বলবে, 'দরকার নেই তোর আর ওবাড়িতে যাওয়ার। তুই এখানেই থেকে যা।' কথাটা রাখতে পারবে না বিজন। সে রোজ ভোরবেলা ঘুম থেকে ধড়মড় করে উঠে বসে এই আশঙ্কায়, বুলান কিংবা কৃষ্ণা হয়তো ডাকতে এসেছিল! ঘুমোচ্ছে জেনে ফিরে গিয়েছে। অর্থাৎ ওই দু'জনের একজন যদি নিতে আসে, বিজন ফিরে যাবে কৃষ্ণার ফ্ল্যাটে। পাঁচদিন আগের রাগ এখন অনেকটাই ঝাঁঝহীন! বুঝতে পারছে, খুবই হঠকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণাও রাগের মুহূর্তে বলে ফেলেছে অপমানজনক কথাটা। রাগ করার ন্যায়সঙ্গত কারণও আছে। সেটাকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব না দিয়ে বিজন চলে এসেছে নিজের বাড়ি।

ক্রমশ

অলঙ্করণ: নির্মলেন্দু মণ্ডল

সানন্দা শব্দভেদ

সূত্র পা শা পা শি

১ তিব্বতি বৌদ্ধ পুরোহিত। ৩ গণেশ। ৭ দ্বিত্বে ক্রোধাদি লক্ষণ প্রকাশক। ৮ স্বপক্ষীয় লোকজন। ১০ শ্রীকৃষ্ণের সখা। ১১ অঙ্কশাস্ত্র। ১২ সমুদ্রসহ বিরাজিতা। ১৪ এক কুঁচের সমান ওজন। ১৫ সন্ন্যাসীর আখ্যা। ১৭ ঋণের দলিল। ১৯ বক্ষস্থল। ২০ রোজা পালনের মাস। ২২ পীতবর্ণ কন্দ। ২৩ নব্বই সংখ্যা। ২৫ শ্রীকৃষ্ণ। ২৬ বিষ। ২৭ অন্য লোকের সামনে কিন্তু আড়ালে। ২৮ জরা ও মৃত্যু নেই এমন।

১		২				৩		৪	৫
					৬			৭	
		৮		৯			১০		
১১				১২		১৩			
			১৪			১৫			১৬
১৭		১৮			১৯				
		২০		২১			২২		
২৩	২৪			২৫					
২৬									
২৭					২৮				

গত সংখ্যার সমাধান

অ	ন	ধি	কা	র		অ	গ্রি	ম	ক
ন	র	ক		বি		গা		ত	র
ল				বা	প	ধ	ন		ম
স	চ	রা	চ	র			তু		র্দ
	ম		কি		অ	ভি	বা	দ	ন
অ	স	ম	ত	ল		য়ে		রা	
নু		ড়			ব	ন	ভো	জ	ন
প		ক	দা	চা	র				ট
কা	জ		পি		বা		বা	স	ব
র	বা	হু	ত		দ	খ	লি	দা	র

সূত্র চলে এল

১ তরল হয়ে স্রোতের মতো ক্ষরিত হচ্ছে এমন। ২ প্রার্থনা, উপাসনা। ৪ সঙ্গে সঙ্গে দিতে হয় এমন। ৫ কোমল বা মৃদু। ৬ গুরু গোবিন্দের মতাবলম্বী শিখ সম্প্রদায়বিশেষ। ৯ নিবাস। ১০ উত্তম উপায়। ১৩ সংগীতের অলংকার। ১৪ প্রকার। ১৬ মেঘের গর্জনের মতো গম্ভীর। ১৮ লটারি। ১৯ বস্ত্রাদির জমি। ২১ সীতার আসল নাম। ২২ ডাক-পিয়ন। ২৩ যার পর্বতে জন্ম। ২৪ গাড়ুজাতীয় জলপাত্র।

চিত্রপট

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

অভিমান তো হবেই কৃষ্ণার, বিজন এভাবে বাড়ি ছাড়াতে ছোটও হতে হচ্ছে শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে। ঠিক আছে, কৃষ্ণা না আসুক, বুলানকে দিয়ে তো ডেকে পাঠাতে পারে বাবাকে? আশ্চর্য ব্যাপার, বুলান একবারও এল না! অথচ ঝগড়াটা ওকে নিয়েই। বিজন এবাড়ি থেকেই ওয়র্কশপ যাতায়াত করছে। ওখানেও তো আসতে পারে মা অথবা মেয়ে। নিদেনপক্ষে কাউকে দিয়ে ফিরে আসার দু' কলম চিঠিও তো পাঠাতে পারে। বিজন পা তুলেই আছে ফ্ল্যাটে ফেরত যাওয়ার জন্য।

তবে বিজন এ বাড়িতে থাকার কারণে একজন বিষম আহ্লাদিত! সে শিউলি। তার খুশির ঠেলাতেই হয়তো বিজনকে মাথা নিচু করে কৃষ্ণার ফ্ল্যাটে ফিরে যেতে হবে! বিজন যখন কৃষ্ণার উপর রাগ করে চলে এল এখানে, চোখ বুজে শুয়েছিল বিছানায়, বাবা-মা কোনও ধরনের প্রশ্ন করে ওকে বিরক্ত করেনি। অত মাথা গরম করে আসার পর একটু ঘুমিয়েও পড়েছিল। চোখ খুলতে প্রথমেই দেখেছিল শিউলির মুখ। চোখে চিকচিক করছে আনন্দ। ঘষা গলায় বলেছিল, "আমি জানতাম তুমি একদিন আসবে, সব ছেড়ে দিয়ে।" শিউলির যেহেতু মাথা খারাপ, কথাটা হজম করে নিয়েছিল বিজন। কিন্তু আগে শিউলি কখনও এত কাছে আসেনি, চোখের সামনে ওর ব্লাউজ উপচানো বুক, সদ্য পেকে ওঠা খেজুরের মতো ঠোঁট, আঠালো চাউনি, বটের ঝুড়ির মতো নেমে আসা চুল যেন পাপ আড়াল করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিল বিজনকে! সতর্ক হয়েছিল বিজন। গম্ভীর গলায় শিউলিকে বলেছিল, "মাকে এক কাপ চা দিতে বলো তো।" ব্যস, সেই থেকে যেন তার সেবাদাসী বনে গেল শিউলি। বিজন যতক্ষণ বাড়িতে থাকে, শিউলির চোখ সব সময় ওর দিকে। এমনকী, সাইকেলটাও মুছতে লাগল ওয়র্কশপ বেরনোর আগে! তখন আর মাথা ঠিক রাখতে পারেনি বিজন, রান্নাঘরে গিয়ে মাকে বলেছিল, "তোমার ওই পাগলিকে সামলাও। ভীষণ বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। সাইকেল মুছছে এখন। এমন করতে থাকলে আমি কিন্তু বাড়িভাড়া করে অন্য কোথাও থাকব!" মা গম্ভীরমুখে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে দালানে এসেছিল। শিউলি তখন একমনে উঠোনে সাইকেল মুছে যাচ্ছে। মা রীতিমতো চেঁচিয়ে বলে উঠেছিল, "অ্যাই শিউলি, তুই ভেবেছিসটা কী! ওঠ ওখান থেকে। তোকে কে বলেছে পরিষ্কার করতে?" থতমত খেয়ে গিয়েছিল মেয়েটা! মায়ের কাছ থেকে হয়তো প্রথম বকা খেল। এখানে আসার পর থেকে মা-ই ওকে আগলে রেখেছে। শাশুড়ির ধার মাড়ায় না। বকুনি খেয়ে শিউলি মোছার ন্যাকড়া ফেলে ফাঁদতে-ফাঁদতে ওদের ঘরে ঢুকে গিয়েছিল। সেদিন ওয়র্কশপে যাওয়ার সময় ওরও যে জাজটা দমে ছিল। সাইকেল চালাতে-চালাতে মনে হচ্ছিল, শিউলির হাতের ছোঁয়া সাইকেল থেকে ক্রমশ বিজনের পায়ের পাতায়, হাঁটুতে এসে লাগছে। রাতে কাজ থেকে ফিরে বিজন যেচে কথা বলেছে

চোখ খুলতে প্রথমেই দেখেছিল শিউলির মুখ। চোখে চিকচিক করছে অ

শিউলির সঙ্গে। আবার সেই রাতেই এমন একটা কাণ্ড ঘটাল, বিজন ভীষণ অস্বস্তিতে পড়ে গেল। রাতের ঘটনাটা জানতে পারল পরের দিন সকালে। কুনাল ফোন করে ওকে জানিয়েছিল, আগের দিন রাতে বিজনের ফোনটা ধরেছিল শিউলি! কিন্তু বিজন তো বাজার বিজনের হাতে ছাড়বে না। বাজার করতে ভালবাসে বাবা, বিজনের টাকায় কেনাকাটা হোক, সেটাও চায় না। বিজনেরও সকালে সবজি বাজার যাওয়ার নেশা আছে। এই সময়টা তাই মনটা কেমন যেন উসখুস করে। ও বাড়িতে কে যে এখন বাজার

নন্দ। ঘষা গলায় বলেছিল, “আমি জানতাম তুমি একদিন আসবে, সব ছেড়ে দিয়ে।”

বিছানার পাশেই ফোনটা রেখে শোয়, তা হলে কি শিউলি রাতে ওর ঘরে এসেছিল...কুনালের কাছ থেকে ফোনের ব্যাপারটা জানার পরই বিজন বাবা-মাকে শিউলির কীর্তি জানিয়ে বলেছিল, “এবার না হয় ঘটনাটা কুনালের ক্ষেত্রে ঘটেছে। আমার ব্যবসার কোনও পার্টির ফোন ধরে যদি উল্টোপাল্টা কিছু বলে দেয়, তা হলে কিন্তু বিরাট সমস্যা হয়ে যাবে। ফালতু লস খেতে হবে আমাকে। পাগলি বলে তো পার্সোনাল ফোন ধরতে অ্যালাও করা যায় না।”

বাবা ব্যাপারটাকে সিরিয়াসলি নিয়েছিল। সেদিন রাতে বাড়ি ফিরে শিউলিকে না দেখতে পেয়ে বিজন মায়ের কাছে জানতে চেয়েছিল, “তাকে দেখছি না যে বড়! অন্য দিন তো সামনে ঘুরঘুর করে।” মা উঠোনের দিকে আঙুল তুলেছিল। প্রথমে ব্যাপারটা ধরতে পারেনি বিজন। তারপর চোখে পড়ে উঠোনের মাঝামাঝি একটা দাগ কাটা হয়েছে। চাঁদের আলোয় যা খুবই অস্পষ্ট। দাগের ওপারে মুরারি কাকার অংশ। মা বলেছিল, “আজ একেবারে দাগ কেটে বলে দিয়েছি, খবরদার এদিকে আসবি না।” দু’দিন হয়ে গেল, সেই দাগ মেলায়নি। মা বোধ হয় রোজ নতুন করে লাঠি দিয়ে আঁক কেটে দিচ্ছে! ওপারে শিউলিকেও দেখা যাচ্ছে কম। বারদু’য়েক চোখাচোখি হয়েছে বিজনের সঙ্গে। কী করুণ, ভীরু চাউনি শিউলির। মায়া লেগেছে বিজনের। কিন্তু কিছু করার নেই, পাগলকে সাঁকো না দেখানোই উচিত।

জলখাবার খেয়ে সাইকেল চেপে বেরিয়ে পড়েছে বিজন। যাবে ওয়র্কশপে। বাজার যাওয়ার দরকার পড়ে না। বাবা এ বাড়ির করছে, মা-মেয়ে কী খেয়ে অফিস-স্কুল যাচ্ছে, কে জানে! অসুবিধে তো হচ্ছে নিশ্চয়ই। বিজন এক-আধবার ভেবেছে, বাজার করে রেখে আসবে ফ্ল্যাটের রকে। ইচ্ছেটা জোরালো হয়নি। কৃষ্ণা যে ভাষা-ভঙ্গিতে বিজনকে অপমান করেছে, তারপর ওসব করতে গেলে ন্যাকামি মনে হবে! কথা কাটাকাটির সূত্রপাত খুব নিরীহভাবেই শুরু হয়েছিল। বুলানের বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎপর্বের সমস্ত ডিটেল কৃষ্ণাকে শোনাচ্ছিল বিজন। তা গোড়াটা শুনেই কপালে ভাঁজ পড়ে গিয়েছিল কৃষ্ণার। গোটাটা শুনে বলল, “পাকামির একটা সীমা আছে। ‘প্রেম’ কাকে বলে তাই জানল না, তার উপর আবার বিতৃষ্ণা! ওদিকে বলছে, ওই ছেলের সঙ্গেই স্পেশ্যাল রিলেশন!” তারপর গলা পাল্টে বিজনকে বলেছিল, “দ্যাখো, তোমার চেয়ে সাংসারিক বুদ্ধি আমার অনেক বেশি। তুমি সায়নের সঙ্গে ফের কথা বলো।”

“কী বলব?” সবিনয়ে জানতে চেয়েছিল বিজন।

কৃষ্ণা বলেছিল, “বলবে, বুলানকে বিয়ে করার জন্য পুরোপুরি মানসিক প্রস্তুতি নিতে। এখনই করতে হবে না, কিন্তু দু’বাড়ির মধ্যে কথাবার্তা পাকা হয়ে থাক।”

“সায়ন তো মানসিকভাবে তৈরি হয়েই আছে রিলেশনটা পাকা করে নিতে। ব্যাপারটা বাড়িতে জানাতেও ওর কোনও আপত্তি নেই। বুলানই তো রাজি হচ্ছে না।”

“বুলানের দিকটা আমি দেখছি। তুমি ওকে বলো বাড়িতে জানিয়ে দিতে। আমাদের ফ্যামিলির পুরো ব্যাকগ্রাউন্ডটা যেন বলে।”

কৃষ্ণার কথায় হোঁচট খেয়েছিল বিজন। অবাক হয়ে জানতে

চেয়েছিল, "পুরো ব্যাকগ্রাউন্ড মানে?"
বরফের মতো ঠান্ডা, কঠিন গলায় কৃষ্ণা বলেছিল, "তোমার মা'র ব্যাপারটা। উনি যে ব্রাহ্মণ নন, এটা আমাদের জানিয়ে রাখা উচিত।"
গলা শুকোতে শুরু করেছিল বিজনের! পা বসে যাচ্ছিল মেঝেতে, যেন চোরাবালি! এই অনুভূতিটা তার বহুদিনের সঙ্গী। যেদিন থেকে জেনেছে, তার পরিচয়ে গোঁজামিল আছে! আর গরমিলের উপাদানটি হচ্ছে তার সবচেয়ে কাছের মানুষ, মা।
কৃষ্ণা ফের বলতে শুরু করেছিল, "সায়নও হয়তো বিষয়টা জানে না। বুলান নিশ্চয়ই ওকে বলেনি। বলতে কুণ্ঠা হয়েছে। মনে হয়, আমাদের এই ব্যাকগ্রাউন্ডের কারণে বুলান এক ধরনের আশঙ্কায় ভোগে। ভাবে কাউকে ভালবাসতে গেলে, সে যদি এই কারণেই তাকে ফিরিয়ে দেয়। তাই সায়নকে পছন্দ করা সত্ত্বেও স্থায়ী সম্পর্কে যেতে ভয় পাচ্ছে।"
তারপর বিজনের দিকে না তাকিয়েই বলতে থাকল, "তুমি সায়নকে ডেকে পুরোটা জানাবে। আমার ধারণা, বিষয়টা জানার পর সায়ন পিছিয়ে যাবে না। ও এখন একটা ঘোরের মধ্যে আছে।"
কথা শেষ করে কৃষ্ণা একবারও বিজনের দিকে তাকায়নি। উঠে গিয়েছিল মেয়ের ঘরে। বুলানের ঘর থেকে চেঁচামেচি ভেসে আসেনি। অর্থাৎ মেয়েকে চটায়নি কৃষ্ণা। রাতের খাবার তিনজন এক টেবিলে বসে খাওয়া হল। বুলানের রিলেশনের প্রসঙ্গ আর উঠল না।
পরের দিন সকালে বিজন একটু তাড়াতাড়ি বেরচ্ছিল কাজে। কৃষ্ণা বলেছিল, "সায়নকে আজই ডেকে পাঠিয়ে কথাগুলো বলে নিও। ও চলে যাওয়ার পর ফোন করো আমায়।"
বিজনের যে তখন কী হল, কৃষ্ণাকে ফট করে বলে দিল, "আমি ওসব কথা সায়নকে বলতে পারব না। তুমিই বোলো।"
কৃষ্ণা স্থির চোখে বিজনের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "সংসারে থাকতে গেলে, পার্সোনাল ইচ্ছে অনিচ্ছেগুলোকে একটু সাইডে রাখতে হয়।"
বিজনের যেন রোখ চেপে গিয়েছিল, আজ সে কিছুতেই হারবে না! কৃষ্ণা বহুবার তার অস্তিত্বের সবচেয়ে দুর্বল জায়গায় আঘাত করে এসেছে। আর কতদিন সহ্য করবে সে? তাই বলেছিল, "ব্যাকগ্রাউন্ডটা যেহেতু একান্তই আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, সেটাকেও সংসারের বাইরে রাখো।"
"আমি রাখতে চাইলে তো চলবে না। ছেলের বাড়িতে সবকিছু জানিয়ে না রাখলে পরে কথা শুনতে হবে তিনজনকেই।"
বিজন ধৈর্য রাখতে না পেরে বলে, "তুমি নিজের মতো যুক্তি সাজিয়ে আমাকে যা করতে বলবে, তাই করতে হবে নাকি?"
কৃষ্ণাও বশে রাখতে পারেনি মেজাজ। বলেছিল, "হ্যাঁ, করতে হবে। এই সংসারে যখন আছো আর সংসারটা যখন আমার কেনা ফ্ল্যাটের মধ্যে চলছে, তখন আমার কথাই শুনতে হবে তোমাকে।"
ক্রমশ
অলঙ্করণ: নির্মলেন্দু মণ্ডল

সানন্দা শব্দভেদ

সূত্র পা শা পা শি

১ কাজ বা চাকরি থেকে একদিন যা নিতে হবে। ৪ সাধক কবি। ৭ বিজয় নিশান। ৮ মূল কারণ। ১০ এড়াইয়া যাওয়া। ১১ শুনে শুনে লেখা। ১৩ খারাপ, মন্দ। ১৪ হাতি। ১৬ রাজস্ব, খাজনা। ১৭ নিম্নদেশ। ১৮ নীচে নামিয়ে আনা। ২০ কর্মসম্পাদক। ২১ কমের ভাব। ২৩ ভাবই জগতের মূল চালিকা শক্তি--- এই দার্শনিক মত। ২৫ মন্দ ভাগ্য। ২৬ সমান ওজনবিশিষ্ট।

১		২	৩		৪		৫		৬
		৭							
৮	৯						১০		
			১১			১২			
১৩								১৪	১৫
১৬								১৭	
		১৮		১৯					
২০							২১		২২
				২৩		২৪			
২৫						২৬			

গত সংখ্যার সমাধান

দ	লা	ই	লা	মা		গ	জা	ন	ন
র		বা			খা			গ	র
বি		দ	ল	ব	ল		সু	দা	ম
গ	ণি	ত		স	সা	গ	রা		
লি			র	তি		ম	হা	রা	জ
ত	ম	সু	ক		বু	ক			ল
		র	ম	জা	ন		হ	লু	দ
ন	ব	তি		ন	ট	ব	র		গ
গ	দ			কী			ক		ভী
জ	না	ন্তি	কে		অ	জ	রা	ম	র

সূত্র ছকে ছকে

১ পৃথিবী। ২ জনসমাজ। ৩ 'কথায় আছে যে সয় সে ....'। ৪ নৃপতিদের ধারাবাহিক বংশতালিকা। ৫ চোখ বন্ধ করা। ৬ আগুন। ৯ শ্রীকৃষ্ণ। ১১ উপলব্ধি, জ্ঞান। ১২ অত্যন্ত ধারালো। ১৩ ফুলও বোঝায়, পাখিও বোঝায়। ১৪ ক্লান্তি দূর হয়েছে এমন। ১৫ এর অপর নাম জীবন। ১৮ প্রশংসনীয় কর্ম। ১৯ নতুনত্বপ্রাপ্তি। ২০ বন্ধুভাব। ২১ ঘোড়ার চলার গতিভঙ্গি। ২২ চ্যাপটা হাঁড়িবিশেষ। ২৪ আবাস, বাসস্থান।

চিত্রপট

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

যে কথাগুলো বলল কৃষ্ণা, তার বদলে ও যদি একটা চড় মারত গালে, তা হলেও হয়তো অত দিশেহারা লাগত না বিজনের! হাবেভাবে তো সব সময়ই প্রকাশ করছে কৃষ্ণা, যে সে মালিক! মুখের উপর বলে দেওয়া মানেই, এবার নিজের রাস্তা দেখো। বিজনও আর সময় নষ্ট করেনি, নিজের জামাকাপড়, কাগজপত্র ব্যাগে গুছিয়ে নিয়েছে। বিজনের মাথায় একটা বিষয় কিছুতেই ঢুকছে না, এতটুকু অনুতপ্ত হল না কৃষ্ণা আজও! ও হয়তো অনেকদিন ধরেই চাইছিল, বিজন আলাদা হয়ে যাক।

দুর্গাবাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছে বিজন। বাড়ির সামনেটা বড্ড ফাঁকা ফাঁকা লাগে। প্রোমোটারের সঙ্গে লড়ে আর বোধ হয় পারা যাবে না। দুর্গাবাড়ির লোকেদের অত্যন্ত কম পয়সা দিয়ে হাতিয়েই নেবে প্লটটা। শ্যামলকে গোপনে টাকা দিয়ে উঠিয়েছে প্রোমোটার, রতন জ্যাঠার বেলাতেও তাই। ওরা দু'জনেই দুর্গাবাড়ি ছাড়ার আগে বিজনের কাছে আসেনি। বিজন জানতেও পারেনি, ঠিক কত টাকা পেয়ে উঠে যাচ্ছে তারা। এতেই বোঝা যায়, বিজনের প্রতি কোনও আস্থা নেই তাদের। পরিস্থিতি যেদিকে , বিজনকেও হয়তো নামমাত্র টাকায় উঠে যতে হবে! পারিজাত বুদ্ধি করেই ওদের সঙ্গে দেখা গছে অনিশ্চয়তায়। ধৈর্য ই পারিজাতের কাছে যাবে, ইচ্ছেমতো টাকায় ওদের কিনে নেবে পারিজাত! সবদিক ভেবেই বিজন রাজি হয়েছে পারিজাতের সঙ্গে বসতে। মিটিংটা হবে আজই। বিকেল চারটে নাগাদ, দুর্গাবাড়িতে। কুনালও থাকবে আলোচনায়। কুনাল, পারিজাত একসঙ্গে আসবে কলকাতা থেকে। পারিজাতের সঙ্গে কুনালের রিলেশনটা কতটা নিবিড়, জানে না বিজন। শুধু এটুকু জানে, কুনালের বন্ধু দেবরাজের ভাই পারিজাত। তথ্যটা কুনালই দিয়েছে। বিজন দেবরাজকেও চেনে না। মিটিংয়ে কুনালের ভূমিকাটা কী ধরনের হবে, আন্দাজ করতেও পারছে না। কুনাল কার পক্ষ নেবে, বোঝা যাচ্ছে না। নতুন করে কাজ শুরু করতে গেলে টাকার আশু প্রয়োজন। কুনালের সঙ্গে কথা বলার পরই বিজন সিদ্ধান্ত নেয়, দুর্গাবাড়ির লোকেদের সঙ্গে একবার গোটা বিষয়টা আগে আলোচনা করে নেবে। ওদের মনোভাব, চাহিদা জেনে নিয়ে তবেই পারিজাতের সঙ্গে কথা বলবে। গতকালই বিজন রায়দাকে দিয়ে সব ঘরে খবর পাঠিয়েছে, আজ আটটায় মিটিং। সবাই যেন দুর্গাবাড়ির পিছনের উঠোনে চলে আসে। কেউই বলেনি, আসব না। ওয়র্কশপে ঢুকে এল বিজন। কাঁধঝোলাটা দেওয়ালের ঝুলিয়ে ঘরটায় একবার চোখ বোলাল। রায়দা তরো করে কাজ সাজিয়ে রেখেছে। ল সে। মটিংয়ের আগে কাজ যতটুকু এগিয়ে রাখা যায়। কেউ একজন দরজা পেরিয়ে ঢুকল ঘরে। বিজন ন্দাজ করতে পারছে, কে এসেছে। দরজা পেরনোর

বামুনবুড়ি এতটুকু ঘাবড়াল না। বরং মিটিমিটি হেসে সে বলল, "ওখানে

ছন্দের সঙ্গে মানুষটার চলাফেরার গতির সাযুজ্য থাকে। ঠাকুরমা ঘরে ঢুকেছে বুঝতে পেরেও, বিজন ঘাড় ফেরায় না। এক মনে কাজ করে যেতে থাকে।

"ক'টা দরকারি কথা ছিল," ঠাকুরমার গলা।

ই তো আটকে গিয়েছে বাছাধন। আমাকে মারলে ওদের কাজের কাজ কিছুই হবে না!"

"মিটিংয়েই বোলো। এখন হাতের কাজটা সেরে নিই।"

"মিটিংয়ের আগেই কথাটা বলে নিলে ভাল হয়।"

বিজন বুঝল, এড়ানো যাবে না। চেয়ার ঘুরিয়ে ও মুখোমুখি হল বামুনবুড়ির, "বলো।"

"আজকের মিটিংটা বাতিল করে দে!"

অবাক হল বিজন, "কোন মিটিংটা?"

"সকালের। এ বাড়ির লোকেদের নিয়ে যেটা ঠিক করেছিস। পাঁচ, ছ'জনের বেশি লোক পাবি না। কাল রাতে দু' এক ঘরে গিয়ে হাওয়া বুঝে গিয়েছি। রতন, শ্যামলকে চুপচাপ চলে যেতে দেখে এ বাড়ির অনেকের ধারণা হয়েছে, প্রচুর টাকা পেয়েছে ওরা। আমাদের সঙ্গে থাকলে প্রোমোটার ওদের অত টাকা দেবে না। শত্রু ভাববে!"

"রতন জ্যাঠা, শ্যামল কত টাকা পেয়েছে, সেটাই তো সঠিকভাবে জানে না কেউ। কীভাবে ধরে নিচ্ছে, অনেক টাকা পেয়েছে?"

"জানে না বলেই তো যে যার মতো টাকার পরিমাণ ভেবে নিয়ে স্বপ্ন দেখছে!"

"যারা স্বপ্ন দেখছে না, মানে ওই চার ছ'জন, তাদের কী মত?"

বামুনবুড়ি একটু ভেবে নিয়ে বলল, "তারা একটু বুদ্ধি ধরে। অবস্থাটা বুঝে নিতে চাইছে। যদি দেখে, আমরা প্রোমোটারের সঙ্গে পেরে উঠব না, সঙ্গে সঙ্গে রং বদলাবে!"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল বিজন, "তা হলে আর মিটিং করে কী লাভ। প্রোমোটারকে আসতে বারণ করে দিই?"

তড়িঘড়ি আপত্তি জানাল বামুনবুড়ি, "না না, ওকে আসতে দে। কী বলে, শোন। কতটা কী দিতে পারবে, জেনে নে। আর তোর ওই যুক্তিটাও শুনিয়ে রাখবি।"

"কোন যুক্তি?"

"ওই যে, শুধু থাকার জায়গাটুকুর দাম দিলে চলবে না...উঠোন, দালান মিলিয়ে গোটা বাড়িটার দাম ধরতে হবে। সেই টাকা ভাগ হবে ভাড়াটেদের মধ্যে।"

"শুনতে ওর বয়ে গিয়েছে। যখন দেখছে, আলাদা করে টাকা দিয়ে তুলতে পারছে ভাড়াটেদের, তখন আমার কথা শুনতে যাবে কেন?" একটু থেমে বিজন ফের বলল, "প্রোমোটার এ বাড়ির সমস্ত খবর রাখে। ওর কানে নিশ্চয়ই পৌঁছেছে, ভাড়াটেদের অনেকেই টাকা নিয়ে উঠে যেতে রাজি। আমার কন্ডিশন শুনলে ও হাসবে!"

"তখন তাকে বলে দিবি, ভাড়াটেরা সবাই উঠে গেলেও বামুনবুড়ি সই করবে না!"

ঠাকুরমার দিকে বিস্ময়ের চোখে তাকাল বিজন, "তুমি একা থাকবে এত বড় বাড়িতে?"

"হ্যাঁ, থাকব," জেদের গলায় বলল বামুনবুড়ি।

ঠোঁটে বাঁকা হাসিসহ বিজন বলল, "তুমি যখনই একা হয়ে যাবে, লোক লাগিয়ে যেমন তোমার মালপত্র ফেলেছিল উঠোনে, এবার তোমাকেই গলা টিপে ফেলে দেবে ওখানে!"

বামুনবুড়ি এতটুকু ঘাবড়াল না। বরং মিটিমিটি হেসে সে বলল, "ওখানেই তো আটকে গিয়েছে বাছাধন। আমাকে মারলে ওদের কাজের কাজ কিছুই হবে না!"

"কেন একথা বলছ?" কপাল কুঁচকে জানতে চাইল বিজন।

"প্রোমোটার যখন প্রথম আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, তখনই বলে দিয়েছি, আমি মরে গেলে আমার অংশের ওয়ারিশন আমার ছেলে। তাকে কেটে ফেললেও এ বাড়ির কোনও ব্যাপারে

মাথা ঘামাবে না! টাকার লোভ দেখিয়ে লাভ হবে না কোনও। সে লক্ষ লক্ষ টাকার চেয়েও বেশি ঘেন্না করে বাবা মা'র সম্পত্তিকে!" দম নিতে থামল বামুনবুড়ি।

বিজন অবাক হয়ে অনুভব করছে, আশি পেরিয়েও বুড়ির মাথা কতটা সক্রিয়!

ফের বলতে শুরু করল বামুনবুড়ি, "সেই জন্যই তো আমি প্রোমোটারকে বলেছিলাম, আমার নিজের লোক বলতে কেউ যদি থাকে, সে হচ্ছে নাতি। ও যা বলবে, সেটাই আমার সিদ্ধান্ত। আমাকে যদি খুন করায়ও প্রোমোটার, এই জমির আইনি অধিকার কোনওদিন পাবে না। তোর বাবা কোনওদিন ফিরেও তাকাবে না এ বাড়ির দিকে। এ খবরটাও নিশ্চয়ই সে এতদিনে জোগা করে ফেলেছে! আর আমি মরলে তোর বাবাই সরাসরি মালিক হয়ে যাবে আমার অংশে । তুই হবি না। আমাকে দানপত্র করতে হবে তোর নামে। সেটা না করা অবধি প্রোমো ার আমাকে খুন করবে না। সে বরং এখন চিন্তায় আছে, বুড়ির যা বয়স, ফট করে না মরে যায়!"

"তুমি একা এ বাড়িতে থেকে কী করবে? যাদের ভালর জন্য তুমি সই করছ না, তারা তো টাকা নিয়ে যে যার মতো উঠে যাবে!"

বুড়ি বলল, "প্রোমোটার সবাইকে টাকা দেবে না। সে অত বোকা নয়। টাকা দিয়ে ঘর ফাঁকা করলেই তো আর বাড়িটা তার নামে হবে না। ধরা যাক, তবু সে বাড়ি ভেঙে ফ্ল্যাট তুলল। টাকাপয়সা খাওয়াল মিউনিসিপ্যালিটিকে। ফ্ল্যাট একটাও বিক্রি হবে না। যারা কিনতে আসবে, দেখে নেবে জমির কাগজপত্র সব আইনমাফিক আছে কি না।"

"কিন্তু প্রোমোটার তো টাকা দিয়ে লোক তোলা শুরু করে দিয়েছে?"

"ওই এক, দু'জন। তা ও খুব কিছু দেয়নি নির্ঘাত। অন্য ভাড়াটেদের ভয় পাওয়ানোর জন্যই এটা করছে। যখনই বুঝবে, আমাকে দিয়ে সই করানো কিছুতেই সম্ভব নয়, তখনই টাকা দেওয়া বন্ধ করবে। আমরা যে দরটা দেব, সেটাই মানতে হবে ওকে।"

মনে মনে আবার ঠাকুরমার বুদ্ধির তারিফ করল বিজন, "আচ্ছা, তুমি যে ভাড়াটেদের কথা এত ভাব, তারা তো সেটা বোঝে না। তুমি প্রোমোটারের কথায় রাজি হচ্ছ না দেখে তারা অনেকেই তোমার বিরুদ্ধে চলে গিয়েছে। এখন আর ওদের উপর মায়া দেখিয়ে কী লাভ!"

"মায়া হবে না? কতদিন এদের সঙ্গে আছি বল! জীবনের বেশিরভাগ সময়টাই তো এ বাড়িতে কেটে গেল। পিছন ফিরে তাকালে কত ঘটনার কথা মনে পড়ে। একসময় এ বাড়িটা একটা পরিবারের মতো ছিল।" হঠাৎই থেমে গেল বামুনবুড়ি। একটু সময় নিয়ে বলে উঠল, "এরা সব আমার জীবনের এক একটা টুকরো। এদের অনেককেই আমি জন্মাতে দেখেছি, চোখের সামনে বড় হয়েছে। অনটনের সংসারে সবাই কি সবসময় কাঁদছে? ওদের ঘরেও হাসিঠাট্টা হয়। এরপরও তুই বলবি, জীবনটা আনন্দের নয়?"

লঘু সুরে বিজন ঠাকুরমার উদ্দেশে বলল, "তোমার তো আনন্দের দিন শেষ হয়ে এল, কতদিন আর বাঁচবে! এবার ত্যাগ করো এ বাড়ির মায়া।"

"কেন? মরে গেলেও তোর মধ্যে তো থেকে যাব। তোর চোখ দিয়ে দেখব বাড়িটাকে। তোর শরীর আমার রক্ত তো বইছে, না কি?"

কথাটা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ির চোখ থেকে আচমকা জল গড়াতে শুরু করল! ওদিকে ওয়র্কশপের বাইরে দু' চারজনকে হাঁটাচলা করতে দেখা যাচ্ছে, এ বাড়িরই লোক তারা। মিটিংয়ে বসার জন্যই এসেছে। বিজন ডেকে নিল, "চলে এসো ভিতরে।"

ামুনবুড়ি তড়িঘড়ি শাড়ি দিয়ে চোখ মুছে নিল।

খনও তো এল না। সাড়ে চারটে বেজে গেল!" বলল রায়দা।

ার আসার কথা বলছে, বুঝতে সেকেন্ড খানেক সময়

এমনই ডুবে গিয়েছিল,

থকে উড়ে গেছে পারিজাত, কুনালের কথা!

নটান উত্তেজনার মধ্যে ছিল। গ্লাস নিয়ে

বেরল রায়দা। সকালের মিটিংয়ের পর বিজনের

একটা স্থিরতা তৈরি হয়েছিল, সেটা এড়াতেই ডুব

য়েছিল কাজে। এমনিতে বিজন বড় একটা টেনশনে ভোগে না।

আজ একটা অদ্ভুত মিশ্র প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল! চোয়াল শক্ত

য়ে গিয়েছিল পারিজাতের উপর রাগে, ভাড়াটে তুলতে গুন্ডা

বেছেটা কী? বাইরে থেকে

জত্ব করবে? জন্ম থেকে বিজন কানাইপুরে আছে,

ুর্গাবাড়িতে কিছুতেই ওকে ফ্ল্যাট

র পর ধীরে ধীরে মাথায়

ঢুকতে শুরু করল সাড়ে চার লাখ প্রাপ্তির কথা। যদিও ডিমান্ডটা এখনও ফেলা হয়নি সামনে। বাই এনি চান্স যদি রাজি হয়ে যায় পারিজাত, কৃষ্ণার মুখের উপর জবাব দেওয়া যাবে। সাড়ে চার লাখ টাকার সম্পত্তি কম কথা নয়! কানাইপুরের ভিতরের দিকে একটা ওয়ান রুম ফ্ল্যাট হয়ে যাবে। ওয়র্কশপটা রাখবে এখানে যে নতুন কমপ্লেক্স উঠবে, তার কোনও গোডাউনে। জায়গাটার দাম ইনস্টলমেন্টে শোধ করবে। বাড়ি বিক্রি মধ্যস্থতাকারী হিসেবে এটুকু নিশ্চয়ই তার প্রাপ্য। আশা করা যায়, পারিজাত না বলবে না। বিজনের নিজস্ব কিছু স্থাবর সম্পত্তি হচ্ছে দেখে বাবা মা গর্ব বোধ করবে। পরক্ষণেই মনে হয়েছিল, বাবা মোটেই গর্বিত হবে না! এই সম্পত্তির উৎস তো দুর্গাবাড়ি। মানে, ঠাকুরদা ঠাকুরমা কাছ থেকে প্রাপ্ত সম্পদ, এতে বাবার বিন্দুমাত্র রুচি নেই, প্রবল বিতৃষ্ণা আছে। বিজনের মাকে মেনে নেওয়া হয়নি এ বাড়িতে। বিজনেরও কি উচিত হবে, এই সম্পত্তির ভাগ নেওয়া? সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছিল, আমি তো ঠাকুরমার থেকে কিছু নিচ্ছি না। ভাড়াটে এবং মধ্যস্থতাকারী হিসেবে পাচ্ছি। নেব না কেন? যদিও ঠাকুরমা কোনওদিনই ভাড়া নেয়নি। কিন্তু আমি তো দিতে চেয়েছিলাম...ভাবনার এই টানাপোড়েনে অস্থিরতা ক্রমশই বাড়ছিল।

ভাবনার মাঝে ছুটে এসে ঘরে ঢুকল রায়দা। হাতে ধরা গ্লাস থেকে চা চলকে পড়ে মেঝেতে। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "ওরা এসে গিয়েছে। আমি চা নিয়ে ঢুকছি, দেখি, গাড়ি এসে থামল। নেমে এল আপনার বন্ধু আর প্রোমোটার।"

বলতে বলতেই দালানে উঠে আসে কুনাল, পারিজাত। প্রথম চোটে পারিজাতকে দেখে মনে কোনও বিতৃষ্ণা এল না বিজনের। ওর মুখে বেশ একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ হাসি লেগে আছে।

শু খুলে ঘরে ঢুকে এসেছে পারিজাত। চারদিকে চোখ বোলায়।

এরা সব আমার জীবনের এক-একটা টুকরো। এদের অনেককেই আমি জন্মাতে দেখেছি। অনটনে

রায়দা দু'টো টুল এনে রাখল। পারিজাত বসে না, বেশ অনেকটা সময় ধরে ঘরটা দেখছে।
কুনাল শুরু করল কথা, "তা কী ঠিক করলি?"

বদমাইশি করে এটা করেছে, তা নয়। মানুষগুলো সত্যিই গরিব। আমরা তো চোখের সামনে দেখছি। মাথা গোঁজার এই ঠাঁইটুকু চলে গেলে ওরা জলে পড়ে যাবে।"

নর সংসারে সবাই কি সবসময় কাঁদছে? এরপরও তুই বলবি, জীবনটা আনন্দের নয়?"

খানিক ইতস্ততার সঙ্গে বিজন বলল, "ঠিক মানে, এখানে যে সব টেনেন্ট আছে, তাদের তো কিছু দিতে হবে। খালি হাতে তো তারা উঠে যাবে না।"
"কত দিতে হবে?" জানতে চাইল কুনাল।
পারিজাত স্থির চোখে তাকিয়ে আছে বিজনের দিকে।
বিজন কুনাল ও পারিজাতের মাঝামাঝি দৃষ্টি রেখে ভাববাচ্যে বলল, "কত দেওয়া সম্ভব আগে শুনি!"
পারিজাত বলল, "আমার পক্ষে একটা টাকাও দেওয়া সম্ভব নয়। আপনার ঠাকুরমাকে ছাড়া বাকি তিন শরিককে আমি দু'বছর আগে মোটা অ্যামাউন্ট পেমেন্ট করেছি। ইন্টারেস্ট জুড়লে সেটা এখন অনেক টাকা। এদিকে মাল মেটিরিয়ালের দাম বাড়ছে। ফ্ল্যাটের মার্কেট ক্রমশই স্যাচুরেটেড হয়ে পড়ছে। আমি এই প্রোজেক্ট থেকে আদৌ কী লাভ করব, বুঝতে পারছি না!"
"টাকা যদি না ই দেবেন, আলোচনায় বসতে চাইলেন কেন?" বলে বিজন।
পারিজাতের গলা একটু চড়ে গেল, "চাইলাম এই কারণে, আমাকে বুঝিয়ে বলুন তো, ওদের কি কোনও রাইট আছে টাকা চাওয়ার? ওরা নামেই ভাড়াটে, কেউ নিয়মিত ভাড়া দেয় না। যদি বা দেয়, খুব অল্প। প্রায় বিনা পয়সায় এতদিন জায়গাটা ভোগ করে, এখন আবার বড় দাঁও মারার তালে আছে!"
"তবু বাড়ির উপর আইনত ভাড়াটেদের একটা অধিকার থাকেই," বলল বিজন।
"আইনি অধিকার যদি থাকে, তা হলে কোর্টে যাক। আপনি ওদের হয়ে কথা বলছেন কেন? ওরা নিজেদের ভাড়াটে হিসেবে প্রমাণই করতে পারবে না! ভাড়া দেওয়ার রসিদ নেই কারও কাছে। দু' একজন রেন্ট কন্ট্রোলে টাকা দিত, এখন সেটাও বন্ধ করেছে।"
বিজন বলল, "এর জন্য ওদের দারিদ্রই দায়ী। কেউ যে খুব

এতক্ষণ চুপ থেকে কুনাল ফের ঢুকল আলোচনায়, " 'গরিব' নামক স্ট্যাম্পটা বেশ আপেক্ষিক, বুঝলি? অ্যানালিটিক্যালি ব্যাপারটাকে দেখা উচিত।"
কথা কেড়ে নিয়ে বিজন বলল, "আমি জানি, তুই কী বলবি। একজনের থেকে আর একজন ব্যবসায়ী গরিব, তার চেয়ে তুই, তোর নীচে আরও আছে!"
"এগজ্যাক্টলি। এর সঙ্গে যেটা যোগ করব, এ বাড়ির ভাড়াটেরা এখন যে ক্রাইসিসে আছে, পারিজাতও তাই ই আছে। দুটো প্রজেক্টে এমন লস খেয়েছে, গলা অবধি লোন! শোধ না করতে পারলে সুইসাইড করা ছাড়া গতি নেই। ঘুরে দাঁড়াতে গেলে এই প্রজেক্ট থেকে ওকে লাভ করতেই হবে। এবার তুই ঠিক কর, গরিব হিসেবে কার পক্ষ নিবি?"
"মানলাম, দু' পক্ষই সঙ্কটের মধ্যে আছে। বাঁচার উপায়টা ভাগ করে নেওয়া যাক। হয়তো ক্রাইসিস পুরোটা ওভারকাম করা যাবে না। তবে অনেকটাই যাবে।"
"দ্যাট্স ফাইন। এবার তা হলে বল, কত দিতে হবে ওদের?"
বিজন চিন্তায় পড়ে গেল। মিটিংয়ে যা ঠিক হয়েছে, এসব কথার পর সেই অ্যামাউন্টটা চাওয়া বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। আবার তার চেয়ে কমে রাজি হলে, এ বাড়ির লোকেরা মেনে নেবে না। ধরে নেবে, বিজন পার্সেন্টেজ খেয়েছে। এর চেয়ে সবাইকে নিয়ে পারিজাতের সঙ্গে বসলে ভাল হত।
হঠাৎই পারিজাত বলে উঠল, "মিটিং এ ডিসিশন হয়েছে, পার ফ্যামিলি সাড়ে চার লাখ!"
চমকাতেও ভুলে গেল বিজন! শরীরের ভিতরটা থরথর করে কাঁপছে! রাগে না নার্ভাসনেসে, বুঝতে পারছে না। সকালের মিটিং এ নিশ্চয়ই এমন কেউ ছিল, যে সমস্ত খবর ইতিমধ্যেই পাচার করেছে। পারিজাতের চোখে মুখে উপহাসের ছাপ স্পষ্ট।

অসহ্য বোধ করল বিজন, “আপনি যখন স্পাই ফিট করে সবটাই জানতে পারছেন, খামোকা এই মিটিংয়ের কী দরকার ছিল?”
“আপনাকে রিয়্যালিটিটা দেখাতে এলাম। যে পাঁচ ছ’জনকে নিয়ে মিটিং করলেন, তাদের মধ্যেও ভেজাল আছে। কাদের নিয়ে লড়বেন মশাই?”
বিজনের নিজেকে নিরস্ত্র লাগে। লড়াইয়ের কোনও রসদই নেই তার হাতে।
খানিক নীরবতার পর পারিজাতই ফের শুরু করল, “আমি বলি কী, আপনি এসব থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিন। ভাড়াটেদের ব্যাপারটা আমি বুঝে নেব। আপনি রাজি করান। তার জন্য কত কী দিতে বলুন?”
বিজন চিন্তিত মুখে বলল, “ঠাকুরম রাজি করানো ভারী কঠিন। এই লোকগুলোর সঙ্গে এতদিন রয়েছে এদের ভাল মন্দের শরিক হয়ে পড়ে তারপর আছে এই বাড়িটার প্রতি ম ঠাকুরমা যদি বোঝে, এ বাড়ির মানুষগুলো ন্যায্য টাকা পাচ্ছে, তবে রাজি হবে সই দিতে। আমার কথায় আলাদা করে কনভিন্সড হবে না।”
“আপনার এই ধারণাটা কিন্তু ভুল! পারিজাত, “বামুনবুড়ি যে এ বাড়ির নাতির প্রতি বেশি সফ্‌ট, আমি প্রম পারি! কথাটাকে অন্যভাবে নেবেন না...বামুনবুড়ি যদি দেখে এ বাড়ির ঝামেলা সামলাতে গিয়ে আপনার প্রাণ সংশয় হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে সই দিয়ে দেবে!”
বিজনের পিঠ বেয়ে যেন একটা টিকটিকি নেমে গেল! শক্ত হয়ে গেল শিরদাঁড়া, “আপনি কি আমাকে ঘুরিয়ে হুমকি দিচ্ছেন?”
সকালের রাগটা আবার ফিরে এসেছে ওর মাথায়, “আপনি গুন্ডা লাগিয়ে শ্যামলকে তুলেছেন, ভাবছেন আমাকেও সেভাবে...”
বিজনকে কথা শেষ করতে দিল না পারিজাত, “আমাকে অতটা ইডিয়ট ভাববেন না। আপনাকে যে ওভাবে তোলা যাবে না, সেই

লনোন পার্সন, জন্ম কর্ম
পর অনেক কালচারাল
াকার পুরনো, প্রভাবশালী
রেখেছে। এর মধ্যে রাজনৈতিক
র পিছনে গুন্ডা লাগালে
া আমি ভাল মতোই বুঝি! আর
ছি, মার খাওয়াইনি। লোকটা
ওকে টাইট দিতে গেলে ওই

ড় নাড়ে কুনালও। ও যে টাকার
সুবিধে হয় না বিজনের।
কলতা ভট্টাচার্য যে বিজনদার
াণ আমার কাছে আছে।

সানন্দা শব্দভেদ

সূত্র পা শা পা শি

১ তল সমান নয় এমন। ৪ ঋষি গৌতমের পুত্র। ৬ ঋণের দলিল। ৮ বিরুদ্ধে। ১০ বাঁচার ন্যূনতম তিনটি উপকরণের একটি। ১১ খেজুরের নতুন রসে প্রস্তুত। ১২ দৃষ্টি বা মনোবৃত্তি। ১৩ গুণিরা সর্বত্র যা পান। ১৫ বাদ্য, বাজনা। ১৭ মারবেল পাথর অবার শুকনো পাতা ইত্যাদির শব্দও বোঝায়। ১৮ কামদেব। ১৯ সূর্যদেব। ২০ সৈন্য, ফৌজ। ২১ বিয়ের রাতে বর কনে যা করে।

১	২		৩		■	৪			৫
■		■		■	■		■	■	
■		■	৬		৭		■	■	
■	৮	৯		■		■	১০		
১১			■	■	১২			■	■
■	■	১৩		১৪	■	■	১৫	১৬	
১৭			■		■	১৮			■
	■	■	১৯				■		■
	■	■		■	■		■		■
২০				■	২১				

গত সংখ্যার সমাধান

অ	ব	স	র	■	রা	ম	প্র	সা	দ
ব	■	জ	য়	ধ্ব	জা	■	মী	■	হ
নি	দা	ন	■	■	ব	■	ল	ঙ্ঘ	ন
■	মো	■	অ	নু	লি	খ	ন	■	■
ব	দ	■	নু	■	■	র	■	গ	জ
ক	র	■	ভ	■	■	শা	■	ত	ল
■	■	অ	ব	ন	য়	ন	■	ক্ল	■
স	চি	ব	■	বী	■	■	ক	ম	তি
ভা	■	দা	■	ভা	ব	বা	দ	■	জে
ব	দ	ন	সি	ব	■	স	ম	তু	ল

সূত্র ছকে ছক

২ সঙ্গীসাথি সঙ্গে নিয়ে। ৩ কম বেশি। ৪ জাতকের কাহিনি নিয়ে অবনীন্দ্রনাথের বিখ্যাত লেখা। ৫ অন্ধকারময়। ৭ সৎ বা ভালো লোক। ৯ জমিদারের ভৃত্য যে নিষ্কর জমি খোরপোশ বাবদ পায় বা ভোগ করে। ১০ একেবারে নষ্ট। ১৪ ‘বদনে লড়ে’। ১৬ কিংবদন্তি, যে কাহিনি দীর্ঘকাল ধরে লোকের মুখে মুখে প্রচলিত। ১৭ মনের জোর। ১৮ মণিময় হার। ১৯ আরবের স্বর্ণমুদ্রা।

চিত্রপট

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

ফুটপাতে চড়া সাজের মেয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেই চোখ চলে যাচ্ছে, মনে হ

পারিজাত বিজনকে বলল, "এ বাড়ির লোকেদের কাছ থেকে যে সব ইনফো পেয়েছি তার থেকে কয়েকটা আপনাকে শোনাই। যেমন, আপনি কি জানেন, ওয়র্কশপ বন্ধ করে আপনি বা আপনারা যখন চলে যান, তার খানিক পরেই বামুনবুড়ি আপনাদের দিয়ে যাওয়া তালা টেনে দেখে, ঠিকঠাক লেগেছে কি না? আরও একটা উদাহরণ দিই, এমন অনেক সময় হয়, ওয়র্কশপে কেউ নেই। আপনি বাইরে, সুবল কাজে আসেনি, রায় হয়তো এ বাড়ির কোনও ঘরে গিয়ে আড্ডা জুড়েছে, বামুনবুড়ি নিজের দালানে বসে পাহারা দেয় এই ঘরটাকে। আপনার হয়তো কোনও ক্লায়েন্ট এসেছে ওয়র্কশপ খোলার আগেই, বামুনবুড়ি তার যা খাতির শুরু করবে, বড় বড় শোরুমের সেলসগার্লরা ফেল মেরে যাবে!"

এদিকে দরজায় থমথমে মুখ নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে রায়দা। বিজনকে বলল, "আপনাকে একজন ভদ্রমহিলা ডাকছে।"

শুনেই কৃষ্ণার কথা মাথায় এল বিজনের। এতদিনে ক্ষমা চাইতে এসেছে! ভীষণ এক অভিমান বিজনকে চেয়ার থেকে উঠতে দেয় না। সেকেন্ডখানেকের মধ্যে খেয়াল হয়, রায়দা তো কৃষ্ণাকে ভদ্রমহিলা বলবে না, ই চেনে! তা হলে কে এল এই ভর ন্ধেবেলা? চেয়ার ছেড়ে ওঠে বিজন। ঘর থেকে বেরিয়ে দালানে পা দিতেই ভূত দেখার মতো চমকে মের পাশে হলুদ বাল্‌বের নীচে দাঁড়িয়ে শিউলি। বিজনের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, "তুমি এখানে!"

জড়সড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে শিউলি মিনমিন করে বলল, "ও আমাকে নিতে এসেছে।"

"কে?"

"সন্দীপ। তোমার বাবা ওকে আনিয়েছে।"

"বর নিতে এসেছে, এ তো ভাল কথা। এখানে চলে এলে কেন?"

একটু ফোঁস করে উঠল শিউলি, "কেন এসেছি, জানো না বুঝি?"

আর কোনও প্রশ্ন করতে ভয় পেল বিজন। কী না কী বলে বসবে পাগলি, সবার সামনে নাক কাটা যাবে! পারিজাত, কুনাল বেরিয়ে এসেছে দালানে, রায়দা, সুবলও আছে। ভিড় যদি বাড়তে থাকে, তা হলেই চিত্তির! পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে চেয়ে বিজন বলল, "তুমি এই বাড়িটা চিনলে কী করে?"

"জেঠিমার সঙ্গে একদিন বাজার যাচ্ছিলাম, তখন দেখিয়েছিল।"

ওকে এখনই বাড়ি পাঠাতে চেয়ে বিজন বোঝানোর ঢঙে বলল, "এটা তো আমার অফিস, একটু পরেই হয়ে যাবে। তুমি আপাতত আমার মায়ের কাছে ," বলেই বজন রায়কে বলল, "যান তো, একটা রিকশা ডেকে নিয়ে আসুন।"

উলি বলল, "আমি যাব না। গেলে তোমার সঙ্গেই যাব।"

এরকম অপ্রস্তুত অবস্থায় বিজন বোধ হয় আগে কখনও পড়েনি! পারিজাত ঘটনাটা কীভাবে দেখছে, কে জানে! বাকিদের না হয় পরে আসল ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবে বিজন। এই মুহূর্তে ঠিক কী যে করা উচিত, ভেবে পায় না। মেয়েটাকে কি টানতে টানতে বাইরে

ছে, ডলি নয়তো? সে যে সেজেগুজে দুপুরবেলা কোথায় যায়, কী করে, খোঁজ পায়নি বাপি।

নিয়ে যাবে? আর এক সিন তৈরি হবে তখন...ভাবতে ভাবতেই দেখে দালানে উঠে এসেছে ঠাকুরমা। কী হয়েছে কারও কাছে জানতে না চেয়ে সরাসরি শিউলির পিঠে হাত বোলাতে থাকল। তারপর বলল, "তুমি আমার সঙ্গে এসো মা। ওরা এখন দরকারি কথা বলছে। নাতি পরে তোমার কথা শুনবে।"
আশ্চর্যভাবে রাজি হয়ে গেল শিউলি! ঠাকুরদালান থেকে নেমে রক ধরে হাঁটতে লাগল ঠাকুরমার সঙ্গে। বিজন বুঝল, আরও এক আশ্রয়প্রার্থী জুটল দুর্গাবাড়িতে। সঙ্গে এটাও জানে, এই একই প্রমাদ পারিজাতও গুনছে!

রাতের কলকাতায় পথ চলতে ইদানীং খুব অসুবিধে হচ্ছে বাপির। ফুটপাতে চড়া সাজের মেয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেই চোখ চলে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে, ডলি নয়তো? সে যে সেজেগুজে দুপুরবেলা কোথায় যায়, কী করে, খোঁজ পায়নি বাপি। ডলির মোবাইলে পবন তিওয়ারির নাম্বার দেখার পর থেকেই বাপি ঠিক করে নিয়েছিল, নিজের জীবন থেকে ডলিকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। নতুন কাজের জায়গার ঠিকানা ফোন নম্বর শুধু মা, দিদি আর বাড়িওয়ালা বিজয়কাকাকে দিয়ে রেখেছে। এর পরই বাপির প্ল্যান ছিল মাকে নিয়ে দিদির ভাড়া করে রাখা বাড়িতে উঠে যাবে। যে বাড়ি ডলি চেনে না। তারপর ডলিকে কোনওদিন কলকাতায় বেড়াতে নিয়ে গিয়ে ইচ্ছে করে হারিয়ে যাবে বাপি। ম্যাটাডোর বলা থাকবে, বাপি, ডলি কলকাতার উদ্দেশ্যে বেরলেই ড্রাইভার খালাসি গাড়ি নিয়ে এসে ঘরের মালপত্র আর মাকে তুলে নিয়ে দিদির ভাড়া বাড়িতে রেখে আসবে। ইচ্ছে করে হারিয়ে যাওয়া বাপি গিয়ে উঠবে ওখানেই। ডলি কলকাতা থেকে এসে দেখবে, ঘরে তালা। বাড়িওয়ালাকে 'এরা কোথায় গিয়েছে' জিজ্ঞেস করলে উত্তর পাবে না। ডলিকে ফিরে যেতে হবে বাপের বাড়ি অথবা অন্য কোথাও। প্ল্যান শুনে দিদি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। বিজয়কাকাও মনে জোর পাচ্ছিল না। কিন্তু বাপির ভরসা পেয়ে রাজি হয়েছে। নিখুঁতভাবে সফলও হয়েছে প্ল্যানটা। আজ নিয়ে তিনদিন বাপি আর মা চলে এসেছে দিদির ভাড়া করা বাড়িতে। আগের বাড়ির খবরাখবর পাচ্ছে বিজয়কাকার থেকে, ফোন মারফত। ও বাড়ি ছেড়ে চলে আসার পরে সেদিন যা যা ঘটবে ভেবেছিল বাপি, মোটামুটি তাই ঘটেছে। ডলি ফিরেছিল রাত ন'টা নাগাদ। একতলায় তালা মারা দেখে, চেঁচিয়ে বাড়িওয়ালাকে ডাকে। ডাকে ভয়ের সুরটাই নাকি বেশি ছিল। যেন কিছুই জানে না, এমন ভাব করে নেমে এসেছিল বিজয়কাকা। বলেছিল, বাপিরা সেদিনই বকেয়া ভাড়া মিটিয়ে উঠে গিয়েছে। ডলি নতুন বাসার ঠিকানা চেয়েছিল। উত্তরে বিজয় কাকা জানিয়েছে, ঠিকানা সে জানে না। এরপরই ডলি নাকি স্বমূর্তি ধরে। কাঁচা খিস্তি দিয়ে বিজয়কাকার কাছ থেকে ঘরের চাবি চায়। খিস্তিগুলো লজ্জায় বাপিকে বলতে পারেনি বিজয়কাকা! ডলিকে চাবি দিতে কাকা অস্বীকার করে। চাবি নিয়েই ছাড়বে ডলি, দেদার গালাগালিসহ বিজয়কাকাকে 'আপনি' থেকে 'তুই' এ নামিয়ে এনে বলেছিল, "তুই ওদের সঙ্গে আছিস, ভাল করেই জানি। তোর ব্যবস্থা হচ্ছে। আর এত রাতে আমি কোথায় যাব?" ততক্ষণে পাড়ার লোকেরা বেরিয়ে এসেছিল। কেউ ডলির পক্ষ নেয়নি। বলেছে, 'বাপের বাড়ি ফিরে যাও, সঙ্গে লোক দিচ্ছি। এ পাড়ায় আর নয়। তোমাকে ঘর খুলে দিয়ে বিজয় বিপদে পড়ুক আর কি! সকালে উঠে তুমিই বলতে শুরু করবে, রাতে ঘরে এসেছিল বিজয়।'

পাড়ার লোকের হাসাহাসির মাঝে মাথা নিচু করে ফিরে গিয়েছিল ডলি। বিজয়কাকারা জানত, পরের দিনই ডলির বাপের বাড়ির লোক হুজ্জোত করতে আসবে। তার জন্য তৈরি ছিল সবাই। বিজয়কাকা কাজে বেরোয়নি। পাড়ার বেকার, ইয়ং ছেলেদের বলা হয়েছিল, পাড়াতেই থাকতে। লাঠিসোঁটা নিয়ে অপেক্ষায় ছিল তারা। যথারীতি ডলিসমেত ওর বাপের বাড়ির লোকেরা আসে। কিছু মেয়েমানুষও ছিল। তাদের যেমন দাগি চেহারা, মুখের ভাষাও মানানসই। ছেলেরা গিয়ে প্রথমেই একতলার বন্ধ দরজায় লাথি মারতে থাকে। মুখে ফুটছে খিস্তির তুবড়ি। পাড়ার লোকেরা অবশ্য সময় নষ্ট করেনি, লাঠি, ড নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। ওরা মানে মানে কেটে পড়ে। যাওয়ার সময় বিজয়কাকাকে শাসিয়ে গিয়েছে, 'রাস্তায় একা পেলে লাশ ফেলে দেব' বলে! বিজয়কাকার জন্য খারাপ লা ছে বাপির। বেচারাকে এভাবে বিপদের মধে ঠেলে দেওয়া ঠিক হয়নি। তবে কাল রাত অবধি বিজয়কাকার কথার মধ্যে কোনও টেনশনের আঁচটিও পাওয়া যায়নি। ডিউটি থেকে ফিরে বাপি নতুন পাড়ার বুথ থেবে ফোন করেছিল, "হ্যাঁ গো, আর কিছু হয়নি তো? রাস্তায় ক'দিন বেরিও না একা।" বিজয়কাকা বেশ জোর গলায় বলেছিল, "তুই আমার জন্য একদ চিন্তা করবি না। নিজে সাবধানে থাক। ওরা যেন তোর সন্ধান না পায়। ওদের টার্গেট তুই, আমি নই। আমাকে মেরে ওরা ঝামেলা বাড়াতে যাবে না।"

যুক্তি শুনে খানিকটা হলেও বিজয়কাকার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়েছিল বাপি। হাওয়ায় বিপদের গন্ধ ছড়াতে শুরু করল আজ দুপুর থেকে। বাপি কারখানার বাইরের বুথ থেকে ফোন করেছিল বাড়িওয়ালার ল্যান্ড ফোনে। সাধারণত ওটাতেই করে। বিজয়কাকা না থাকলেও, কাকিমা ফোন তুলে খবরাখবর দিতে পারবে। বেজে গেল ফোন, কেউ তুলল না। বেশ কয়েকবার চেষ্টা করার পর একই ফল। বাপি ভাবল, ফোনটা নিশ্চয়ই খারাপ। এর পর বিজয় কাকার মোবাইলে কল করল বাপি। দু'বার রিং হওয়ার পরই কেটে গল। বাপি ধরে নেয়, হয়তো অফিসের কাজে ব্যস্ত আছে বিজয়কাকা, তাই ধরল না। পরে আবার করা যাবে। টিফিন ইমে বেরিয়ে ফের একবার বিজয়কাকার মোবাইলে কী ব্যাপার? টেনশন ড়তে শুরু করল তখন থেকেই। কাকার মোবাইলে ট্রাই বার। ওপারে টেপ করে রাখা মেয়ের লগ আউড়ে যাচ্ছে। বিজয়কাকার বাড়ির নাম্বারও তনবার, আগের বার হয়তো বাড়িতে কেউ ছিল না, ফোন ঠিকই আছে। নাঃ, বৃথা গেল চেষ্টা। বেজে গেল ফোন। য় বাজছে, কে জানে! টিফিন টাইমের পর থেকে কাজে একদম মন বসাতে পারেনি বাপি। কাজ করতে করতে ভেবে কাকার! ডলিদের বাপের াড়ির লোকের হাতে মার খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছে কি? শ

অলঙ্করণ: লেন্দু মণ্ডল

সানন্দা শব্দভেদ

সূত্র পা শা পা শি

১ শক্তিশালী। ৪ যার রথ দশ দিকেই চলতে পারে। ৮ আওয়াজ। ৯ সোনা বা রুপোর পাত। ১২ রীতি, নিয়ম। ১৩ গন্ধহীন লাল ফুল। ১৫ কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত মিষ্টান্ন। ১৭ গতিশীল। ১৮ শীঘ্র, দ্রুত। ২০ পরনের কাপড়। ২২ সজ্জন। ২৪ বাতিল। ২৬ অর্থ। ২৮ অক্ষর। ২৯ ঘোড়ার চলার গতিভঙ্গি। ৩০ সমবেদনা। ৩২ অধিকার। ৩৪ মোট, থোক। ৩৬ মাতুল। ৩৮ সুন্দরী নারী। ৪০ চিন্তা করা। ৪২ পোড়া ইট। ৪৪ পুরাণে নলরাজার স্বামী। ৪৫ পাকাবাড়ি।

১	২		৩			৪	৫	৬	৭
৮			৯	১০	১১		১২		
	১৩	১৪		১৫		১৬			
		১৭				১৮		১৯	
২০	২১			২২	২৩			২৪	২৫
২৬	২৭		২৮				২৯		
	৩০	৩১			৩২				
৩৩		৩৪		৩৫			৩৬	৩৭	
৩৮	৩৯			৪০		৪১		৪২	৪৩
৪৪						৪৫			

গত সংখ্যার সমাধান

অ	স	ম	ত	ল		না	চি	কে	ত
	দ		র			ল			ম
	ল		ত	ম	সু	ক			স্বা
	ব	না	ম		জ		ব	স	ন
ন	লে	ন			ন	জ	র		
		ক	দ	র			বা	জ	ন
ম	র্ম	র		দ		ম	দ	ন	
নো			দি	ন	ম	ণি		প্র	
ব			না			মা		বা	
ল	শ	ক	র		মা	লা	ব	দ	ল

সূত্র পাশাপাশি

১ বিয়ের পাত্র। ২ কথার মাত্রা হিসেবে ব্যবহৃত অর্থহীন শব্দ। ৩ হেঁট। ৫ বাণসমূহ। ৬ স্বাদ। ৭ থেমে থেমে চলা। ১০ কোকিল। ১১ রাজস্ব। ১৪ কথন। ১৬ পাত্র বা আধার। ১৯ সমবেদনা। ২০ হত্যা। ২১ হুকুমনামা। ২৩ জরাগ্রস্ত ষাঁড়। ২৫ গৃহীত শ্বাস। ২৮ শিষ্টাচার। ২৯ ইসলাম ধর্মের মূল বাক্য। ৩১ সুন্দর। ৩৩ অন্যকে কর দেয় এমন। ৩৫ পাওয়া। ৩৭ মধ্য। ৩৯ কাব্যে আমার। ৪১ নহি। ৪৩ মত্ত।

চিত্রপট

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

হাতের কাজ সেরে বাপি আজ বেরিয়ে পড়েছে ন'টা নাগাদ। বুথে গিয়ে দুটো নম্বরে আবার ফোন করে, রেজ়াল্ট একই। হাওড়া স্টেশনে যাওয়ার বাসে উঠে পড়ে বাপি। চিৎপুর থেকে বিশাল জ্যাম। এমনটা হামেশাই হয়। অন্যদিন ধৈর্য ধরে বসে থাকে বাপি। আজ পারেনি, বাস থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করেছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিজয়কাকার একটা খবর নিতে হবে। কানাইপুর স্টেশনে নেমে পুরনো পাড়াতেই যাবে বাপি। প্রথমেই ঢুকে পড়বে না। গলির মুখে কচি মিষ্টির দোকানে আগে খোঁজ নেবে, পাড়ার হাল-হকিকত। তারপর সুবিধে বুঝলে দেখা করবে বিজয়কাকার সঙ্গে। কাকার বিপদ নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে আরও একটা আশঙ্কার কথা মাথায় আসছে বাপির। ওরা যদি বিজয়কাকাকে তুলে গিয়ে বাপির নতুন ঠিকানা চেয়ে মারধর করে? অত্যাচার কতক্ষণ সহ্য করবে কাকা? হয়তো বলেই দেবে বাপিদের ঠিকানা। তবে বিজয়কাকা শুধু পাড়ার নামটাই বলতে পারবে। সেটুকুই অবশ্য যথেষ্ট, ডলির লোকেরা ঠিক খুঁজে নেবে বাপিকে...জ্যামটা বুঝি একটু ছাড়ল। হাওড়ার বাস দেখে উঠে পড়ল বাপি।

বাস থেকে নেমে প্ল্যাটফর্মে এসে একটা ভিড় ট্রেনে উঠেছে বাপি। বাপি খেয়াল করে দেখেছে, ট্রেনের দুলনি মাথাকে অটোমেটিক্যালি বেশ শান্ত করে দেয়। নিজের একটা ভুল ধরতে পেরে এই মুহূর্তে বাপির খুব আফসোস হচ্ছে। ডলিকে এত তাড়াতাড়ি ঝেড়ে ফেলতে যাওয়া চূড়ান্ত বোকামি হয়েছে। আর ক'টা দিন ওয়াচ করা উচিত ছিল। শিবেনদাকে পুরো প্ল্যানটা ফোনে জানিয়েছিল বাপি। শিবেনদা বলেছিল, "প্ল্যান একদম ঠিকঠাক আছে। তবে আরও ভাল হত, তুমি যদি কানাইপুর ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে থাকতে। এক বছর ডলির কাছ থেকে আলাদা নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারলেই কোর্টে ডিভোর্স চাইতে পারবে। ডিভোর্স পেতে গেলে স্বামী-স্ত্রী এক বছর আলাদা থাকতে হয়।"

আইনটা জানার পর বাপির মনে মুক্তির হাওয়া বয়ে গিয়েছিল! খাতায়-কলমেও তা হলে ডলির কাছ থেকে ছাড়া পাওয়া সম্ভব! বছরখানেক বাদেই নিজের পাড়ায় ফিরে আসতে পারবে বাপি। বুক ফুলিয়ে ঘুরবে এলাকায়। এমনকী, আর একটা বিয়েও করতে পারবে। ইতিমধ্যে মা একদিন খবর দিল, বন্ধুরা নাকি ডলিকে নিতে এসে ফিরে গিয়েছে। শরীর খারাপের অজুহাত দিয়ে যায়নি ডলি। কিন্তু বন্ধুরা চলে যেতেই, সেজেগুজে একা বেরিয়ে গিয়েছে। তারপর থেকে ডলির বন্ধুরা আর আসে না, ডলি একাই যায়। ঘটনার এই পরিবর্তন দেখেই বাপির একটু অপেক্ষা করে যাওয়া উচিত ছিল। বাপি বুঝতেই পারছি , ডলির একা বেরনোর মানেই কোনও মালদার কাস্টমার পেয়ে গিয়েছে। বন্ধুদের সঙ্গে বেরনো বন্ধ করার পর থেকে ডলির মধ্যে একটা বদলও লক্ষ করেছিল বাপি। উগ্র স্বভাবটা উধাও হয়েছিল হঠাৎ। চুপচাপ চোখ খুলে শুয়ে থাকত, পরে ঘুমিয়ে পড়ত একসময়।

ডলি কী করেছে, অফিসার আমাকে জানায়নি। শুধু তোর ঠিকানা জানতে

বাপি যতটুকু সময় ওকে বাড়িতে দেখত, হয় শুয়ে আছে, নয়তো জানলার কাছে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে। মা বলত, "ডলির কিছু একটা হয়েছে, বুঝলি?" বাপি ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। এখন মনে হচ্ছে, দিলে বোধ হয় ভাল হত।

সিঁড়ি। দোতলায় যাওয়ার সিঁড়ির মুখে দরজাটা স্বাভাবিক কারণেই বন্ধ। কলিং বেলের সুইচের দিকে হাত চলে গিয়েছিল, ফিরিয়ে আনে বাপি। ধীরে দরজার কড়া নাড়তে নাড়তে ডাকল, "কাকা! কাকা!"

ত চেয়েছিল। খুব ধমক-ধামক দিয়েছে। তোর কাকিমার তো শরীর খুব খারাপ করতে লাগল।

খালের ব্রিজ পেরিয়ে কানাইপুরে ঢুকছে ট্রেন। যারা নামবে, চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বাপির কোনও তাড়া নেই। কানাইপুরে নেমে অটোয় উঠল না বাপি। অন্ধকার বেছে হাঁটতে লাগল আকডাঙার দিকে। আকডাঙা যেহেতু পঞ্চায়েত এলাকা, আলোর ব্যবস্থা কম। দোকানপাটের আলো এড়িয়ে, চেনা কারও মুখোমুখি না পড়ে বাপি পৌঁছে গেল পাড়ার মুখে। মিশে রইল রাস্তার পাশে অন্ধকারে। মিষ্টির দোকানে কচিকে দেখা যাচ্ছে।

বাপিকে দেখে চমকাল কচি, "তুই মরতে আবার পাড়ায় ঢুকলি কেন?"

"আজ নতুন কিছু হয়েছে রে? বিজয়কাকাকে ফোন করছি, পাচ্ছি না।"

"পুলিশ এসেছিল তোর খোঁজে। তুলে নিয়ে গেল বিজয়কাকা, কাকিমা, দু'জনকেই।"

মাথাটা কেমন যেন পাক খেয়ে গেল বাপির। অনেক কষ্টে কচির কাছে জানতে চাইল, "তারপর?"

"তারপর কী হয়েছে জানি না। এই তো কিছুক্ষণ হল স্বামী-স্ত্রী দু'জনে রিকশা করে ফিরল।"

কচির বলা শেষ হতেই দোকান থেকে ছিটকে বেরিয়ে যায় বাপি!

ক'দিন আগে ছেড়ে যাওয়া বাড়িটার দিকে তাকিয়ে ভারী মনখারাপ হল বাপির। একতলা দরজা, জানলা বন্ধ, অন্ধকার জমেছে। দোতলায় জ্বলছে আলো। তার মানে, বিজয়কাকারা এখনও শুয়ে পড়েনি। বাড়ির পিছন দিকে দোতলায় যাওয়ার

বেশিক্ষণ ডাকতে হল না। খুলে গেল দরজা। বাপি আন্দাজ করেছিল, দরজা খোলার আগে সিঁড়ির আলো জ্বলবে। বাপির হাত ধরে অন্ধকারে টেনে নিয়ে বিজয়কাকা বলল, "উপরে চ'। খারাপ খবর আছে।" পুলিশে তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনাটা বলে নিয়ে বিজয়কাকা জানাল, "তুই একবার হয়তো বুথ থেকে আমার মোবাইলে ফোন করেছিলি। আমি তখন থানায়, অফিসারের সামনে। চট করে কেটে দিয়েছি। কথা বললেই পুলিশ ওই নম্বর দেখে ঠিক খুঁজে নিত, তুই কোথায় আছিস!"

বাপি বলল, "আচ্ছা, কেসটা তো আমার। মানে, ভাড়াটের। বাড়িওয়ালাকে তুলে নিয়ে যায় কোন আইনে?"

"তদন্তের কারণে যে কাউকে থানায় ডেকে পাঠাতে পারে পুলিশ। তা ছাড়া কেসটাও তো মারাত্মক। বধূ নির্যাতনের কমপ্লেন করেছে ডলিরা, ফোর নাইন্টি এইট। জামিন পাওয়া যাবে না। সোজা জেল খাটতে পাঠিয়ে দেবে!"

গলা শুকিয়ে গিয়েছে বাপির। ঢোঁক গিলতে গেল, পারল না! বিজয়কাকা বলতে থাকল, "বধূ নির্যাতনের কমপ্লেন সাধারণত গোটা ফ্যামিলির এগেনস্টেই করে মেয়ের বাপের বাড়ির লোক। ডলি কী করেছে, অফিসার আমাকে জানায়নি। শুধু তোর ঠিকানা জানতে চেয়েছিল। খুব ধমক-ধামক দিয়েছে। অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছিল। তোর কাকিমার তো শরীর খারাপ করতে লাগল। অনেক রিকোয়েস্ট করে ছাড়া পেলাম। কাকিমাকে ডাক্তার দেখিয়ে একটু আগে বাড়ি ঢুকেছি।"

এই মুহূর্তে বাপির কিছু করার নেই। সবচেয়ে আগে যেটা জানা

দরকার, জিজ্ঞেস করে সেটাই, "তুমি কি বলে দিয়েছ, কোন পাড়ায় গিয়েছি?"

"না। নানা ভাবে চাপ দিয়েছে আমায়। বলেছে, এনকোয়ারিতে সাহায্য না করার জন্য কেস দেবে। তা-ও বলিনি। যা হবে, পরে দেখে নেব। তুই এখনই বাড়ি গিয়ে মাকে নিয়ে কোথাও চলে যা। বউদির নামে যদি কমপ্লেন করে থাকে ডলি, বউদিকে অ্যারেস্ট করে জেলে পুরে দেবে। উকিল পেতে ঝামেলা হবে খুব!"

পায়ের তলায় ছাদ যেন দুলছে! কীসব শুনছে বাপি! মা যাবে জেলে? কাঠগোড়ায় দাঁড়াবে, চারপাশে পুলিশ...একটা কষ্ট বুক ঠেলে উঠে আসতে চাইছে বাপির...আমি এতটাই অপদার্থ সন্তান, মাকে তো কোনওদিন সুখে রাখতে পারিনি, শেষমেশ আমার জন্য জেলে যেতে হচ্ছে!

এক বেলা থানায় কাটিয়ে বিজয়কাকা কোর্ট-পুলিশের ব্যাপারে অনেকটাই ফ্রি হয়ে গিয়েছে। বুদ্ধি দিল, "দু'-চারটে দিন মাকে নিয়ে কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে এক ফাঁকে বেরিয়ে কোনও উকিলের সঙ্গে কথা বল। যা-যা করতে বলবে, করবি। আগে উকিল ধরা থাকলে, বেশিদিন জেলে আটকে রাখতে পারবে না। নয়তো এই কেসে টানা তিন মাস জেল!" বলে ঘরে ঢুকে গেল বিজয়কাকা। একটু পরে বেরিয়ে এসে একটা খাম বাপির হাতে ধরিয়ে বলল, "তিন হাজার আছে। তুই আমার সাইকেলটা নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি যা। মাকে ওখান থেকে আগে সরা।"

বাপি জিজ্ঞেস করল, "দিদির বাড়ি নিয়ে যাব?"

"না, দিদিকে এসবের মধ্যে জড়াস না। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা মোটেই মেনে নেবে না।"

একদম ঠিক কথা বলেছে বিজয়কাকা। বাপির ঘটনা নিয়ে একবার যখন থানা-পুলিশ শুরু হয়েছে, দিদির শ্বশুরবাড়ির লোকের কানে যাবেই। তাতেই দিদির মাথা হেঁট হবে অনেকটা। এর উপর যদি বাপিরা ওখানে গিয়ে ওঠে, দিদির সম্মান বলে কিছু আর থাকবে না। বিজয়কাকার দেওয়া টাকার প্যাকেটটা পকেটে পুরে বাপি পা বাড়ায় দরজার দিকে।

দু' পাশে দুটো ট্রান্সফর্মার বক্স, আধ-মানুষ উঁচু। মাঝে উবু হয়ে বসে আছে বাপি। চোখের সামনের রেললাইন। লাইনের এদিক-ওদিক কিছু দেখছে না, স্থির চোখ তাকিয়ে থাকলে যতটা দেখা যায়, দেখছে সেটুকুই। অপেক্ষা করে আছে ট্রেনের শব্দের জন্য। ট্রেন কাছাকাছি এলে আলো পড়বে লাইনে। তখনই তৈরি হয়ে যাবে। টাইম বুঝে জাস্ট একটা লাফ! তবু কোনও ধরনের ঝুঁকি নিতে চায় না বাপি। কালকের সকাল সে কিছুতেই দেখবে না! ভীষণ কান্না পেল বাপির। কার জন্য কান্না, প্রথমে বুঝতেই পারছিল না। অথচ চোখ ছাপিয়ে গিয়েছিল জলে। একটু বাদেই অবশ্য ধরতে পারে। 'বাপি' নামের একটা দুঃখী ছেলের জন্য সে কাঁদছে! তিরিশও হয়নি ছেলেটার, এর মধ্যেই জীবনটা ফুরিয়ে গেল।

মন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে বাপি চিন্তাগুলো মাথা থেকে তাড়ায়। সুইসাইড সে করবেই। যা-যা ঘটনা ঘটেছে, এরপর বেঁচে থাকা মানে উলঙ্গ হয়ে রাস্তায় হাঁটা! বিজয়কাকার বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাপি যখন নতুন ভাড়াবাড়িতে পৌঁছল, দেখেছিল, নিজেদের অংশটা অন্ধকার। বুকটা ছাঁত করে উঠেছিল তখনই। বাড়িটা একতলা। বাড়িওয়ালা থাকে সামনে। বাপি গেট খুলে বাড়িতে ঢুকতে যাবে, বাড়িওয়ালা বেরিয়ে এসে বলল, "তোমার মাকে পুলিশ এসে তুলে নিয়ে গিয়েছে। ঘরে তালা দিয়ে দিয়েছি। পুলিশ তোমাকে দেখা করতে বলেছে থানায়। তুমি কি চাবি নেবে? ঘরে ঢুকবে একবার? যদি টাকাপয়সা কিছু নিতে হয়।"

অত বড় খবরটা শুনেও মাথা ঠান্ডা রেখেছিল বাপি। তার কেন যেন মনে হয়েছিল, একবার যদি সে ঘরে ঢোকে, বাড়িওয়ালা থানায় ফোন করে পুলিশ আনিয়ে নেবে।

"না, ঘরে আর যাব না," ঘুরে গিয়ে হাঁটা দিয়েছিল বাপি। মোড় ঘুরেই ছুটতে শুরু করেছিল। এই বিপদে দিদির কাছে যাওয়া ছাড়া তার আর কোনও রাস্তা নেই। পাড়ার মধ্যে দিদির বাড়িটাই জেগে ছিল। সব ঘরের আলো জ্বলছে। বাপি আন্দাজ করেছিল, মায়ের খবরটা এরা নিশ্চয়ই জেনে গিয়েছে। না ঘুমিয়ে সেই নিয়ে আলোচনা করছে এরা। বাপি ও বাড়ি ঢুকতেই দিদির শ্বশুর থমথমে মুখ নিয়ে দাঁড়িয়েছিল সামনে, "তোমার বউ স্বপ্নার নামেও কমপ্লেন করেছে থানায়। সে-ও নাকি অত্যাচার করত ভাইয়ের বউয়ের উপর। তোমার মাকে যে জিপে তুলে নিয়ে এসেছিল পুলিশ, ওটাতে করেই স্বপ্নাকে নিয়ে গেল।" বাপি নিজের কানকেই তখন যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না! সন্দেহ হচ্ছিল, জেগে আছি তো? পর পর এত খারাপ ঘটনা স্বপ্ন ছাড়া

ঘটে না। দিদির শ্বশুর বলে যাচ্ছিল, “তুমি এখন ধরা দিও না। তিন জন একসঙ্গে জেলে চলে গেলে কেস দেখাশোনা করবে কে? শিবেন থাকে দূরে। আমার বয়স হয়েছে...”

কথা শেষ হওয়ার পরই ট্রেনের তলায় ঝাঁপ দেওয়ারই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল বাপি। অন্যভাবে মরার অনেক হ্যাপা আছে। টাইম লাগবে ব্যবস্থা করতে। কিন্তু আজ রাতের মধ্যেই তো মরতে হবে। কালকের সকাল সে কিছুতেই দেখবে না। সামনের লাইন দুটো একটু যেন চিকচিক করে উঠল। নিমেষে সজাগ হল সারা শরীর। ক্ষণে-ক্ষণে আরও স্পষ্ট হচ্ছে লাইন। যেন [illegible] নিঃশব্দে। ট্রেনটার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। উবু অবস্থাতেই লাইনের দিকে এক পা এগোয় বাপি। আওয়াজের দিকে তাকায়। হেড লাইট বড় হচ্ছে ক্রমশ। নিশ্চয়ই মেল ট্রেন। এত রাতে লোকাল ট্রেন থাকবে না। লাস্ট লোকাল চলে গিয়েছে অনেকক্ষণ। ট্রেনটা কোনও হর্ন দিচ্ছে না, কেনই বা দেবে? এত রাতে কে পারাপার করবে লাইন? হেড লাইটের আলো এত জোরালো, ট্রেনের বাকি অংশ দেখাই যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে, একটা অন্ধকারের পিণ্ড মাথায় আলোর মুকুট পরে এগিয়ে আসছে। আলোটা দ্রুত উপরে উঠে যাচ্ছে, বাপি যখন ঝাঁপটা দিতে যাবে, ঠিক তখনই কে যেন জামার কলার ধরে ওকে উল্টোপানে আছড়ে ফেলল!

হতভম্ব হয়ে গিয়েছে বাপি। মাটিতে পড়ে ফড়িংয়ের অস্থির ডানার মতো কাঁপছে। কেউ একজন তার মানে ওত পেতে বসেছিল বাপিকে বাঁচাতে। লুঙ্গি-স্যান্ডো গেঞ্জি পরা সেই লোকটা এখন দাঁড়িয়ে আছে সামনে। চাকায় আওয়াজ তুলে চলে যাচ্ছে ট্রেন। চলন্ত জানলার আলো পড়ছে বাপির মুখে। আলো যেহেতু লোকটার পিছনে, তার মুখটা এখনও দেখতে পায়নি বাপি। ট্রেনের লাস্ট বগি চলে যাওয়ার পর লোকটার মুখের আদল খানিকটা বোঝা গেল। বয়স ষাটের উপরেই হবে। খ্যাড়খ্যাড়ে গলায় ধমক দিচ্ছে, “জীবন নিয়ে ছেলেখেলা? গর্ভযন্ত্রণা বোঝো? সেটা হবে [illegible] ট ধরে বসেছিল। নিজের যেই ইচ্ছে হল, অমনই লাইনের দিকে চললাম...”

লোকটার ধমকের মধ্যেও কেমন যেন এ[illegible]টা ভরসা পায় বাপি। বলে উঠল, “সেই মা জেলে বসে আছে। আমিই পাঠিয়েছি।”

বাপির কোনও কথাই উদ্ধার করতে পারে না লোকটা। কারণ, বাপি যা বলতে চাইছে, মুখ ফুটে তা বেরচ্ছে না। ঘড়ঘড়-মতো একটা শব্দ হচ্ছে শুধু!

উঠোনের পর থেকে মুরারিকাকার ঘর, মায়, পিছনের গাছপালা সব কিছুর মধ্যেই কেমন একটা ফাঁকা-ফাঁকা ভাব! ঘুম ভাঙার পর দালানে দাঁত মাজতে বসে এরকমই একটা অনুভূতি হয়েছিল বিজনের। এটা যে এক ধরনের বিভ্রম, আবিষ্কার করতে সময় লাগেনি বিজনের। শিউলি কাল ফিরে গিয়েছে দুর্গাপুর, ওর বরের কাছে। বিরাট একটা ঝামেলা ঘাড় থেকে নেমেছে বিজনের, চারপাশটা একটু ফাঁকা তো লাগবেই!

ক্রমশ

অলঙ্করণ: নির্মলেন্দু মণ্ডল

সানন্দা শব্দভেদ

সূত্র পা শা পা শি

১ অপ্রত্যাশিতভাবে। ৫ অতিশয় নীচ লোক। ৭ জাতকের কাহিনি অবলম্বনে অবনীন্দ্রনাথের লেখা। ৮ গুণিরা সর্বত্র যা পান। ১০ শস্যটি উলটালেই জলদস্যু। ১১ অভিলাষ, ইচ্ছা। ১৪ শাস্তি। ১৫ সূর্যেরকিরণ। ১৭ ডেকে পাঠানো। ১৮ নিমেষ। ২০ রোজা পালনের মাস। ২২ হত্যা করা হয়েছে এমন। ২৩ দেমাকি। ২৫ বারণ। ২৬ সময় সম্পর্কিত। ২৮ বরদানকারী। ৩০ এক ভাষার লিপিকে অন্য ভাষার লিপিতে লেখা। ৩১ মানুষ খায় এমন।

১	২	৩		৪		৫			৬
৭									
				৮	৯			১০	
	১১	১২	১৩				১৪		
		১৫		১৬			১৭		
১৮	১৯			২০		২১			
	২২					২৩		২৪	
২৫			২৬		২৭				
							২৮		২৯
৩০					৩১				

গত সংখ্যার সমাধান

ব	ল	বা	ন			দ	শ	র	থ
র	ব		ত	ব	ক		র	স	ম
	জ	বা		স	র	ভা	জা		ক
		চ	ল	ন্ত		জ	ল	দ	
ব	স	ন		স	জ	ন		র	দ
ধ	ন		আ	খ	র		ক	দ	ম
	দ	র	দ		দ	খ	ল		
ক		ম	ব	ল	গ		মা	মা	
র	ম	ণী		ভা	ব	ন		ঝা	মা
দ	ম	য়	ন্তী			ই	মা	র	ত

সূত্র আড়াআড়ি

১ নিয়ে আসা। ২ নাভি পর্যন্ত লম্বিত হার। ৩ অম্ল স্বাদযুক্ত। ৪ ধনুক। ৫ বড় শহর। ৬ এই ওষুধ উলটেও লাগানো যায়। ৯ ঘনিষ্ঠ মেলামেশা। ১০ বড় পেরেক। ১২ সবুজ রঙের দামি পাথর। ১৩ বিলম্বিত। ১৪ সাত প্যাঁচওয়ালা। ১৬ এটি একহাতে দেওয়া যায় না। ১৯ খাজনা ব্যতীত অন্য পাওনা। ২১ ফল পাকানোর জন্য এটি দেওয়া হয়। ২৪ পণ্ডিত। ২৫ গতানুগতিক। ২৬ পালকিবাহক সম্প্রদায়। ২৭ বিবৃতি। ২৮ বয়ে যাওয়া। ২৯ গভীর কাদা।

চিত্রপট

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

বিজনের আজ ঘুমও ভেঙেছে অনেক দেরি করে। ক'দিন হল ধড়ফড় করে আর ঘুম ভাঙছে না। দিন কুড়ি বোধ হয় কেটে গেছে, মা, মেয়ে কোনও খবর নেয়নি। প্রত্যাশা চলে যাওয়ায় বেশ বড় ধরনের শূন্যতা তৈরি হয়েছিল মনে। সেটা কিছুটা ভরাট করে রেখেছিল শিউলি। একটা মাথা খারাপ মানুষেরও প্রয়োজন আছে সংসারে। অদ্ভুত সব কাণ্ড করে ব্যস্ত রাখত বিজনকে! কাল ও চলে যাওয়ার পর থেকে মনটা সত্যিই বড্ড খালি খালি লাগছে বিজনের। শিউলির আচমকা এভাবে চলে যাওয়ার পিছনে পাগলামি যেমন আছে, যুক্তিও কিছু কম নেই। যদিও কোনও সুস্থ মানুষ এর নাগাল পাবে না। লজিকটা কিন্তু সলিড। শিউলির চলে যাওয়াটা আকস্মিক কোনও ঘটনা নয়। সে গিয়েছে বিজনের কারণেই। ঘটনাটা কাউকে বলাও যাবে না। বিজন যা ঘটিয়েছিল, প্রায় নিরুপায় হয়ে! জানতে চেয়েছিল, শিউলির মনের মধ্যে আসলে ঠিক কী আছে? কেন তার প্রতি এত আকর্ষণ বোধ করে শিউলি? সেদিন হঠাৎ করে দুর্গাবাড়ি পৌঁছে গিয়ে সবচেয়ে বেশি চমকে দিয়েছিল শিউলি! ঠাকুরমা ওকে সরিয়ে নিয়ে গেলেও, পারিজাত কুনালের সঙ্গে মিটিং আর নি। তাল কেটে গিয়েছিল। পারিজাত একা ফরে গিয়েছিল কলকাতায়। কুনাল থেকে গেল। সেদিন রাতে কুনালের সঙ্গে শিউলিকে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ • লোচনা হয়। কুনাল শিওর ছিল, শিউলি বিজনকে নিজের প্রেমিক হিসেবেই দেখতে চায়! শুনে অবাক হলেও, কথাটা বারবার ভেবে বিজনের কিন্তু সেদিন ভালই লেগেছিল!

ঘটনাটা ঘটেছিল শিউলিকে দুর্গাবাড়ি থেকে ফিরিয়ে আনার দিন চারেক পর। ক'দিন শিউলি ভালই ছিল। কোনও গোলমাল পাকায়নি, দাগ ডিঙোয়নি উঠোনের। বিজনের ভয় ছিল, একবার যখন ওয়র্কশপে পৌঁছে গিয়েছে, খাতির পেয়েছে ঠাকুমার, হয়তো আবার সেখানে উদয় হবে! আশ্চর্যভাবে হয়নি! পরশুর আগের দিন বিজন ওয়র্কশপ বন্ধ করে বাড়ি ফিরেছে রাত ন'টা নাগাদ। বাড়িতে কেউ থাকবে না। মা আগেই বলে রেখেছিল, হরিসভায় নামগান হবে রাত পর্যন্ত। মুরারিকাকারাও যাবে। বাড়ির ডুপ্লিকেট চাবি বিজনের ঝোলায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল মা। নিজেদের ঘরের তালা খোলার আগে বিজন একবার তাকায় মুরারিকাকাদের ঘরের দিকে। তালা দেখতে না পাওয়া গেলেও, ঘর অন্ধকার দেখে মনে হয়েছিল, শিউলিও গিয়েছে হরিসভায়। ঘরে ঢুকে টিভি চালিয়েছে বিজন, হঠাৎ 'ওরে বাবা গো, মা গো' বলে চিৎকার! শিউলির ভয়ার্ত গলা। বিজন [illegible] বেরিয়ে আসে। অন্ধকার ঘরে কী করছে উলি? স্টোভ ফোভ জ্বালাতে গিয়ে আগুন ধরিয়ে ফেলল না তো শাড়িতে? ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে যেই ওদের ঘরে ঢুকেছে বিজন, শিউলি ঝাঁপিয়ে পড়ল কে। মুখ গুঁজে আঙুল তুলল দেওয়ালের দিকে। ীষণই ভয় পাওয়া গলায় বলল, "ওই দেখো, মাথা

শিউলিকে ছুঁয়ে থাকতে ভালও লাগছে, হাতটা রয়েছে কোমরের খোলা

নাড়ছে।” চট করে ব্যাপারটা ধরতে পারেনি বিজন, ভাল করে খেয়াল করতে গিয়ে আবিষ্কার করে শিউলির ভয় পাওয়ার উৎস! দেওয়ালে ঘাড় নাড়া পুতুলের ছায়া পড়েছে বড় করে। নড়ছে জোকার পুতুলের ঘাড়টা। বুকে লেপ্টে থাকা শিউলির থুতনি ধরে শিউলির সামনে থেকে মানে মানে কেটে পড়ার জন্যই প্রস্তাবটা দিয়েছিল বিজন। ঘাড় কাত করে সম্মতি জানায় শিউলি। জোকারের মাথা থামিয়ে বিজন পা রেখেছিল চৌকাঠের বাইরে। কথামতো আলো নিভিয়েছিল শিউলি। তারপর কী যে হল

অংশে। কী মসৃণ ত্বক! যেন ঝর্নার পাশে থাকা শ্যাওলালাগা পাথর, কতদিন রোদ পায়নি।

বিজন আলমারির দিকে ঘুরিয়ে বলেছিল, “ওই পুতুলটার ছায়া পড়েছে দেওয়ালে। এত ভয় পাওয়ার কী আছে!”

“অন্যদিন তো পুতুলটার ঘাড় নড়ে না। ছায়াটাও স্থির থাকে। আজ কেন নড়ছে?” সন্দেহের গলায় জিজ্ঞেস করেছিল শিউলি।

বিজন বলেছিল, “হয়তো টিকটিকি ফিকটিকি পুতুলটাকে ধাক্কা মেরেছে!”

“কোথায় টিকটিকি, দেখাও?” অবিশ্বাসের কণ্ঠে বলেছিল শিউলি। ঘরের কোথায় সেঁধিয়েছে টিকটিকি, বিজন কি তখন খুঁজতে বসবে? এদিকে শিউলিকে ছুঁয়ে থাকতে তার বেশ ভালও লাগছে, হাতটা রয়েছে কোমরের খোলা অংশে। কী মসৃণ শিউলির ত্বক! যেন ঝর্নার পাশে থাকা শ্যাওলালাগা পাথর, কতদিন রোদ পায়নি। বিজনের গায়ে সেঁটে থেকেও শিউলির যেন কোনও ভাববিকার নেই, হঠাৎ খেয়াল করে যে সরে যাবে, তার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। বলে যাচ্ছিল, “ঘর অন্ধকার করে শুয়েছিলাম। তোমার সাইকেল নামানোর আওয়াজ শুনেই উঠে পড়ে আলো জ্বালিয়েছি, দেখি, ছায়াটা ঘাড় নাড়ছে। বারণ করছে বাইরে যেতে। বুঝে গিয়েছে, তোমাকে দেখতে আমি বারান্দায় যাব!”

শিউলিকে বুক থেকে সরিয়ে বিজন বলেছিল, “বেশ, এক কাজ করছি। জোকারটার মাথা থামিয়ে দিচ্ছি, তারপর বেরিয়ে যাব ঘর থেকে। তুমি আলোটা নিভিয়ে একটু অপেক্ষা করবে। ফের জ্বালিয়ে আমাকে দেখার জন্য যাবে বারান্দায়, তখন দেখো তো পুতুলটা ঘাড় নাড়ে কি না?”

বিজনের, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল নিজের উপর! খানিক আগে শিউলিকে ছোঁয়ার কারণে অদ্ভুত এক বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছিল শরীরে। অন্ধকারটা যেন বিজনকে চুম্বকের মতো টেনে নিল। শিউলির গন্ধ খুঁজে বিজন ঠোঁট রেখেছিল ওর ঠোঁটে। একটু বুঝি হকচকিয়ে গিয়েছিল শিউলি, চুম্বন গ্রহণ করেছিল ঘোরের মধ্যেই। তারপরই বিজন ওকে বিছানায় ফেলে। দ্রুত খোলার চেষ্টা করে শাড়ি, ব্লাউজ। শিউলি বাধা দিচ্ছিল, ছটফট করছিল। বিজন ভেবেছে লজ্জা। মাথার মধ্যে তখন প্ররোচনার কাজ করছে কুনালের কথাগুলো। শিউলিকে যত উন্মুক্ত করছে বিজন, তত ঘোর লেগে যাচ্ছে যৌবনের উদ্ভাস দেখে। শিউলি কিন্তু ক্রমাগত বাধা দিয়ে যাচ্ছিল বিজনকে, স্থির হতে দিচ্ছিল না। রোখ চেপে গিয়েছিল বিজনের। তারা দু’জনেই তো উপোসি শরীর, কেন আটকাচ্ছে শিউলি? হঠাৎই অসম্ভব জোরে শিউলি ওকে ধাক্কা মেরেছিল! ছিটকে গিয়েছিল বিজন, মেঝেতে পড়ার আগে কোনওক্রমে সামলে নিয়েছিল নিজেকে। একটা মেয়ের শরীরে যে এত শক্তি থাকতে পারে, ধারণা ছিল না ওর।

শাড়িতে নিজেকে মুড়ে শিউলি ততক্ষণে সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়েছিল। তীব্র অভিমানসহ ভর্ৎসনার সুরে বলেছিল, “ছিঃ, তুমিও অন্যদের মতো। তোমাকে না আমি ভালবাসি?”

আমতা আমতা করে বিজন বলেছিল, “এগুলো কি ভালবাসার চেয়ে আলাদা?”

“আলাদাই তো। আমি না আটকালে তুমি যে আরও কী কী সব করতে, ভাবলেই আমার গা গুলিয়ে আসছে!”

শিউলির কথাগুলো থেকে বিজন পরিষ্কার বুঝতে পারছিল, সন্দীপ কেন নির্ভয়ে বউকে এখানে রেখে গিয়েছে। মুরারিকাকাদের ঘর থেকে মাথা নিচু করে বেরিয়ে আসতে আসতে বিজনের মনে হচ্ছিল, কুনালের কথাগুলো তার মানে বোগাস! শিউলির মনে কোনও প্রেমিকের ছবি আঁকা নেই। বিজনকে নিরাপদ মনে করত বলেই কাছে এসেছিল।

ভীষণ আত্মগ্লানিতে কাটল রাতটা। ঘুম হল ছেঁড়া ছেঁড়া। সকালে মা এসে খবর দিল, শিউলি ফিরে যাচ্ছে দুর্গাপুরে। শোনার পর বিজন প্রথমে একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল, শিউলি কি কালকের ঘটনা বাড়ির সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে? মায়ের পরের কথায় আশ্বস্ত হয়। খুবই চিন্তিত মুখে মা বলতে থাকে, "কী যে হল হঠাৎ! বলছে, এখনই আমার রেখে এসো।" এরপর বিজন আর কোনও মন্তব্য করেনি। শিউলি চলে না যাওয়া অবধি বের হয়নি ঘর থেকে।

কুনালের বলা কথাগুলোর ফল কী হয়েছে, এখনও ওকে জানানো হয়নি। পারিজাতকে নিয়ে মিটিংয়ের পর বেশ কয়েকবার ফোন করেছে কুনাল। প্রত্যেক ফোনে অবধারিত দু'টি প্রশ্ন, 'ঠাকুরমাকে রাজি করাতে পারলি?' কিংবা 'শিউলির কেসটা কী দাঁড়াল?' দু'টো ক্ষেত্রেই ইতিবাচক কিছু বলতে পারেনি বিজন।

"হ্যাঁ রে, চা যে খাবি না, সেটা বলবি তো? পড়ে থেকে ঠান্ডা হয়ে গেল।"

মায়ের কথায় সম্বিত ফেরে বিজনের, কখন যে চা রেখে গিয়েছে পায়ের কাছে, খেয়ালই করেনি।

বাবা গলা তুলে মা'কে বলল, "কই গো, বাজারের থলেটা দাও। ঘুরে আসি।"

বাজারের ব্যাগ, বাবার হাতকাটা পাঞ্জাবি নিয়ে আসে মা। বাজারের ব্যাগ নিয়ে বাবা সিঁড়ির মুখে চলে গিয়েছিল, সামনের দিকে তাকিয়ে বাবাকে হঠাৎ পিছু হটতে দেখে খটকা লাগে বিজনের! পর মুহূর্তে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়, একইসঙ্গে আশ্চর্যের চূড়ান্ত সীমায়ও পৌঁছে যায় বিজন, সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসছে কৃষ্ণা!

বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ে যায় বিজন, কোনও খারাপ খবর আছে কি? সপ্রশ্নদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কৃষ্ণার দিকে।

কৃষ্ণা বলল, "অমিতেশের বোন এসেছিল। অমিতেশকে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

কৃষ্ণা আসাতে বিজন যতটা না অবাক হয়েছে, তার চেয়েও বেশি বিস্ময়ে বলে ওঠে, "পাওয়া যাচ্ছে না মানে?"

"পরিষ্কার করে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। নিরুদ্দেশ হওয়ার পর বাড়িতে একবার ফোনও করেছিল। খোঁজ করতে মানা করেছে। তারপর থেকে ফোনের সুইচ অফ!"

বিজন ভেবে পাচ্ছে না, নিরুদ্দেশ হওয়ার কারণ! শেষ দেখায় ওর কথাবার্তায় সেরকম কোনও আভাস পাওয়া যায়নি। আঁকতে পারছে না বলে একটা ফাস্ট্রেশনের মধ্যে ছিল। তার সঙ্গে নিরুদ্দেশ হওয়ার কী সম্পর্ক? মাথা তোলপাড় করেও বিজন কোনও সূত্র খুঁজে পায় না। আর একটা ব্যাপারে আশ্চর্য লাগছে, এই খবরটা দিতে কৃষ্ণা বাড়ি চলে এল কেন? আরও অনেক উপায় ছিল জানানোর। এই খটকাটা আগে মিটিয়ে নেওয়া যাক।

"খবরটা তো তুমি আমায় ফোনেও জানাতে পারতে। মিছিমিছি অফিসের আগে হুড়োহুড়ি..."

"খুকু দাদার ব্যাপারটা নিয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছিল। আমি তো আর বলতে পারি না, তুমি রাগ করে বাবা, মায়ের কাছে গিয়ে আছ। বললাম, একটা পার্টির কাছে গিয়েছে, ফিরতে দশটা মতো হবে। তুমি তারপরে এসো।"

"খুকুকে এ বাড়িতেই পাঠিয়ে দিতে পারতে। বাড়িটা ও চেনে।"

"এখানে তোমায় ক্যাজুয়াল অবস্থায় দেখে খুকুর বুঝতে অসুবিধে হত না, ইদানীং এ বাড়িতেই থাকছ তুমি। একে বেচারি দাদার কাণ্ড নিয়ে হয়রান হয়ে আছে। তারপর যদি দেখত, দাদার বন্ধুর পজিশনও খুব একটা সুবিধের নয়, ঘাবড়ে যেত আরও।"

ধাঁধা তবু কাটল না বিজনের। মোড়া ছেড়ে ওঠে, বাইরে বেরনোর [illegible]ক পরতে হবে। দরজার দিকে ঘুরতেই কৃষ্ণা বলে, "সব জামাকাপড়, জিনিসপত্র ব্যাগে নিয়ে নাও।"

[illegible]াগ নেব কেন?"

[illegible]লল, "প্রতীক্ষা তো পূরণ হয়েছে, এবার চলো। [illegible] এরকমই তো ঠিক [illegible] রছিলে?"

[illegible]কেবারেই চরিত্র বিরুদ্ধ আচরণ করছে। ও হঠাৎ [illegible] দয়ে উঠল, বোঝা যাচ্ছে না। রহস্য কিছু একটা [illegible]ছই। [illegible]র নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া না বউয়ের বৈলক্ষণ্য [illegible]নটা নিয়ে আগে ভাববে, ঠিক করে উঠতে পারে না বিজন।

[illegible]কশা দাঁড় করিয়েই রেখেছিল কৃষ্ণা। বিজন রিকশায় উঠে নিজের জিনিসপত্র ভরা ব্যাগটা পায়ের কাছে রাখে। কতদিন পর দু'জনে রিকশায় পাশাপাশি বসে চলেছে। খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর বিজন মাথায় ঘুরতে থাকা সন্দেহটা উগরে দেয়, [illegible] মিতেশের নিরুদ্দেশ হওয়াটা সত্যি তো?"

[illegible] তবে খুকুর আবার আসার কথাটা মিথ্যে। আমি ওকে বলেছি, তুমি যাবে ওদের বাড়ি।"

"তা হলে আমাকে এভাবে ফ্ল্যাটে ফেরত নিয়ে যাওয়ার মানে?" সামান্য রাগের গলায় জানতে চায় বিজন।

"আমার একার পক্ষে চাকরি, সংসারের সবকিছু দেখা সম্ভব হচ্ছে না।"

"তাই বিনে পয়সার চাকরটাকে টুপিটাপা দিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছ?" চিমটি কেটে বিজন অপেক্ষা করে, কৃষ্ণার কতটা লাগল দেখতে হবে।

"টুপিটাপা আবার কী ল্যাঙ্গোয়েজ! তুমি তো এভাবে কথা বলতে না? সংসারটা তো আমার একার নয়, ফট করে সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে এলেই হল?"

জুতসই জবাব পেয়ে গেল বিজন, "ক'দিন আগেই তো বললে, ফ্ল্যাট তোমার,সংসারের কর্ত্রীও তুমি। ফ্ল্যাটে থাকলে, তোমার কথাই মেনে চলতে হবে। এখানে আমার পার্ট আর কী রইল?"

"কন্ডিশনটা বদলে ফেলেছি। আমার কিছু কথা শুনলেই হবে।"

কৃষ্ণাকে কিছুতেই প্রেডিক্ট করা যাচ্ছে না। বিজনের ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে, অচেনা কৃষ্ণার পাশে বসে থাকতে, "আমি এখন অযথা ফ্ল্যাটে গিয়ে কী করব! তার চেয়ে অমিতেশদের বাড়িতেই যাই।"

"যাও। তোমার ব্যাগটা আমি ফ্ল্যাটে গিয়ে রাখি। তারপর অফিস বেরিয়ে যাব। তুমি কিন্তু দুপুরবেলা ফ্ল্যাটে গিয়ে খেও। মেয়ে অপেক্ষা করবে।"

আবার হোঁচট খেল বিজন, "বুলান স্কুলে যায়নি?"

"কাল হাফ ইয়ারলি শেষ হল, আজ ছুটি।"

একটু ঝুঁকে রিকশাওয়ালার পিঠে টোকা মারল বিজন, "দাঁড় করাও তো ভাই, নেমে যাব।"

আপাতত কৃষ্ণার চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে বড় বড় পা ফেলে অমিতেশদের বাড়ির দিকে এগোয় বিজন। হাঁটতে হাঁটতে বিজন খেয়াল করে, অমিতেশকে নিয়ে ওর খুব একটা উদ্বেগ হচ্ছে না। কেমন যেন গর্বই হচ্ছে! নিরুদ্দেশ হতে হলে, এরকমই হওয়া উচিত। কেউ নাগাল পাবে না। আমি শালা ন্যাকামদন!

অমিতেশদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছুটা হেঁটে রিকশা নিয়েছে বিজন। ফিরছে ওয়র্কশপে। কপালে চিন্তার ভাঁজ। 'নিরুদ্দেশ' ব্যাপারটাই যথেষ্ট রহস্যময়। অমিতেশ সেটাকে আরও জটিল করে তুলেছে। আর বরের এই কাণ্ডকারখানা দিল্লিতে বসে পরোক্ষে সমর্থন করে যাচ্ছে নন্দা। অমিতেশের বাবা, মা, বোন পড়েছে অসহায় অবস্থায়। ওদের থেকে যা শুনল বিজন, তা হচ্ছে, পাঁচদিন আগে এক সকালে অমিতেশ হঠাৎ নিজের ব্যাগপত্র গুছোতে শুরু করে। ওর মা জিজ্ঞেস করেছিল, "কোথায় চললি?" অমিতেশ বলেছিল, "একটা অ্যাসাইমেন্টে যাচ্ছি। কোথায় থাকব, জানি না। পরে তোমাদের ফোন করে জানাব।" দু'দিন হয়ে গেল, ফোন আর আসে না। ওর ফোনে কল করলে দেখা যাচ্ছে সুইচ অফ। ঘটনাটা নন্দাকে ফোনে জানানো হয়। নন্দা জানতে চায়, "যাওয়ার সময় কি আঁকার জিনিসপত্র নিয়ে গিয়েছে?" ইজেল, ক্যানভাস, রং, তুলি, আঁকার জন্য যা যা লাগে প্রায় সবকিছুই নিয়েছে অমিতেশ। শুনে নন্দা বলেছে, "চিন্তার কিছু নেই। আঁকার জন্যই গিয়েছে কোথাও। কনসেনট্রেট করতে সুবিধে হবে বলে ফোন ধরছে না। কাজ একটু এগিয়ে গেলেই দেখবেন ফোন করবে।" নন্দার আশ্বাসে কাজ হয়নি। বাড়ির তিনজন চিন্তা করে যাচ্ছে খুব। আরও তিনদিন কেটে গেছে, অমিতেশ এখনও ফোন করেনি। যোগাযোগ করেনি নন্দার সঙ্গেও। তা নিয়ে কোনও তাপ উত্তাপ নেই নন্দার। সে শুধু একটা তথ্য জানিয়েছে, অমিতেশ এটিএম কার্ডে টাকা তুলেছে। পাসবুক আপডেট করিয়ে সেটা জেনেছে নন্দা। অমিতেশের বাড়ির তিনজনের উৎকণ্ঠাটা উপেক্ষা করার মতো নয়। বিজনের মধ্যেও ছড়িয়ে গেছে একই টেনশন। কোথায় গেল ছেলেটা, কী করছে? এবার এখানে এসে থেকে বেশ অস্থির ছিল, শেষদিকে খানিকটা অস্বাভাবিকও লাগছিল অমিতেশকে। মাথা খারাপ হয়ে যায়নি তো...আশঙ্কাটা মাথায় আসতেই নার্ভাস হয়ে পড়ে বিজন। অমিতেশের পরিবারের তিন অসহায় সদস্যের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "কুনালকে একটা ফোন করি। দেখি, ও কী বলে।" বিজনের থেকে সবটা শুনে কুনাল যা বলতে শুরু করেছিল, বিজন বাধ্য হয় ফোন কানে নিয়ে দূরে সরে যেতে! কুনালের মত হচ্ছে, "বেশ করেছে, নিরুদ্দেশ হয়েছে। এই বোরিং লাইফে আছেটা কী! ওর সাহস আছে বলতে হবে।" বিজন আর কথা বাড়ায়নি। কুনালটা এরকমই। মাথায় যা এল, বলে দিল। এই কুনালই হয়তো কাল পরশু চলে আসবে এখানে। বিজনকে বলবে, "চল তো দেখি, কোথায় গিয়েছে শালা। বিরাট আর্টিস্ট ভাবছে নিজেকে।" ফোন পকেটে পুরে বিজন ফিরে এসেছিল অমিতেশের মা, বাবার সামনে। বলেছিল, "কুনালও ওই একই কথা বলছে, একটু সময় নিতে।"

দুর্গাবাড়ির গেটের কাছে এসে পৌঁছেছে রিকশা। ভিতর থেকে হই হট্টগোলের আওয়াজ আসছে। কী হল আবার, কার সঙ্গে লাগল? ভাড়া মিটিয়ে বিজন পা চালিয়ে সদর পেরোয়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে অবিশ্বাস্য এক দৃশ্য দেখে বিজন! দুর্গাবাড়ির ছাদে গোটা ছ'জন। ওদের মধ্যে দু'জনকে চেনে বিজন, অপু আর গোপাল। এবাড়ির দু'টো আলাদা ভাড়াটের ছেলে। বাকি চারজন মজুর। ওদের হাতে শাবল, গাঁইতি, কোদাল। বাড়ি ভাঙার উদ্যোগ নিচ্ছে। নীচ থেকে চেঁচাচ্ছে বামুনবুড়ি। উঠোন থেকে ঢেলা তুলে ছুঁড়ছে। ওরাও বুড়ির সঙ্গে ঝগড়া করে যাচ্ছে। বিজন আর দাঁড়ায় না। শরীরের দ্রুত রক্ত চলাচল ওকে এগিয়ে নিয়ে যায় ছাদের সিঁড়ির দিকে। ছাদে পৌঁছোতেই দপ করে আগুন জ্বলে মাথায়, গোপাল বলে ছেলেটা গাঁইতি মারল ছাদে। হাতের কাছে পড়ে থাকা একটা আধলা ইঁট তুলে নিয়ে বিজন চেঁচিয়ে উঠল, "থাম শালা, নইলে এক টিপে ছাদের বাইরে ফেলে দেব!"

বিজনের রুদ্রমূর্তি দেখে যথেষ্ট ঘাবড়াল ছ'জন। গোপাল নিচু গলায় বলল, "এ বাড়ি তো ভাঙা হবেই। প্রোমোটার ভাঙার কন্ট্রাক্ট আমাদের দিয়েছে।"

"এটা কি প্রোমোটারের বাবার বাড়ি, যে ভাঙতে বলেছে?" গলা তুলেই জানতে চাইল বিজন।

অপু বলল, "আমরা রতন জেঠার পোর্শন ভাঙছি। প্রোমোটার এটা কিনে নিয়েছে।"

"প্রোমোটার এ বাড়ির একটা ইটও কিনতে পারেনি। তোরা যদি

এরপর আধ ইঞ্চিও গর্ত করিস দুর্গাবাড়ির দেওয়ালে, থেঁতলে মারব তোদের! কোন বাবা বাঁচায় দেখব!”
ওরা ধীরে ধীরে সরতে শুরু করল। বোধ হয় বিজনের হুমকির সামনে দাঁড়িয়ে থাকার সাহস পেল না।

দুর্গাবাড়ির ঠাকুরদালানের সামনের রকে দাঁড়িয়ে ছাদের গোটা ঘটনাটা দেখল বাপি। মনে মনে নিশ্চিন্ত হল, দাশু বাবু ঠিক লোকের কাছেই পাঠিয়েছে। মর্দ হো তো অ্যায়সা! হাতে শাবল, গাঁইতি থাকা ছ’জনের সামনে একা একটা আধলা ইঁট নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল! তা পুরো দলটার হাওয়া ফুস! কী লার্গা ল তখন লোকটাকে! দাশুবাবু অবশ্য লোকটার এই দমের কথা বলেনি। শুধু বলেছিল, ‘বিজনবাবুর কাছে যা। লোকটা এলাকার পুরনো লোক। প্রচুর চেনা জানা। কাজটাও খুব ভাল করে। এক দু’বার কথা বলে যা বুঝেছি, মানুষটা অন্যরকম। একবার যদি ওর কারখানায় ঢুকে পড়তে পারিস, বলিস নিজের দুরবস্থার কথা, আমার তো মনে হয়, তোকে পুলিশের থেকেও বাঁচিয়ে রাখতে পারবে।’ এ বাড়িতে ঢুকে সেই বিশ্বাসটা অলরেডি পেয়ে গিয়েছে বাপি। পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়া এখানে খুব ইজি। এনতার গলি ঘুঁজি, ভাঙা দেওয়াল, পাঁচিল ছাড়া ছাদ...পুলিশের গন্ধ পেলেই সটকে পড়া যাবে। এখন একটাই চিন্তা বিজনবাবু চাকরিতে নেবে কি?
ছাদ থেকে নেমে লোকটা কিছুক্ষণ হল কারখানার ঘরে ঢুকেছে। ছ’ সাত হাত দূর থেকে বিজনবাবুকে দেখল বাপি। রো আর্টিস্ট টাইপের দেখতে। ছাদে এই লোকটাকেই পাগলের মতো লাগছিল! মানুষের এরকমই হওয়া উচিত, ঘটনা রূপ। যেখানে যেটা কাজে লাগবে, সেরকম হয়ে যাও। কতে বাধো বাধো ঠেকছে বাপির। এই মাত্র টেনশন করে এসেছে ভদ্রলোক, একটু শান্ত হোক, তারপর ঢুকবে। আপাতত থামের গোড়ায় বসে পড়ে। বাপি লক্ষ করেছে, ছাদের ঘটনাটা যখন ঘটছে, এ বাড়ির অনেক পাবলিক উপরের দিকে তাকাচ্ছেই না। নিজের কাজ বাড়ি থেকে বেরচ্ছে, ঢুকছে। কোথায় কী হচ্ছে, তাদের যেন জানার দরকার নেই। একটা বুড়িকে ঘিরে কয়েকজন মাত্র পরের ঝামেলাটা দেখছিল। তাদের মধ্যে মেয়েরাই ছিল বেশি। ঝামেলা শেষ, এখন সকলে হাওয়া। যে যার নিজের গিয়েছে।
বাপির জন্য এটা অবশ্য আদর্শ পরিবেশ। যদি চাকরি পায়, কেউ ওর সম্বন্ধে বেশি খোঁজপাতি নেবে না। দাশুবাবুর নিজের ঠেলায় থাকা যাচ্ছে না। সারাক্ষণ লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে।

ক্রমশ

অলঙ্করণ: নির্মলেন্দু মন্ডল

সানন্দা শব্দভেদ

সূত্র পা শা পা শি

১ বন্দুকধারী সেপাই। ৫ সম্রাট শাজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র। ৮ কবুল করা। ৯ বাসস্থান। ১০ অপ্রাপ্তবয়স্ক। ১২ পদ্মের কুঁড়ি। ১৫ বাধার অভাব। ১৮ শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাসের চরিত্রবিশেষ। ২০ বিপরীত, অন্যথা। ২২ পৃথিবীর মানুষ। ২৪ গভীর কাদা। ২৬ পরিহাস বা ঠাট্টা। ২৮ দেখার বা অনুভব করার যোগ্য। ২৯ বিভিন্ন উপাদানের মিলন বা একীকরণ।

১	২	৩		৪		৫		৬	৭
৮								৯	
				১০			১১		
১২	১৩		১৪						
					১৫	১৬		১৭	
১৮		১৯							
					২০				২১
		২২	২৩						
২৪	২৫						২৬	২৭	
২৮					২৯				

গত সংখ্যার সমাধান

আ	ল	ট	প	কা		ন	রা	ধ	ম
না	ল	ক		র্মু		গ			ল
	ন্তি			ক	দ	র		গ	ম
	কা	ম	না		হ		সা	জা	
		র	বি	ক	র		ত	ল	ব
প	ল	ক		র	ম	জা	ন		
	হ	ত		তা		গ	র	বি	
মা	না		কা	লি	ক			শা	
মু			হা		থ		ব	র	দ
লি	প্য	ন্ত	র		ন	র	খা	দ	ক

সূত্র

১ বিরক্তিকর বাচালতা। ২ আওয়াজ, ধ্বনি। ৩ চাঁদের ষোড়শ ভাগের এক ভাগ। ৪ জলনিকাশের নর্দমা। ৫ অতি দুরন্ত। ৬ পরিশোধ করা। ৭ কোমরে বাঁধার পটিবিশেষ। ১১ কমের ভাব। ১৩ এই ওষুধটি উলটেও লাগানো যায়। ১৪ পদ্ম। ১৬ প্রকৃষ্ট বীর। ১৭ প্রতিশোধ। ১৮ বৈষ্ণবদের বিবাহপ্রথা। ১৯ কথার মাত্রারূপে ব্যবহৃত অর্থহীন শব্দ। ২০ অরণ্যে নির্বাসন। ২১ ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। ২৩ গোরুর মতো গলকম্বলহীন পশু। ২৫ ঘর, কামরা। ২৬ লক্ষ্য বা টিপ। ২৭ উঁচু ক্ষেত্র।

চিত্রপট

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

নদীর গ্রাসে ভাঙনোদ্যত জমিদারবাড়ির জানলায় স্বচ্ছ শাড়িতে বিষণ্ণ মুখে

বাপির ভয় বাড়ছে। দোকানটা তো আকডাঙা থেকে বেশি দূরে নয়। খালি মনে হচ্ছে, এই বুঝি কোনও চেনা লোকের মুখোমুখি পড়ে গেল! বাপির ভয়টা টের পেয়ে দাশুবাবুই বলল, ‘‘কলকাতায় চাকরি করলে তুই উকিল আর ঘর করতে পারবি না। উনি কখন দেখা করতে বলবেন, কোনও ঠিক নেই। কাছাকাছির মধ্যেই অথচ যেখানে তোকে কেউ চিনবে না। চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হওয়ার চান্স কম, সেরকম কোথাও চাকরি নে।’’ মনে মনে সেরকম একটা জায়গা খুঁজছিল বাপি। তখনই দাশুবাবু বলল, ‘‘তুই কানাইপুরে যা।’’ আকডাঙা আর কানাইপুর যেন দু’টো আলাদা দেশ! কানাইপুর বড় লোকের, আকডাঙা গরিবদের। মাঝে রেল লাইনটা হচ্ছে বর্ডার। আজ তো দিনের বেলাই কানাইপুরে ঢুকল বাপি। রেল গেট পেরনোর পরই ভয়টা কেমন কেটে গেল! পাশ দিয়ে যাচ্ছে প্রচুর লোক, বাপিকে কেউ খেয়ালই করছে না। এমনকী, বাপির একথাও মনে হল, তার মতো আরও অনেক ফেরারি কানাইপুরে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দাশুবাবুর মতন একজন উপকারী মানুষ পাশে পেলেই, আর কানও সমস্যা নেই। পুলিশ খুঁজছে এমন লোককে এমনিতে কেউ শেল্টার দিতে চায় না। দাশুবাবু কিন্তু দিয়েছে। মৃত্যুর হাত থেকে যেমন বাঁচিয়েছে, ব্যবস্থাও করে দিয়েছে লুকিয়ে থাকার। দাশুবাবু রাতে দোকানেই শোয়। মুদির দোকানটা লাইনের ধারে। পিছন দরজা দিয়ে দাশুবাবু বাথরুম যেতে বেরিয়েছিল, তখনই চোখে পড়ে দুটো ট্রান্সফর্মার বক্সের মাঝে বসে আছে কেউ। বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে, সুইসাইডের ধান্দা। অমনই দৌড়ে এসে বাঁচিয়েছে বাপিকে! আর একটু দেরি হলেই, গপ্পো শেষ হয়ে যেত।

দাশুবাবুর দোকান থেকে সন্ধেবেলা বেরিয়ে দিদির বাড়িতে ফোন করেছিল বাপি। দিদির শ্বশুর বলল, “উকিলের সঙ্গে কথা হয়েছে। শিবেনও আসছে। তুমি এরকমই রোজ একবার করে ফোন কোরো। তবে বুথ পাল্টে পাল্টে করবে।” তাই করছিল বাপি।

শিবেনদার সঙ্গে কথাও হয়েছিল। উকিলের সঙ্গে দেখা করতে বলেছিল শিবেনদা। গিয়েছিল বাপি। কানাইপুরেরই উকিল। উকিল দুলাল দত্ত বলেছে, এই কেসে বিনা জামিনে সর্বোচ্চ তিন মাসের জেল। বাদিপক্ষের হাতে এভিডেন্স যখন বেশি নেই, সাক্ষীও মজবুত নয়, তখন আশা করছে এক দেড় মাসের মধ্যে মা দিদিকে ছাড়িয়ে আনতে পারবে। তারপর বাপিকে কোর্টে সারেন্ডার করতে হবে। তবে ওকে ছাড়াতেও নাকি উকিলের এক দেড় মাসের বেশি [illegible] না। সব ব্যবস্থা করে শিবেনদা ফিরে গিয়েছে [illegible] গিয়েছে নিজের বাবার কাছে। [illegible]াপিকে বলেছে, যখন যা দরকার, নিয়ে নিতে। [illegible] যাগ রাখাটা [illegible] মস্যা হয়ে যাচ্ছিল বাপির। মোবাইল ফোন একটা [illegible] নয়েছে বটে, কিন্তু দাশুবাবু বলেছে, সেটা যতটা

সম্ভব এড়িয়ে চলতে। ওটা থেকেই নাকি বাঘা বাঘা অপরাধীরা ধরা পড়ে যায়! তার চেয়ে যখন যেখানে যাওয়ার দরকার, সশরীরে চলে যাওয়াটাই ভাল। তাই করছে বাপি। কিন্তু আকডাঙায় দিনের বেলা ঘোরাটাই ঝুঁকি হয়ে যাচ্ছে। চেনা কেউ

এসো। শুনি, তোমার অবস্থাটা।”

বাপি চটি খুলে ঘরে ঢোকে। খুবই ছোট কারখানা। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিল, একটাই লোক স্ক্রিন টানছে। এই স্টাফের সামনে নিজের কথাগুলো বলবে কিনা ভাবছে বাপি।

দাঁড়িয়ে আছে ডলি, সে যেন নিজের যৌবন প্রাচুর্য দিয়ে লজ্জা পাওয়াতে চাইছে নদীকে।

যদি বাপিকে ফলো করে ডেরাটা জেনে নেয়? তারপর হয়তো খবর দিয়ে দিল পুলিশে! দাশুবাবুর কাছে আরও একটা অসুবিধে হচ্ছিল, কাজ না করে বসে যাচ্ছিল হাতটা। আর ইঁদুরের মতো গোডাউনে পড়ে থাকা, তা তো প্রায় জেলে থাকার মতোই! দাশুবাবুর সঙ্গে গোটা ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করেছিল বাপি। উনি নিজেই হদিস দিয়েছেন এই কারখানাটার।

“তুমি কে গো? এখানে কী চাই?”

বুড়ির গলা। বাপি মুখ তুলে দেখে, ছাদে ঝগড়ার সময় এই বুড়িটাই উঠোনে দাঁড়িয়ে উপরের ঘটনা দেখছিল। বাপি বলল, “বিজন ভট্টাচার্যর সঙ্গে দেখা করব।”

“তা, যাও না বাছা। ভিতরেই তো আছে। এখানে বসে আছ কেন?”

বাপি দালান থেকে উঠে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কম্পিউটারে এক মনে কাজ করছেন বিজনবাবু। বিজনবাবু ঘুরে চশমার উপর দিয়ে তাকান, “কী চাই?”

“আমি সিল্ক স্ক্রিনের সব কাজ জানি। একটা চাকরির ভীষণ দরকার।”

“আমার এখানে চাকরি নেই। যে ক’টা লোক আছে, তা দিয়েই কাজ উঠে যায়,” বললেন বিজনবাবু।

যতটা সম্ভব কাতর কণ্ঠে বাপি বলল, “আমার অবস্থা খুব খারাপ। আপনি আমার হাতের কাজ দেখে নিতে পারেন। তারপর না হয় নেবেন।”

বিজনবাবু এবার চেয়ারসুদ্ধু ঘুরে বাপির মুখোমুখি হলেন, “ভিতরে

“কী হল, শুরু করো।”

“আসলে একটু প্রাইভেট ব্যাপার...”

বিজনবাবু ইশারায় স্টাফ দু’জনকে বাইরে যেতে বলেন। তারা ঘর ছেড়ে যেতে, বাপি শুরু করল, “আমার এক বন্ধু প্রতাপ, আমরা একসঙ্গে বড়বাজারে...”

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। এখানে আসার পর থেকে এই প্রথম। বৃষ্টির অপেক্ষায় ছিল অমিতেশ। ঘরটা চারতলায়, লাগোয়া ঝিল। বৃষ্টির সোঁদা গন্ধের বদলে ঘরে ঢুকে আসছে জোলো হাওয়া। খাটে বসে ডলি দেখে যাচ্ছে অমিতেশের আঁকা ছবিগুলো। চারটে ছবি প্রায় সম্পূর্ণ, একটার কাজ এখনও বাকি আছে। সবক’টা ছবিতেই ডলির নগ্নতা প্রধান অবজেক্ট। একটাতেই শুধু স্বচ্ছ একটা শাড়ি পরিয়েছে অমিতেশ। নদীর গ্রাসে ভাঙনোদ্যত জমিদারবাড়ির জানলায় স্বচ্ছ শাড়িতে বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে আছে ডলি, নিজের যৌবন প্রাচুর্য দিয়ে লজ্জা পাওয়াতে চাইছে নদীকে। আর একটা ছবি হচ্ছে, ভোরের একটু আগের সময়। অন্ধকার কাটেনি বাগানের, ডলির ব্যাক পোর্শন, হাঁটুর একটু আগে অবধি। ঘাড় ফিরিয়েছে ডলি, মুখেচোখে তৃপ্ত রাতযাপনের হাসি। আর যে ছবিটা এখনও কমপ্লিট হয়নি, সেটার সাবজেক্ট হল, কম দামি পতিতার ঘর। পতিতা ডলি বসে আছে বিছানায়, ঊর্ধ্বাঙ্গ নগ্ন। এলোমেলো চুল, কোমরের কাছে তালগোল পাকানো শাড়ি, ঘাঁটা বিছানা। ঘরের দরজা আধখোলা। যেন এই মাত্র কেউ চলে গিয়েছে! আন্দাজ করা যায়, সে ছিল খদ্দের। ডলির বিষণ্ণমুখ ছোট

জানলার দিকে ফেরানো, সেখানে ছেঁড়া পর্দা আর বিকেলের সোনা রোদ। এত দূর অবধি করতে পঁচিশ দিন মতো লাগল। আর কয়েকটা সিটিং দিলেই ডলির ছুটি। আপাতত অমিতেশেরও। ছবিগুলো নিয়ে দিল্লি ফিরবে। তেমনই বলে রেখেছে নন্দাকে। কোথায় বসে ছবি আঁকছে, কী আঁকছে, কিছুই বলেনি। শুধু বলেছিল, "কাজ হয়ে এসেছে। এবার ফিরব। কানাইপুরের বাড়ি হয়েই যাব। "

অমিতেশ কখনও যা করেনি, প্রায় একসঙ্গে পাঁচটা ছবিতে হাত দিয়েছিল। একটা করে ছবি নিজের থেকেই যেন সম্পূর্ণতা পেয়েছে। ডলিও বাধ্য মেয়ের মতো সিটিং দিয়েছে। মাঝে সাঝে একটু বদমাইশি করে, আদিম আবদার! "ধুর, তোমার না হয় কিছু হয় না, সাধুপুরুষ! আমি তো খালি গায়ে বসে থাকতে থাকতে গরম খেয়ে যাই। একটু আদর করো না মাইরি। টাকা বেশি দিতে হবে না।"

অমিতেশ বারবার বুঝিয়েছে, "ওসব করলেই আমি আর তোমাকে ফুটিয়ে তুলতে পারব না। সব কাজ পণ্ড হয়ে যাবে। তোমাকে যেভাবে দেখে মাথায় পুরে নিয়েছি, ঘেঁটে যাবে।" তবু কথা শোনে না ডলি। আচমকা আঁকড়ে ধরে চুমু খেতে যায়। ওকে দূরে সরিয়ে রাখা দুষ্কর হয়ে ওঠে। এখন অবধি রেখেছে অমিতেশ।

সত্যিই ভয় হয়, ওকে ভোগ করে নিলেই, বড্ড বাস্তবের হয়ে যাবে মেয়েটা। আর হয়তো ওকে আকা যাবে না। ঝিলে বৃষ্টি পড়া দেখে এখন যে ছবিটা মাথায় এসেছে, আঁকতে গেলে অনেকদিনের ব্যাপার। ডলিকে ততদিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে কি না সন্দেহ! অমিতেশ তো নিজেও নিজের সঙ্গে লড়াই করছে। ডলিকে শরীর দিয়ে পেতে তারও উদগ্র ইচ্ছে হয়। সামলে রাখে নিজেকে। 'লাস্ট জার্নি' নামক কল্পনার ছবিটায় কি হাত দেওয়া ঠিক হবে? এবার কাজে হাত দিতে হবে। ডলিকে অবশ্য আজ বেশিক্ষণ সিটিং দিতে হবে না। লাস্ট ছবির ফিগারের কাজ প্রায় শেষ। ক্যানভাসের বাকি অংশের কিছু ডিটেল বাকি। ইজেলে লাগানো ছবিটার পাশে রাখা টুলে বসে অমিতেশ। ডলির যেন সম্বিত ফেরে। অমিতেশ এখন তার মুখোমুখি। অল্প হেসে অমিতেশ জানতে চাইল, "কী ব্যাপার, আজ একেবারে লক্ষ্মী মেয়ের মতো বসে আছ! নো বকবক?"

"ছবিগুলো ভাল করে দেখে নিচ্ছি। আর ক'দিন পরেই তো সব চলে যাবে।"

"মন খারাপ লাগছে?"

অমিতেশের প্রশ্নে মাথা উপর নীচ করে ডলি।

"এই ছবিগুলো যখন বিক্রি হয়ে যাবে, আমারও মনখারাপ হবে। অথচ বিক্রি করার জন্যই আঁকছি, কেমন একটা মায়া পড়ে যায়!"

"এতই যখন দরদ, আমাকেই দিল্লি নিয়ে গেলে হয়," ঠেস মারা সুরে বলে ডলি।

কোনও উত্তর দেয় না অমিতেশ। ডলি নিজের সঙ্গে ছবিকে আলাদা করতে পারছে না। ভাবছে, ছবির সবক'টা মেয়েই সে। কিন্তু অমিতেশ আলাদা করতে পারে। জানে, মডেলের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা তৈরি হলেই শিল্পীর নির্লিপ্ততা সে হারিয়ে ফেলবে।

"আমাকে তো কাজের লোক হিসেবেও তোমার বাড়িতে নিয়ে যেতে পারো। তুমি চলে গেলেই আবার তো সেই, এর তার সঙ্গে শোও, বারে নাচো..."

ডলি নিজেই যেন নিজের ভুল ধরতে পেরেছে, এই সুরে বলে ওঠে, "নাঃ, তোমার বউ আমাকে মেনে নেবে না। "

"আমার বউও আর্টিস্ট। সে জানে, আর্টিস্ট, মডেলের সম্পর্ক ওই পর্যায়ে সহজে যায় না। যাওয়া উচিত নয়। দু'জন দু'জনের কাজ করবে, এর মধ্যে ওসব আসছে কী করে!"

"তা হলে নিয়ে চলো আমায় দিল্লির বাড়িতে। তোমাকে ছাড়া থাকতে পারব না আমি!"

প্যালেটটা মেঝে থেকে তুলতে নিচু হয়েছিল অমিতেশ। কিন্তু না তুলে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। তাকায় ডলির দিকে। ডলি মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। দৃষ্টি জানলার বাইরে। ছোট করে নিয়েছে চোখ, বাঁধ দিচ্ছে কান্নায়। অমিতেশের কিছু করার নেই। তাকে নিরাসক্ত কতে হবেই। ডলির এই কষ্ট ক্ষণস্থায়ী। অমিতেশ ফিরে গেলে, আবার রনো জীবনে মানিয়ে নেবে। এমনকী, নতুন প্রেম াও অসম্ভব নয়। অমিতেশ যে আর্টওয়র্কগুলো করেছে, তা থেকে বে বহু বহু বছর। তখন পৃথিবীতে অমিতেশও কাছে জীবন তুচ্ছ।

মেকআপ বক্স তুলে নিয়ে ডলির দিকে এগিয়ে আসে তশ।

ক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "তুমি বলেছিলে ছবিগুলো লাখ লাখ টাকায় বিক্রি হতে পারে। ওই টাকা থেকে কিছু দিয়ে আমাকে এই ঘরেই থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও ছবিগুলো বিক্রি করে তুমি আবার চলে এসো। আমি কথা দিচ্ছি, কারও ঙ্গে শোব না, নাচতেও যাব না। শোওয়া মানেই ফিগার নষ্ট। তুমি যেমনটা দেখে যাচ্ছ আমাকে, ফিরে এসে তেমনটা পাবে। যত ইচ্ছে ছবি আঁকো।"

, সেসব রে দেখা যাবে। মাথায় আর একটা ছবি সটা আঁকতে। আমি নই চলে যাচ্ছি না। এবার রেডি হও তো। অনেক কথা হয়েছে।"

ডলি শাড়ি ব্লাউজ খুলতে থাকে। সিটিং বিছানাতেই হচ্ছে। ডলির কোমর অবধি উন্মুক্ত থাকবে। ছবিটা যেহেতু ক'দিন ধরে আঁকা চলছে, ডলিকে এখন পোজ দেখিয়ে দিতে হয় না, নিজেই নিখুঁত পজিশন নিতে পারে। অমিতেশ শুধু আলুথালু শাড়ি আর চুলটা সেট করে দেয়। ড্রেসিং টেবিল থেকে চিরুনি নিয়ে এসে অমিতেশ রোজকার মতো ডলির চুলে বসিয়ে টানতে গিয়ে চমকে উঠল। ডলির ঘাড়ের নীচে নখের আঁচড়। বেশ লম্বা, বিজবিজে রক্ত শুকিয়ে আছে। তার পাশেই কালশিটের দাগ! হাত অবশ হয়ে গিয়েছে অমিতেশের। চিরুনি চালাতে পারছে না।

"থেমে গেলে কেন?"

চিরুনি ধরা হাত ফিরিয়ে নেয় অমিতেশ। গলার কাছটা চাপ চাপ লাগছে, "তোমাকে কেউ মেরেছে।"

"সে তো প্রায়ই মার খাই! কাল মারপিটটা একটু বেশি হয়ে গেছে। দু'জন মিলে ধরেছিল তো, আটকাতে পারিনি।" ডলি কথাগুলো বলে গেল পেন্টিংয়ের পজিশন নেওয়া অবস্থাতেই। অমিতেশ ভেঙে দেয় ওর ভঙ্গি, কাঁধ ধরে নিজের দিকে ঘোরায়, "কারা?"

"তুমি তাদের মারতে যাবে নাকি?"

অমিতেশের সেরকমই একটা ইচ্ছে হচ্ছে! গরম নিঃশ্বাস পড়ছে নাক দিয়ে। কিন্তু এসব বেকার। অমিতেশ নিজেও জানে, সে কিছুই করে উঠতে পারবে না। এমনিতেই তার এখন বন্দিদশা!

"বাবা প্রায়ই ঝামেলা করে। কাল জুটেছিল সোনাদা। আমি তোমার থেকে যা টাকা পাই, পুরোটা তো দিই না বাড়িতে। তিনশো টাকা শোভামাসির কাছে জমা রেখে ঘরে ঢুকি। মাসির বরের সোনার দোকান। সুদের কারবারি। টাকা জমা রাখলে ভাল সুদ দেয়। ধার দিলে অবশ্য সুদ নেয় অনেক বেশি। তুমি না থাকলে তো আমাকে চালাতে হবে, তাই টাকাটা বাড়াচ্ছি। ওরা অবশ্য এখনও কিছু জানে না।"

ডলি প্রসঙ্গান্তরে চলে যেতে পারে বুঝে অমিতেশ জানতে চাইল, "কেন মারল ওরা?"
"ওদের বিশ্বাস হচ্ছে না, আমি মাত্র দু'শো টাকা কামাচ্ছি। সোনাদার আমার উপর খার আছে। আমাকে খাটিয়ে আর

রোজগার করতে পারছে না। কাল দু'জনে মিলে আমায় ধরল। বাবা অন্যদিন মাল খেয়ে টং হয়ে থাকে। ধাক্কা মারি, পড়ে যায়। কাল খায়নি। আমায় চেপে ধরেছিল, সোনাদা বেধড়ক কেলালো।"
একটা কান্না ধাক্কা মারছে উপরের দিকে! অমিতেশ প্রাণপণে সেটা আটকে রেখেছে। মেয়েটা দিনের পর দিন নির্যাতিত হয়েও অমিতেশের নির্দেশ মতো নানা এক্সপ্রেশন দিয়ে গিয়েছে। কখনও মোহময়, বিষণ্ণ, লাস্যময়ী...নিজের যন্ত্রণা বাইরে আসতে দেয়নি। অমিতেশের চোখ চাপা কনুইটা তুলে সরায় ডলি। চোখের কোনের জল আঙুল দিয়ে তুলে নিয়ে বলে, "আমার লাগা জায়গাটায় তুমি আদর করে দাও, এখনই ব্যথা সেরে যাবে!"
চোখ খোলে অমিতেশ। চশমাহীন ভেজা দৃষ্টিপথে রেনোয়াঁর নারীমূর্তি লাগে ডলিকে। অমিতেশের একটা হাত তুলে নিয়েছে ডলি, ঘাড়ের উপর রেখে নিজেই আদর করে নিচ্ছে। সত্যি যেন ওর আরাম হচ্ছে খুব, উপশম। চোখ বুজে ফেলেছে। ডলির শরীরে ফুটে ওঠেনি এমন অনেক ব্যথাও তো আছে, অমিতেশের হাতটা নিয়ে যাচ্ছে সেসব জায়গায়। স্পর্শে স্পর্শে শিউরে উঠছে ডলি। অমিতেশ নিজের মধ্যেও ঘুমভাঙা আগ্নেয়গিরির দুলুনি টের পায়। কখন যেন ডলি কোমরে থাকা শাড়ি সায়া থেকে নিজেকে মুক্ত করে ফেলেছে। এখন এক এক খুলে দিচ্ছে অমিতেশের পোশাক। প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও অমিতেশ ডলির শরীর থেকে নিজের দু'হাত বিচ্ছিন্ন করতে পারছে না! ডলিকে আঁকা বাগানের পেন্টিংটায় দুটো শিউলি ফুল যেভাবে স্থির হয়ে আছে পিঠে, নিতম্বের উপর, সেই ভাবেই চিত্রার্পিত দুই তালু। শরীরের মধ্যে ঘটে যাচ্ছে বিস্ফোরণ। অমিতেশ টের পায়, সে প্রবেশ করেছে ডলির শরীরে! অত্যাশ্চর্য এক নিরাময়ের সন্ধান পেয়েছে যেন ডলি। খুশিতে উথালপাথাল হচ্ছে ডলির শরীর। অসহ্য এক সুখানুভূতির চূড়ায় পৌঁছে গিয়েছে অমিতেশ, নাকি দু'জনেই? অবশেষে অগ্ন্যুৎপাত। নিঃশব্দে দুটো পাহাড় একে অপরের শরীরে এলিয়ে পড়ে।

চরাচর ঠান্ডা হতে সময় লাগে অনেকক্ষণ। অমিতেশ আগে উঠে পড়ে পোশাক গলিয়েছে। ডলির নগ্ন শরীর ঢাকল চাদরে। কেন ঢাকল, জানে না! মিলন হল বলেই কি অধিকারবোধ জন্মাল শরীরটার উপর। ওই নগ্নতা যেন অমিতেশের লজ্জা! তা হলে আর ডলিকে আঁকবে কী করে? ভয়টা আঁকড়ে ধরল অমিতেশকে। অমিতেশ আঁকড়ে ধরল নিজের দু' হাঁটু। সেখানে মাথা গুঁজে ফোঁপাতে লাগল।
গোঙানির শব্দে উঠে পড়ল ডলি। অমিতেশকে কাঁদতে দেখে প্রথমটায় খুব অবাক হয়ে গেল। ঠেলা দিয়ে জানতে চাইল, "তুমি কাঁদছ কেন?"
বেশ কয়েকবার এরকম জিজ্ঞেস করার পর অমিতেশ মুখ তুলল। নিঃসীম, শূন্য দৃষ্টি নিয়ে বলল, "তোমাকে আর আমি আঁকতে পারব না! আমার মাথা থেকে মুছে গিয়েছে তোমার ছবি। ঘেঁটে গিয়েছে আউট লাইন। তোমাকে আগের মতো আর দেখতেই পাব না।"
ডলি ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "পাবে, নিশ্চয়ই পাবে। চেষ্টা করলেই আঁকতে পারবে তুমি। কত সুন্দর আঁকো।"
অমিতেশ দু' পাশে মাথা নাড়ল।
ডলির গলায় জমা হল কান্না, "আমি কথা দিচ্ছি, আর কখনও তোমার সঙ্গে ওসব করব না। পায়ে ধরছি তোমার..."

"পারিজাত, আর খেও না," বলল কুনাল। অনুরোধ করলও বলা যেতে পারে।
ঈষৎ এলানো গলায় পারিজাত বলল, "ক' পেগ হল কুনালদা?"
"সাত পেগ তো বটেই।"
গ্লাসের শেষটুকু মেরে পারিজাত বলল, "তুমি আমি মিলে দশ পেগ। তুমি চার, আমি ছয়। "
এটা একটা ক্লাব। খুব অভিজাত নয়। তবে বেশ পুরনো। কুনাল এই ক্লাবে প্রথম এল। পারিজাত এই ক্লাবের মেম্বার। কুনালকে নিয়ে এসেছে এখানে। অনেক কথাই হল, কিন্তু কুনাল নিজের কথাটা পাড়তে পারেনি এখনও।

পারিজাত বলল, “আমি কিন্তু বেশিদিন ড্রিঙ্ক করছি না। বরং আমি মদ্যপান বিরোধী ছিলাম। বিজ়নেসে ধারে পড়ে যাওয়ার পর থেকে ড্রিঙ্ক নেওয়া শুরু করি। ধার যত বেড়েছে, লিমিটও এক্সটেন্ডেড হয়েছে।” গ্লাসে আর একটা চুমুক মেরে চাট মুখে দিল পারিজাত। ওর মুখমণ্ডল বেশ লাল দেখাচ্ছে। নেশা চড়েছে ভালই, বুঝ ত দিচ্ছে না। বলল, “লোন এমন একটা জিনিস না, সমস্ত আশা ফাশা গিলে নেয়! আজ বিকেলে যখন আমাদের বাড়িতে গেলে, বাজারে আমার কত টাকা ধার আছে, তা বলেছিলাম তোমাকে। মনে আছে, কত?”

“দেড় কোটির মতো। সরি, এগজ্যাক্ট ফিগারটা মনে পড়ছে না।”

গ্লাসের দিকে তাকিয়ে পারিজাত বল ল, “সরি হওয়ার কিছু নেই। আমার বউও মনে রাখে না, কত লোন! শুধু জানে, অ নক। তা নিয়ে ওর কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। ভে স তো যাবে না। আমাদের বছরচারেকের ছেলের সঙ্গে ও যতটা হাসি মজা করতে পারে, আমি পারি [illegible] ওর কাছে আমি একটা মাইনাস অ্যাকাউন্ট। যদি মরে যাই, ধার অবশ্য ওকে শোধ করতে হবে না। ওর দাদু, ঠাকুরদা সব সামলে দেবে। কিন্তু বাবা হিসেবে ছেলের কাছে আমার কী মূল্য থাকবে বলো? ধরো, মরলাম না! দেউলিয়া তো হয়ে যাবই, ছেলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে...”

ফিশ ফিঙ্গার কাঁটা চামচে গেঁথে মুখে তুলল পারিজাত। কুনালকে ইশারা করে নিতে বলে বলল, “ডিনার সেরে নিচ্ছি। [illegible] গিয়ে খাওয়ার অবস্থায় থাকব না। চুপচাপ ঢুকে পড়ব বছানায়। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ছেলে তো বন্ধুদের কাছে [illegible] াকে ‘বাবা’ বলে পরিচয় দিতে লজ্জা পাবে। আমি যেমন [illegible] র বাবার বলায় পেতাম! কী হল, তুমি নাও?”

[illegible] য়ছি। গোড়াতেই তো [illegible] গাদা. াবার আনালে। আজ ডিনার স্কিপ করে যাব। [illegible] য়স হচ্ছে ভাই। ড্রিঙ্কটাও নিতাম না। গাড়ি চালিয়ে [illegible] ড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে।”

[illegible] কে, [illegible] মি ড্রাইভ করব। দশ পেগেও আমি কুল থাকি,” গ্লাস এক চুমুকে শেষ করল পারিজাত।

[illegible] নাল খেই ধরানোর জন্য বলে, তুমি বাবার পরিচয় দিতে লজ্জা পেতে [illegible] কেন?

[illegible] বলতে থাকল, “বাবার [illegible] ছল। দোকানি বলে বাবার পরিচয় দিতে আমি [illegible] য লজ্জা পাই, বাবা [illegible] সটা টের পেত। বন্ধু বান্ধবদের সামনে [illegible] স্কুল কলেজের। গার্জেন [illegible] কলেজ, টিউটরের সঙ্গে। এখন আমার ছেলে যখন নিজের বাবার পরিচয় দিতে লজ্জা পাবে, আমার বাবা হাসবে!”

ক্রমশ

অলঙ্করণ: নির্মলেন্দু মন্ডল

সানন্দা শব্দভেদ

সূত্র পা শা পা শি

১ কাজের প্রয়োজনে বা তাগিদে। ৩ সুসময় ও দুঃসময়। ৭ অধঃস্তন, সহকারী। ৮ অল্প কথা বলে এমন, সংযতবাক। ১০ হেতু, নিমিত্ত। ১১ সাবধান। ১২ নানা ধর্মের বা জাতের দ্বন্দ্ব। ১৪ ভাজা যোগে মিষ্টান্ন। ১৫ ভাষান্তর। ১৭ কম বেশি। ১৯ সাল। ২০ কোনও ব্যক্তির পরিবর্তে যে স্বাক্ষর করে। ২২ সালাম। ২৩ কণ্ঠভূষণবিশেষ। ২৫ অভীষ্ট পূর্ণকারিণী। ২৬ শূন্য যোগে বেহায়া। ২৭ রাবণের মামা। ২৮ হিমালয়।

১		২			■	৩		৪	৫
	■		■	■	৬	■	■	৭	
	■	৮		৯		■	১০		
১১			■	১২		১৩		■	■
	■	■	১৪		■	১৫			১৬
১৭		১৮		■	১৯		■	■	
■	■	২০		২১		■	২২		
২৩	২৪		■	২৫				■	
২৬		■	■		■	■		■	
২৭				■	২৮				

গত সংখ্যার সমাধান

ব	র	ক	ন্দা	জ	■	দা	রা	শু	কো
ক	ব	লা	■	ল	■	মা	■	ধা	ম
ব	■	■	■	না	বা	ল	ক	■	র
ক	ম	ল	ক	লি	■	■	ম	■	ব
■	ল	■	ম	■	অ	প্র	তি	ব	ন্ধ
ক	ম	ল	ল	তা	■	বী	■	দ	■
ষ্ঠি	■	ব	■	■	ব	র	খে	লা	প
ব	■	জ	গ	জ্জ	ন	■	■	■	রে
দ	ক	■	ব	■	বা	■	তা	মা	শা
ল	ক্ষ	ণী	য়	■	স	মা	ক	ল	ন

সূত্র শব্দভেদ

১ নিজের সর্বকামনা পূরণ করার ক্ষমতা। ২ অমিল। ৪ সরোবর। ৫ ব্যঞ্জনে এটি ঠিকঠাক হওয়া দরকার। ৬ শক্তি, সামর্থ্য। ৯ নিয়মিত ক্রয় বিক্রয়ের স্থান। ১০ আর্ত, কষ্টে বা দুঃখে অভিভূত। ১৩ নীচে ফেলা। ১৪ সর্বপ্রকারে। ১৬ সমগ্র মানুষজাতি। ১৮ সোনা বা রুপোর পাত। ১৯ যুদ্ধ। ২১ বাচনভঙ্গি। ২২ এটি খেয়ে লাগা মানে বিপুল উদ্যমে কাজে নামা। ২৩ অত্যন্ত দুর্বল বা অদৃঢ়। ২৪ অবাধ্য বা দুর্দান্ত।

চিত্রপট

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

কুনাল নিজের হাফ পেগে চুমুক দেয়। অবাক হয় দেখে, এত মাল টানার পরেও পারিজাত কথার ট্র্যাক ঠিক রেখেছে! বিষয়টা ওর কাছে সত্যিই খুব সেনসেটিভ। টাকার চেয়েও সম্মান নিয়ে ভাবছে বেশি।

পারিজাত বলতে থাকল, "আমার কী অপরাধ বলো? আমি ফ্যামিলি স্টেটাসের আপলিফমেন্ট চেয়েছিলাম। সেই জন্যই এই বিজনেসটা বেছে নিই। তা ছাড়া আমার একটু সব কিছু সুন্দর করে ঘর সাজানোর ন্যাক আছে। তা-ও কেন ফেল করলাম?"

এতক্ষণে কুনাল সুযোগ পেল নিজের কথাটা বলার। গ্লাস তুলে এক চুমুক মেরে বিশেষজ্ঞের ঢঙে বলতে শুরু করল, "আসলে কী জানো, তুমি বালির উপর ইমারত গড়তে গিয়েছ। আমাদের দেশের যা অর্থনৈতিক অবস্থা, সেখানে তোমার বিজনেস সব সময় হাই রিস্ক। বায়ার কোথায়? তোমার লোন এখন যেন কত? এগজ্যাক্ট অ্যামাউন্টই বলো।"

"ওই দেড় ধরে বলে যাও।"

"আচ্ছা ধরলাম, এক চল্লিশ। তুমি যদি এর উপর আর কুড়ি লাখের বোঝা নাও, ইনভেস্ট করো সিনেমায়, আমি তোমাকে ফিফটি পার্সেন্ট অ্যাশিওর করতে পারি। আমাদের দেশে কোটি কোটি লোক। এই জনসংখ্যাটাকে আমরা অ্যাডভান্টেজ হিসেবে ব্যবহার করব। প্রফেশনটাও খারাপ নয়। আজকাল যথেষ্ট প্রেস্টিজ দেয় লোকে। ফ্ল্যাট কেনার টাকা অনেকেরই নেই। কিন্তু সিনেমা তো দেখবেই।"

পারিজাত বলল, "অর্থনীতি আমাকে বুঝিও না। তোমাকে তো বলেইছি, ওটাই আমার সাবজেক্ট ছিল। কলেজের নামটা বলা হয়নি, প্রেসিডেন্সি! রেজাল্ট ভালই ছিল, মাস্টার্স করতে করতে বিজনেসে ঢুকেছি। পরীক্ষাটা দেওয়া হয়নি। সিনেমা হচ্ছে ফাটকাবাজি। আমি এমনিতেই গেঁথে আছি কাদায়, তুমি পা দিয়ে আরও ঠেলে দিচ্ছ।"

"ছিঃ ছিঃ, সেরকম কোনও ইনটেনশন থেকে কথাটা আমি বলিনি। তা ছাড়া সিনেমার সেদিন এখন আর নেই। কত কর্পোরেট হাউজ় ইনভেস্ট করছে ইন্ডাস্ট্রিতে। অ্যাট লিস্ট এটুকু গ্যারান্টি দিতে পারি, ইনভেস্ট করা টাকা তুমি ফেরত পাবে।"

"কিছু মনে কোরো না, তুমি কত বড় ফেরেববাজ লক্ষ করেছ? এই বলছ, ফিফটি পার্সেন্ট প্রফিট দেবে। খানিক বাদে আশ্বাস দিচ্ছ, ক্যাপিটাল ফেরত আসবে। মানে, যে করেই হোক গাঁথবে আমাকে। আমি তোমার কাছে একটা মুরগি!"

অটোমেটিক্যালি ঘাড় ঝুলে যায় কুনালের। কে যে কাকে বেশি অপমান করল, বুঝে উঠতে পারে না। স্যালাড চিবোতে-চিবোতে পারিজাত বলল,

"বিজনেস ফেল করার পিছনে আমার গ[illegible] দগুলো আমি জানি। যে ক'টা প্রোজেক্ট করেছি, স[illegible]বাইকে খুশি করে করতে গিয়েছি। সে তুমি জমির মা[illegible] কই বলো, ফ্ল্যাটের কাস্টমার মায় আমার মিস্ত্রি পর্যন্ত। প্রথমদিকে কম হলেও, লাভ হয়েছে। ভুলটা করেছিলাম

বিজনকে অত গুরুত্ব না দিলেও চলবে। অপোনেন্ট হিসেবে ও তোমার কা[illegible]

সেখানেই...”

“লাস্ট ঝাড় খেলাম বেলেঘাটার প্রজেক্টে। পাক্কা পঁচাশি লাখ টাকা লস। খুব আশা ছিল, তোমাদের কানাইপুরের প্রজেক্ট থেকে লস অনেকটাই কভার করে ফেলব। সেখানে তো তোমার বন্ধু আমার

কুনালের হাত কাঁপুনি এখনও থামেনি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিজনকে মারার আইডিয়াটা পারিজাতের মাথা থেকে তাড়াতে হবে। বিজনের মেয়েটাকেও কিডন্যাপ করতে পারে বলছে! এসব করতে ওর এতটুকু বিবেক দংশন হবে না। কারণ, ধার দেড় কোটি

ছে নস্যি! আসলে মাথা ঠিক রাখতে পারছে না। চোখের সামনে দেখছে, তুমি বাড়ি ভাঙছ।

লোকেদের ইট তুলে মারতে এল।”

পারিজাত বলে চলেছে, “তুমি তখন বলছিলে না, সুযোগ আশপাশে ঘুরঘুর করে? সত্যিই করে। তাকে ধরতে জানতে হয়। দুর্গাবাড়ির জন্য আমি তোমাকে ধরেছিলাম। তুমি কিচ্ছু করতে পারনি। এখন সিনেমায় ইনভেস্ট করানোর জন্য আমার সঙ্গে লেগে আছ। এভাবে হয় না, সুযোগ কাজে লাগাতে গেলে বাঁকা রাস্তাও নিতে হয়।”

“কীরকম?”

“তোমার রাস্তা তুমি ভাল করে জানবে। আমার ক্ষেত্রে খারাপ প্রোমোটাররা যেভাবে সাফল্য পায়, তাই করতে হবে। তোমার বন্ধুকে মেরে হাসপাতালে পাঠাব অথবা ওর মেয়েটাকে কিডন্যাপ। ব্যস, রাস্তা সাফ! তোমার কাছে বন্ধু বড়, আমার কাছে দেড় কোটি। যদি বন্ধুর থেকে ফেভার তুলে নাও, হিসেব করে দেখো, বিজন ভট্টাচার্যের দাম দশ লাখও নয়!”

কুনাল জানে। ভাড়া করা খুনি ফিট করলে বিজন এক-দু’ লাখে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে! সেটা ভেবেই গলা নরম করে কুনাল বলল, “বিজনকে অত গুরুত্ব না দিলেও চলবে। অপোনেন্ট হিসেবে ও তোমার কাছে নস্যি! আসলে বেচারা মাথা ঠিক রাখতে পারছে না। চোখের সামনে দেখেছে, তুমি বাড়ি ভাঙছ, ওদিকে ঠাকুরমাকে দিয়ে সই করাতে পারছে না...অস্তিত্ব সঙ্কট হয়ে গিয়েছে বিজনের। সেদিক থেকে দেখতে গেলে, বিজন আর ও বাড়ির গরিব ভাড়াটেদের মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য নেই।”

“লেট অল অফ দেম গো টু হেল!”

পৌঁছনোর অনেক আগেই বিবেক ফসিল হয়ে যায়! তবু কুনালের মনে হচ্ছে, বিজনের জন্য এখনও একটা বাঁচার রাস্তা খোলা রেখেছে পারিজাত। ওয়ে আউটটা জেনে নিতে জিজ্ঞেস করল, “তুমি কি আমার মাধ্যমে হুমকিটা বিজনের কাছে পৌঁছে দিতে চাইছ?”

“এটাকে হুমকি হিসেবে ধোরো না। বিশ্বাস করবে কি না জানি না, আমি মন-প্রাণ দিয়ে চাইছিলাম, একটা ফাঁক বের করো তুমি। আমার এসব করতে মোটেই ভাল লাগবে না। কিন্তু আমার কাজটা অন্যায্য বলে প্রমাণ করতে পারলে না তুমি!”

পারিজাতের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কুনাল। এরকম একটা বিচিত্র ভিলেন চরিত্রকে কেউ যদি সিনেমায় ফুটিয়ে তুলতে বলে ওকে, একেবারেই পারবে না। কত রকম শেড....ভাবতে ভাবতেই একটা ফাঁক খুঁজে পেল কুনাল। বলল, “বিজনকে মেরে তো কোনও লাভ হবে না। আসল গাঁট তো হচ্ছে ওর ঠাকুরমা। সে যদি সই না দেয়, তুমি মিছিমিছি অপরাধের ভাগী হতে যাবে কেন?”

“কত দূর কী করলে বুড়ি সই দেবে, সেটা তো আমায় দেখতে হবে। বিজনকে তো মারবই, ভাড়াটেগুলো উপড়ে ফেলব দু’দিনে। বুড়ির চোখের সামনে ভিটেতে ঘুঘু না চরানো অবধি আমার শান্তি নেই! চলো, এবার যাওয়া যাক।”

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই কুনাল টের পায়, নেশা হয়েছে বেশ। মাথা টলছে। সামনের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে মনে হল, কী যেন ফেলে যাচ্ছে টেবিলে! ঘুরে তাকাল...না, সেরকম কিছুই নেই।

শুধুই উচ্ছিষ্ট।

মিনিটপাঁচেক ড্রাইভ করা হয়ে গেল, কোনও অসুবিধে হচ্ছে না কুনালের। পারিজাত হুড়মুড়িয়ে পিছনের সিটে চলে গেল। ড্রাইভ করতে-করতেও মনটা খিচখিচ করে যাচ্ছে কুনালের! মধুপর্ণার টপিকটা এবার তোলা যাক। পারিজাতের মহিলা দোষ আছে কি না, জানে না কুনাল। ভেবেছিল, মধুপর্ণার কথাটা পেড়ে দেখবে। মাত্র ওয়ান ফোর্থ পাসেন্ট ইনভেস্ট করে অত বড় হিরোইনের সঙ্গে ওঠাবসা করতে পারবে, হয়তো রাজি হয়ে যাবে প্রস্তাবে। কথাটা ক্লাবে তোলার সুযোগ হয়নি। এখন জি[illegible] দিকে চোখ রেখে, ঘাড় একটু বেঁকিয়ে কু[illegible]াল বলল, "মধুপর্ণাকে চেনো পারিজাত?"

পিছনের সিট থেকে কোনও সাড়া এল না। ঝট করে একবার ঘাড় ঘোরায় কুনাল, মাথা [illegible]হলে গিয়েছে পারিজাতের, ঘুমিয়ে পড়েছে পুরোপুরি। ঘুমোক। কিছুক্ষণের জন্য ভু[illegible] থাকুক দেড় কোটি টাকা লোনের কথা।

অন্ধকার দেখে রাস্তার ধারে গাড়ি দাঁড় ক[illegible]ায় কুনাল। আনোয়ার শাহ রোডের মোড় [illegible]ড়ে অনেকটাই এগিয়ে এসেছে। ডোর খুলে [illegible]নমে আসে বাইরে। পা এলোমেলোই পড়ছে। আশ্চর্য ব্যাপার, ড্রাইভ করতে অসুবিধে হচ্ছিল না!

পাঁচিলের ধারে দাঁড়িয়ে হালকা হল কুনা[illegible]। গাড়ির কাছে এসে দরজা খুলতে যাবে, চোখ যায় পিছনের সিটে, পারিজাত নেই। কী ব্যাপার হল, কোথায় গেল? কুনালের দেখাদেখি টয়লেট করতে নামল নাকি? একটু আগেই তো ঘুমোচ্ছিল। চারপাশে চোখ বোলায় কুনাল। তা হলে কি শুয়ে পড়ল সিটে? গাড়ির মধ্যে মাথা গলিয়ে পিছন সিটটা দেখে কুনাল, হ্যাঁ, যা ভেবেছিল তাই। উপুড় হয়ে গিয়েছে পারিজাত, বিশ্রী একটা গন্ধ লাগল নাকে। বমি করল নাকি? গাড়ির ভিতরের লাইট জ্বালায় কুনাল, নিজের বমির উপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে পারিজাত! প্রথম ধাক্কায় যেন একটা নিষ্ঠুর আনন্দ অনুভব করে কুনাল। বেশ হয়েছে, দুর্বল-গরিব মানুষ নরকে যাক, বলছিলি না? এবার নিজে পড়ে থাক নরকে...পর মুহূর্তে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে, যেভাবে পড়েছে, মাথা-ফাথায় লাগেনি তো? গাড়ি থেকে শরীর বের করে কুনাল গাড়ির পিছনের দরজা খোলে। আস্তে ডাকে, "পারিজাত! পারিজাত!"

কোনও সাড়া নেই। এবার একটু জোরে ডাকল কুনাল, হাত বাড়িয়ে ঠেলা দিতে গিয়ে ঘেন্না করল ওর, শার্টময় বমি! শুকনো জায়গা বেছে নিয়ে ঠেলল কুনাল। একটু জোরে ঠেলতেই বডিটা একটা পাট খেয়ে আটকে গেল দুটো সিটের মাঝে। এবার মুখটা দেখা যাচ্ছে, উলটে আছে চোখ, ঠোঁটের কষ বেয়ে বমি বা গ্যাঁজলা। পরিষ্কার মরে গিয়েছে! ধড়াস-ধড়াস করে ওর বুক! কী করবে এবার কুনাল? ভিতরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে কুনাল গাড়ি থেকে শরীরটা বের করল। রাস্তায় বাঁয়ে-ডাইনে তাকায়, হুস-হুস করে বেরিয়ে যাচ্ছে গাড়ি। কুনালের গাড়ি গন্ডগোল করেছে ভেবে, উপকারী কোনও চালক পাশে গাড়ি দাঁড় করাতেই পারে। জিজ্ঞেস করবে, কী হয়েছে? আরোহী মরে গিয়েছে বুঝলেই, থানায় যেতে বলবে। পুলিশকে গিয়ে কী বলবে কুনাল? নিজে থেকেই মরে গিয়েছে পারিজাত, নাকি কুনাল মেরেছে? বিষ মিশিয়ে দিয়েছে মদে অথবা মদ খাইয়ে বেহেড করে এমনভাবে ধাক্কা মেরেছে, মরে গিয়েছে মানুষটা। কোল্ড ব্লাডেড মার্ডার। কুনাল ছাড়া এই ঘটনার কোনও সাক্ষী নেই!

কুনাল টের পেল, কুলকুলিয়ে ঘামছে সে! বাঁদিকে একবার তাকাতেই বুক ফাঁকা হয়ে গেল। দূরে গুমটি দোকান থেকে সিগারেট হাতে বেরিয়ে আসছে ট্রাফিক পুলিশ। কুনালকে চিনে রাখবে সে। পিছনের দরজা বন্ধ করে ড্রাইভার সিটে চলে আসে কুনাল। স্টার্ট দেয় গাড়ি, ডেডবডি নিয়ে সে এখন যাবে কোথায়? এর চেয়ে যদি ক্লাবের সিঁড়িতে ধাক্কা মেরে দিত পারিজাতকে, এ[illegible] বলে, অ্যাক্সিলেটরে বেশি চাপও মারতে পারছে না। গলা শু[illegible]য়ে কাঠ হয়ে আসছে! পিছনে লাশ নিয়ে কত রাত অবধি গাড়ি চালাবে কুনাল? তেলও তো খুব বেশি নেই। ফোন বাজছে পকেটে। এই সময় আবার ফোন! রিসিভ করাটা কি ঠিক হবে? পুলিশের আওতায় এখন পড়ে আছে কুনাল। এই সময় যা করবে, পরে সবই প্রমাণ হিসেবে দাখিল হবে। ফোনটা কার দেখার জন্যে এক হাতে পকেট থেকে বের করে, বিজনের নাম। ধড়ে প্রাণ আসে যে[illegible] কুনালের, সুইচ টিপে ফোনটা কানে নিল, "বল?"

"একটা বিরাট ব্যাপার হয়ে গিয়েছে," বলল বিজন।

বুকটা ফের ধড়াস করে উঠল কুনালের [illegible]তারপরই মনে হল, ভয় পাচ্ছি কেন? বিজনের তো এই ঘটনাটা [illegible]ানার কথা নয়। যতটা সম্ভব নিজেকে সংযত করে শান্ত গলায় কুনাল জানতে চাইল, "কী ব্যাপার?"

"অমিতেশকে পাওয়া গিয়েছে। তবে খুব বিশ্রী অবস্থায়।"

কোনও কৌতূহল হল না কুনালের, "ওসব শুনব পরে। আমি এখন পড়েছি বিপদে।"

"কী বিপদ?" ওপারে বিজনের গলায় উৎকণ্ঠা।

প্রথম ধাক্কায় যেন একটা নিষ্ঠুর আনন্দ অনুভব করে কুনাল। বেশ হয়েছে, দুর্বল-গরিব মানুষ নরকে

"পিছনের সিটে একজনকে বসিয়ে ড্রাইভ করছিলাম, মালটা টেঁসে গিয়েছে! এখন যে কী করি, বুঝতে পারছি না। পুলিশ কেস হয়ে যাবে তো?"

"ছেলে না মেয়ে, কাকে বসিয়েছিলি পিছনে?"

আসল পরিচয়টা এই মুহূর্তে বিজনকেও জানাতে ইচ্ছে করছে না। বিষয়টা যতটা অজানা থাকে, ততই মঙ্গল, "ছেলে-মেয়ে এখন ম্যাটার করে না। এখন তুই বল, মালটাকে নিয়ে কী করি? বাইপাসের ধারে গিয়ে ফেলে দেব?"

ওপ্রান্ত থেকে ভেসে এল বিজনের সতর্ক গলা, "তোদের দু'জনকে একসঙ্গে থাকতে লোকজন দেখেছে?"

পা বেয়ে ঠান্ডা উঠে এল কুনালের! বিজনকে কিছু বলল না। পারিজাতের সঙ্গে তাকে আজ অনেকেই দেখেছে। এমনকী পারিজাতের বাড়ির লোকও...

ফোনের ওপাশ থেকে বিজন ফের বলল, "কী রে, চুপ করে গেলি কেন! দেখেছে লোকে?"

গলাটা ভেঙে গিয়েছে কুনালের, "অনেকে দেখেছে। প্রচুর প্রমাণ। বিশাল ফাঁসা ফাঁসলাম রে! কেউ বাঁচাতে পারবে না!"

কুনালকে এতটা ভেঙে পড়তে দেখে, একটু বুঝি সন্দেহ হল বিজনের। বলল, "মরে গিয়েছে, তুই কীভাবে বুঝলি?"

"দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, ঠেলা দিলাম, গড়িয়ে গেল।"

"পাল্‌স দেখেছিস? নাকের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করেছিস, নিঃশ্বাস পড়ছে কি না?"

বিজনের কথা শুনে পায়ে সাড় ফিরে এল কুনালের। সজোরে ব্রেকে চাপ দিল সে। আর তাতেই ফোনটা ছিটকে যায় হাত থেকে!

ফোনটা কানে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল বিজন। ওপ্রান্ত থেকে কুনালের আর সাড়া পাওয়া গেল না। ব্রেক চাপার আওয়াজ এল, আরও নানা শব্দ...বিজন যে ফোনের এপারে আছে, মালটার হুঁশ নেই। নির্ঘাত প্রচুর টেনেছে। ফোন অফ করে পকেটে রাখে

ক যাক, বলছিলি না? এবার নিজে পড়ে থাক নরকে.....পর মুহূর্তে সে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

বিজন। দাঁড়িয়ে আছে দিল্লি রোডের ধারে। রাত হল অনেক, বাস পাবে কি না, কে জানে! এখন মনে হচ্ছে, সাইকেল নিয়ে এলেই হত। বছর চার-পাঁচ আগেও পনেরো, বিশ কিলোমিটার সাইকেলে মেরে দিত অনায়াসে। এখন হাঁফ ধরে! বয়স তো হয়েছে। প্রেশার-ফেশার হল কি না, এখনও চেক করা হয়নি। অনেকক্ষণ হল বাসের দেখা নেই। পরের পর লরি যাচ্ছে। কুনালটা বখে গিয়েছে একেবারে। কলকাতা ওকে নষ্ট করে দিল। মাল খেয়ে গাড়ি চালাচ্ছে, নেশার চোটে ভুগছে নানা কল্প আতঙ্কে! না আছে বাড়ির প্রতি কমিটমেন্ট, না বন্ধুদের প্রতি। এই মুহূর্তে অমিতেশকে নিয়ে বিরাট একটা সমস্যায় পড়েছে বিজন। ব্যাপারটা এমন, কুনাল ছাড়া কারও সঙ্গে পরামর্শ করা যাবে না। প্রায় এক মাসেরও বেশি সময় নিয়ে বিজন নিজের চেষ্টায় খুঁজে বের করেছে অমিতেশের ঠিকানা। নিরুদ্দেশ হওয়ার পর দিনদশেক অবধি ওর বাড়ির লোক খুব চিন্তায় ছিল। গোয়েন্দা অবশ্য লাগাতে হয়নি, তার আগেই অমিতেশ ফোনে যোগাযোগ করে বলেছিল, সে এখন আঁকায় ব্যস্ত আছে। খোঁজ করে তাকে যেন বিরক্ত করা না হয়। কাজ শেষ হলেই সে ফিরে আসবে।

এর পর এক নয়, একাধিকবার অমিতেশ ফোন করেছে নন্দা এবং বাবা-মাকে। বিজনকে একবারও নয়। অভিমান হয়েছে বিজনের। বহুবার অমিতেশকে ফোনে ধরার চেষ্টা করেছে, পায়নি। বাড়ির লোকও পায় না। ফোন অফ করে রাখে অমিতেশ। পারিপার্শ্বিক নানা ঝামেলায় জর্জরিত হয়েও, বিজনের মন থেকে বন্ধুর প্রতি অভিমানটা যায়নি। ঝামেলা হাজারটা। দুর্গাবাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া ভাড়াটেরা দেখা করতে আসছে প্রায় রোজই। তাদের নাকি প্রোমোটার যত টাকা দেবে বলেছিল, দেয়নি। কিছুটা দিয়ে ঘোরাচ্ছে। তারা এখন কী করবে? ঠাকুরমা বলছে, আবার ঢুকে পড়ো বাড়িতে। কিন্তু সেটা থেকে যাওয়া ভাড়াটেরা মেনে নিতে রাজি হচ্ছে না। বলছে, কিছু টাকা তো খেয়েছে, আমাদের সঙ্গে থাকেনি। ঢুকতে দেব না। আর একজনকে নিয়েও বিজন পড়েছে বেশ মুশকিলে, বাপি। তার জীবনকাহিনি শুনে বিজন আর ফেরাতে পারেনি, কাজে নিয়েছে। বাপির খোঁজে যখন-তখন পুলিশ আসছে, দুর্গাবাড়িতে। বাপি এখন বাতাস শুঁকে পুলিশের গন্ধ পায়, পালিয়ে যায় ঠিক। বিজনকে ফেস করতে হয় পুলিশের জেরা। কেন সে বাপিকে লুকিয়ে রেখেছে? বিজন সোজা জানিয়ে দেয়, বাপি নামে সে কাউকে চেনে না। লুকিয়ে রাখার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। বারংবার একই ঘটনা ঘটছে।

বাপিকে মনে-মনে সমর্থন করে বিজন। কিছুটা শ্রদ্ধাও। ব্যাটা লড়ে যাচ্ছে। হার মানেনি বউয়ের কাছে। দম আছে বলতে হবে। এদিকে বিজন কৃষ্ণার এগেনস্টে কিছুই করতে পারল না। বুলান জানিয়ে দিয়েছিল, মা-বাবার রিলেশন দেখেই সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বিয়ে করবে না, প্রেমও না। সায়নের সঙ্গে তার শুধুই বন্ধুত্ব। মেয়ের এই মনোভাব দেখে ভয় পেয়েছিল কৃষ্ণা। বিজনকে ওবাড়ি থেকে প্রায় তুলেই নিয়ে এসেছিল। বলেছিল, "মেয়ের মুখ চেয়ে আমাদের মিলেমিশে থাকতে হবে।" মানে, ভাল সম্পর্কের অ্যাক্টিং। কৃষ্ণার ফোনে এখনও সেই ভদ্রলোকের এসএমএস আসে। তবে সেগুলো আর আগের মতো রোম্যান্টিক নয়। লুকিয়ে কৃষ্ণার মেসেজ বক্স ঘেঁটেছে বিজন। সে এখন লেখে, "বোন এসেছে, পাঁচ হাজার চাইছে। মাইক্রোওভেন কিনবে, দেব?" অথবা "মায়ের রিপোর্টে কিছু পাওয়া যায়নি। তোমাকে দেখতে চাইছে। কী বলব?"

কৃষ্ণার প্রেমের এরকম সাদামাঠা পরিণতি দেখে খারাপও লাগে বিজনের। বেচারা। না পারল বরকে

ভালবাসতে, নতুন প্রেমিকের কাছ

থেকেও পেল না কিছুই। কৃষ্ণা একটা কাজ কিন্তু করিয়ে নিয়েছে বিজনকে দিয়ে! সায়নকে বসিয়ে বিজনকে বলতে হয়েছে, তার গোলমেলে জন্মবৃত্তান্ত। যেন জামার আড়ালে থাকা শ্বেতির দাগ দেখাচ্ছে! কৃষ্ণার আন্দাজমতো সায়ন এসব একেবারেই পাত্তা দেয়নি। তবে একথাও বলেছে, "এসব এখনই আমি বাড়িতে জানাচ্ছি না। বিয়ের যখন সময় আসবে, জানাব। বাড়িতে যদি কোনও আপত্তি তোলে, আলাদা থাকব আমরা।" বিজন বলেছিল, "আমার খুবই খারাপ লাগবে সেটা। বাবা-মায়ের সঙ্গে তোমার বিচ্ছেদের কারণ হয়ে থাকব আমি। এ ছাড়াও পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হতে পার। তোমাদের আর্থিক সঙ্গতির পরিপ্রেক্ষিতে তা মোটেই হেলাফেলা করার নয়।" সায়ন কথাটার কোনও গুরুত্ব না দিয়ে বলেছে, "আপনার মেয়ে ওসবের চেয়ে আমার কাছে অনেক বড়। শ্রীতমার মতো গভীর মনের মেয়ের কোম্পানি পাওয়া..."

বন্ধুদের সঙ্গে এসব কথা শেয়ার করতে ইচ্ছে করে। বলবে, দেখ, তেমন কিছু না করে উঠতে পারলেও, বাপের মর্যাদাটা তো পাচ্ছি। কৃষ্ণা তো মেয়েটাকে অ্যাবর্ট করে দিতে চেয়েছিল। অত বড় ঘরের ছেলে সায়ন আমার মেয়ের জন্য পাগল...কাকে বলবে এসব কথা? একজন বিদেশে, এক বন্ধু নিরুদ্দেশ, অন্যজন পাক্কা দালাল হয়ে গিয়েছে! দুর্গাবাড়ি নিয়ে যা ঝড়ঝাপটা যাচ্ছে, কুনালের সঙ্গে আলোচনা করে কোনও সুপরামর্শ পাওয়া যাবে না। ওর গলায় এখন প্রোমোটারেরই সুর! নিজের আখের গোছাতেই ব্যস্ত। অমিতেশের সঙ্গে এসব জাগতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে লাভ হবে না। ও ভাবের জগতের মানুষ। তবু শুনিয়ে খানিকটা হালকা হওয়া যেত। বিজনকে আসলে সেভাবে গোনেই না বন্ধুরা। তার কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। সে শিল্পী নয়, মেধাবী নয়, নির্বিরোধী, অনুগত সঙ্গী। বন্ধুরা তাকে চিরকালই এলেবেলে মনে করে এসেছে। দরকার ছাড়া বিজনের খোঁজ নেয় না। এই অভিমান আর তার সঙ্গে বেশ খানিকটা উৎকণ্ঠাসহ অমিতেশের খোঁজ করে গিয়েছে বিজন। অমিতেশের ফোন পেয়েই বাড়ির লোক নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ওর কেন যেন মনে হচ্ছিল, ফোনে অমিতেশ যতটা নিশ্চয়তার আশ্বাস বাড়ির লোকেদের দিয়েছে, ততটা নিরাপদ ও নেই। তাই নিজে বিভিন্ন ঝামেলার মধ্যে থেকেও বিজন খোঁজ চালিয়ে গিয়েছে অমিতেশের। অমিতেশকে কোথাও পাওয়া গেল না।

গত দু'দিন ধরে বিজন সমানে ভেবে গিয়েছে, কোথায় যেতে পারে অমিতেশ? অতঃপর আজ সকালে প্রায় গোয়েন্দাদের দক্ষতায় বিজন খুঁজে পায় সম্ভাব্য সেই জায়গাটা, যেখানে গেলে সন্ধান পাওয়া যেতে পারে অমিতেশের। পাওয়া গেল। লুক আউট রেস্তরাঁয় এসে। সূত্রটা ছিল খুকুর বয়ানে। অমিতেশের নিরুদ্দেশের খবর শুনে বিজন যখন গিয়েছিল ওদের বাড়ি, খুকু বলেছিল, "ক'দিন আগে বেহেড হয়ে বাড়ি ঢুকছিল। পরে একদম স্বাভাবিক হয়ে যায়। তারপরই বাড়ি ছাড়ে।" স্বাভাবিকভাবেই প্রথমে বেহেড হয়ে বাড়ি ফেরাটাকে গুরুত্ব দেয়নি বিজন। আজ সকালে মাথায় এল, মাতালরা চেনা জায়গা ছাড়া মন খুলে মদ খায় না! অমিতেশ যখন মাত্রাতিরিক্ত খেয়ে বাড়ি ঢুকেছে, নিশ্চয়ই গিয়েছিল লুক আউটে। এখানে এখন ওর চেনা জায়গা বলতে ওটাই। নস্ট্যালজিয়াও টানবে। লুক আউটে গিয়ে রামকিশোরদার ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে, মদ খাওয়ার সময়কার কিছু বিবরণ। অমিতেশের সঙ্গী কেউ ছিল কি না, রামকিশোরদার ছেলের সঙ্গে কী-কী কথা হয়েছে? এমনও হতে পারে, অমিতেশ হয়তো এখনও ডদয় হচ্ছে ওখানে!

সন্ধের মুখে বিজন পৌঁছে গিয়েছিল লুক আউটে। রামকিশোরদার ছেলে তাকে চিনলেও, অমিতেশকে না মনে করতে পারার ভান করছিল। বিজন রেস্তরাঁয় লাগানো উডকাটটার কথা মনে করাল। বলল, "ওটা যে বানিয়েছে, তার কথা বলছি।" তাও চিনতে চাইল না। বিজনকে তখন বাধ্য হয়ে বলতে হল, "আসলে আমার বন্ধুর বাবা খুবই অসুস্থ। হসপিটালাইজ়ড। বাঁচবেন বলে মনে হচ্ছে না। বন্ধু একমাত্র ছেলে। এ সময় বাবার কাছে থাকার খবই দরকার ওর।" অভিনয়টা মন্দ হয়নি। রামকিশোরদার ছেলে যেন অনেক কষ্টে মনে করতে পেরেছে, এভাবে বলল, "টল, খুব ফর্সা, চোখে হাই পাওয়ারের চশমা?" তড়িঘড়ি মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলেছিল বিজন। রামকিশোরদার ছেলে বলল, "দাঁড়ান। মনে হচ্ছে, উনি একদিন এসেছিলেন। যে ওয়েটার ওকে সার্ভ করেছিল, তার সঙ্গে কথা বলে দেখি।" ভিতরে চলে গিয়েছিল রামকিশোরদার ছেলে। ফিরে এল একটা ছেলেকে নিয়ে। বলল, "এর সঙ্গে যান।" ছেলেটির সঙ্গে বেশ খানিকক্ষণ হেঁটে বিজন পৌঁছেছিল সদ্য তৈরি হওয়া একটা বিল্ডিংয়ের সামনে। সিঁড়ি ভেঙে চারতলায় উঠল। সুনসান বাড়ি। ডোর বেল টিপে দাঁড়িয়ে রইল ছেলেটা।

কিছুক্ষণ পর দরজা খুলল অমিতেশ। বলল, "আয়।"

পথপ্রদর্শক ফিরে গেল। দরজা বন্ধ করল অমিতেশ। ওর চেহারা দেখে ততক্ষণে চমকে গিয়েছে বিজন, রোগা হয়ে গিয়েছে খুব! সামান্য কোলকুঁজোও লাগছে। বিজনকে বিছানায় বসতে ইশারা করে অমিতেশ নিজে বসল টুলে। ঘরে পাঁচটা ইজেল, ছ'টা ক্যানভাস। একটা বাদে সব ক'টাই সাদা কাপড়ে ঢাকা। যেটায় ঢাকা নেই, তার কাজ চলছে। মনে-মনে খানিক আশ্বস্ত হয়েছিল বিজন, যাক, কাজ তা হলে করেছে।

অমিতেশ জিজ্ঞেস করেছিল, "হ্যাঁ রে, কী হয়েছে রে বাবার? সত্যিই হাসপাতালে আছে?"

প্রশ্নটা শুনেই বিজন বুঝে গিয়েছিল রামকিশোরদার ছেলের সঙ্গে অমিতেশের আঁতাত কতটা সুদৃঢ়। ওয়েটারের কাছে খোঁজ নেওয়ার বদলে ভিতরে গিয়ে ফোনে কথা বলেছে অমিতেশের সঙ্গে। অনুমতি পাওয়ার পরই ছেলে দিয়ে পাঠিয়েছে বাড়িটায়।

অমিতেশের প্রশ্নের উত্তর দিতে একটু সময় নিল বিজন। বলেছিল, "মেসোমশাই সুস্থই আছেন।"

"বুঝতেই পেরেছিলাম, মিথ্যে। খুবই পুরনো ছক। ইন্দ্রও বুঝেছে, কিন্তু এমনই সেন্টিমেন্টাল ইসু, আমাকে না জিজ্ঞেস করে, তোকে ফেরাতে পারেনি।"

"তুই ফিরিয়ে দিতে পারতিস?" অভিমান মেশানো গলায় বলেছিল বিজন।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে অমিতেশ বলল, "পারতাম। কিন্তু আমার মনে হল, তোকে কয়েকটা কথা বলে রাখা দরকার।"

বিজন শুনে যাচ্ছিল। কোনও প্রশ্ন করেনি।

ছোট পজ় নিয়ে অমিতেশ বলল, "এরপর থেকে তুই কোনওদিন আমার খোঁজ নিবি না। সে আমার বাবা-মা-ই বলুক কিংবা অন্য কেউ। এখানে আর আসবিও না!"

আহত হয়েছিল বিজন। আলগোছে প্রশ্ন করেছিল, "কেন, জানতে পারি কি?"

"নিশ্চয়ই পারিস। সেই জন্যই তো ডেকে পাঠালাম," একটু থেমে থেকে অমিতেশ বলে, "আমি আমার সোসাইটি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাইছি, যার মধ্যে আমার ফ্যামিলিও পড়ে।"

A Premium quality range in soft feel cotton fabric which provides you an incredible fit. Conforms to your every curve easily and ensures luxurious freedom of movement. Is designed superble with finest lace.

Distributor : SHREE KRISHNA ENTERPRISES. Burrabazar,Kolkata -700 007 (W.B) PH.NO-033-22708853.

Mfd. & Mktd. By: **Bodycare Creation Pvt. Ltd.** •D-30, Sector-63, Noida-201301(India) •Tel.: 0120-4686400 (30 Lines)

Fax: 91-1204686401 •Consumer Care No.: 0120-4278669 •E-mail: bodycare@bodycarecreations.com • www.bodycarecreations.com

For Trade enquiry: Please contact : Mr. Hemant Jaiswal (GM Marketing) Ph.: 09654421468

"কেন?" জানতে চেয়েছিল বিজন।

অমিতেশ বলল, "যে আপার মিডল ক্লাস সমাজে আমরা বাস করি, তার লাইফ স্টাইল আমাকে বন্ধ্যা করেছে। যখনই বিচ্ছিন্ন হলাম, দেখ কতটা কাজ হয়ে গিয়েছে!"
অমিতেশের যুক্তি শুনে কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না বিজন। সব চেয়ে সহজ প্রশ্নটাই করল, "তোর যদি বউ-বাচ্চার জন্য ম খারাপ করে, তখন কী করবি?"
"যখন করবে, তখন ভাবব," নির্বিকার মুখে বলেছিল অমিতেশ।
সরল কৌতূহলে বিজন জানতে চাইল, "আমাদের সমাজে গন্ডগোলটা কোথা া, যার জন্য তোর এখানে থাকতে ইচ্ছে রছে না?"
"থাকা যায়। ক্রিয়েটিভ কাজ করা যায় া। এত হিপোক্রিসি চারপাশে, তাল মেলাতে গিয়ে আঁকার ফোকাসটাই নড়ে যায়," বলল অমিতেশ।
"কী ধরনের হিপোক্রিসির কথা বলছি , একটা উদাহরণ দে।"
বিজনের অনুরোধে অমিতেশ বলতে থাকল, "নিজেকে দিয়েই শুরু করি। বাড়ি ছেড়ে দিল্লি গিয়েছিলাম আঁকার বৃহত্তর জগতে জায়গা করে নিতে। পারিনি। ফিরে আসিনি বাড়িতেও। আমার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হল বাবা, মা, বোন। গর্বিত হওয়ার মতোও কিছু পেল না। আমার অবশ্য এখানে স্বচ্ছন্দেই কেটে যাচ্ছে জীবন। উদ্বৃত্ত হলে, তবেই টাকা পাঠাই বাড়িতে। এবার নন্দার কথা বলি, ও ছবি আঁকে, কাস্টমার টার্গেট করে। মুম্বইয়ের এগজিবিশনে পাঠায় গণেশসংক্রান্ত ছবি। মায়ের কোলে পিঠে খেলছে গণেশ অথবা বিশাল পাথরের গণেশ বুদ্ধদেবে মতো বসা অবস্থায়। দিল্লির এগজিবিশনে দেয় মাইথোলজির উপর ছবি, আর কলকাতায় নগর জীবনের সঙ্কট। একটু অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ব্যাপার মিশিয়ে দেয়। ওর ছবি বিক্রি হবেই। অথচ শিল্পীর স্বাধীনতা নিয়ে বক্তৃতা দিতে দাও কোনও সেমিনারে, এক ঘণ্টার নীচে থামবে না।" কথা বলতে বলতে াফাচ্ছিল অমিতেশ, "এই যে তুই, ত মিথ্যের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে তোদের দাম্পত্য! কৃষ্ণা প্রেম করছে অন্য কারও সঙ্গে, তুইও পুরনো বাড়িতে একজনকে ফিট করে রেখেছিস। ওদিকে সমাজে থাকছিস স্বামী-স্ত্রীর পরিচয় নিয়ে! ব্যাঙ্কে নিশ্চয়ই তোদের জয়েন্ট ত্যাকাউন্টও আছে!"
এই অংশে অবশ্য অমিতেশের দুটো ভুল ছিল। এক, কৃষ্ণার সঙ্গে বিজনের কোনও জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট নেই। দুই, শিউলিকে সে জোটায়নি, অদ্ভুত বিভ্রমে শিউলি নিজেই জুটেছিল। এখন সেসব এপিসোড অতীত। তবে ভুলগুলো শুধরে দেয়নি বিজন। পাছে প্রসঙ্গ ঘুরে যায়। সিগারেট ধরিয়ে অমিতেশ বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, "খুকু কুনালের প্রেমে পড়েছিল।"
ক্রমশ
অলঙ্করণ: নির্মলেন্দু মন্ডল

সানন্দা শব্দভেদ

সূত্র পা শা পা শি

১ মধ্যম পাণ্ডব। ৪ খোঁজ। ৭ যুদ্ধের দামামা। ৮ অপরকে কর দেয় এমন। ১০ 'অমৃতবারি ---- কর...।' ১১ দক্ষ লেখক। ১৩ অপরাধের দণ্ড। ১৪ অশুভ নক্ষত্র। ১৬ অন্তঃকরণ। ১৭ প্রকাশ্য ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান। ১৮ সব সময়। ২০ গর্ব-র কোমল রূপ। ২১ নিমেষ। ২৩ ব্যবসায় বা পেশা। ২৫ বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তায় অভ্যস্ত। ২৬ ক্লান্তি দূর হয়েছে এমন।

১		২	৩		৪		৫		৬
		৭							
৮	৯						১০		
			১১			১২			
১৩								১৪	১৫
১৬								১৭	
		১৮		১৯					
২০							২১		২২
				২৩		২৪			
২৫						২৬			

গত সংখ্যার সমাধান

কা	র্য	গ	তি	কে		কা	লা	কা	ল
ম		র			তা			সা	ব
ব		মি	ত	বা	ক		কা	র	ণ
সা	মা	ল		জা	ত	পা	ত		
য়ি			স	র		ত	র	জ	মা
তা	র	ত	ম্য		স	ন			ন
		ব	ক	ল	ম		আ	দা	ব
প	দ	ক		ব	র	প্র	দা		স
ল	জ্জা			জ			জ		মা
কা	ল	নে	মি		অ	চ	ল	রা	জ

সূত্র

১ বেগুন বা বেগুনগাছ। ২ সমবেদনা। ৩ যুদ্ধ। ৪ শত্রুকে দমন করে এমন। ৫ পদ্ম। ৬ নিয়ে যাওয়া। ৯ রোজা পালনের মাস। ১১ মধুর ধ্বনি। ১২ খেলায় বা প্রতিযোগিতায় জয়। ১৩ চতুর্বেদের অন্যতম। ১৪ শিবের রুদ্ররূপ। ১৫ ত্রুটি, অপরাধ। ১৮ প্রশংসনীয় কর্ম। ১৯ এক বৎসর। ২০ উত্তাপ বা উষ্ণতা। ২১ ভাঁজ, স্তর। ২২ দিব্যি। ২৪ বশ, শাসন।

চিত্রপট

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

অমিতেশ আরও বলল, "কুনাল খুকুকে আশকারা দেয়। তারপর সরে যায়। তুই আর অর্ক সম্ভবত সেটা জানতিস, আমাকে বলিসনি। কুনাল আর কখনওই খুকুর সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। খুকু চিররুগ্না, বিয়ের অযোগ্য, সব কিছুই কুনাল জানত। তবু কেন খেলতে গেল? যত বয়স হচ্ছে, একা হয়ে যাচ্ছে মেয়েটা। করুণা করেও তো কুনাল একটু খোঁজ নিতে পারে?" বড় করে শ্বাস নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল অমিতেশ। বিজনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "এই তো আমাদের সোসাইটি। এখানে কী পেতে পারি আমি? কেন কাটাব চিরকাল? জীবন তো একটাই।"

অমিতেশের চোখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছিল বিজন। ভুল তো কিছু বলছে না অমিতেশ। উপলব্ধিটাও নতুন নয়। মানুষ সব বুঝেও একই বৃত্তে পাক খায়। নিরন্তর নিজের জীবনটা মূল্যবান, মহৎ ভাবার চেষ্টা করে। যা আসলে গোটাটাই হিপোক্রিসিতে ভর্তি। অমিতেশের কথাগুলোর পর ঘরের হাওয়া বড্ড ভারী ঠেকছিল, সেখান থেকে বেরতে চেয়ে বিজন বলল, "তা এতদিন বিচ্ছিন্ন থেকে তুই কী আঁকলি, সেটা দেখাবি না?"

মিতেশ এগিয়ে গিয়েছিল ক্যানভাসগুলোর কাছে। বিগুলোর বিষয় বোঝার আগেই ভীষণ একটা ঝাঁকুনি খায় বিজন, বক'টা •বিতে একই মেয়ে। নগ্নতার এক অপরূপ বিন্যাস! খানিকক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে বিজন বলল, "একটাই মেয়ে কেন?"

"ওকে ভাল লাগে আঁকতে, তাই।"

"তুই কি ওকে সঙ্গে নিয়ে সমাজচ্যুত হবি?"

"আপাতত। আমি এখন ভবিষ্যতের জন্য প্ল্যান করা ছেড়ে দিয়েছি। প্ল্যান মানেই তো নিজেকে শিকল পরানো!"

কথাবার্তা এই পর্যায়ে আসার পর বিপদকে সামনে থেকে দেখতে পেয়েছিল বিজন! জিজ্ঞেস করেছিল, "তুই মেয়েটাকে ভাল করে চিনিস? কতটুকু জানিস ওর সম্বন্ধে?"

"খুব কম। ও ও আমাকে ভাল করে চেনে না। ওর মধ্যে একটা অদ্ভুত সারল্য আছে। গরমের ছুটি পড়ে যাওয়া স্কুলবাড়ির মতো। ব্ল্যাকবোর্ডে মুছতে ভুলে যাওয়া দু' একটা অক্ষর গোটা মাস জুড়ে ও ভাবেই থাকবে। বাতাসে থেকে যাওয়া স্টুডেন্টদের কলকাকলি, ঘণ্টার আওয়াজ, টিফিনের গন্ধ..."

আরও অনেক কিছু বলছিল অমিতেশ। মনে হচ্ছিল, খাদের ধারে দাঁড়িয়ে প্রলাপ বকছে। বিজনের কিছু করার নেই, খাদের পাশে যাওয়ার আগে বিজনকে ল করে যুক্তির দড়ি দিয়ে বেঁধে গিয়েছে অমিতেশ। াঁচানোর আর কোনও সুযোগ আছে কি না, দেখার ুই এখানে কতদিন বি?"

লি কথাটা মনে করিয়ে। শোন, তোকে , এখানকার ঠিকানা

এখানে ঢোকার আগেই কেস হিস্ট্রি এসে যায় আমার হাতে। তোর মা, দিদি

কাউকে দিবি না। ওই ছবিটা কমপ্লিট করেই এখান থেকে পাততাড়ি গোটাব,” অসম্পূর্ণ ছবিটার দিকে হাত তুলেছিল অমিতেশ। নৌকার ছবি, দরজা দিয়ে নদী বা সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। “এখান থেকে চলে যাবি কেন? জায়গাটা তো ভালই।”

কুনালকে। কিন্তু এমনই মতাল হয়ে আছে সে, গাড়িতে থাকা মানুষটা বেঁচে আছে কি না, তা ভাল করে পরীক্ষা না করেই ধরে নিয়ে বলছে, ‘মড়া নিয়ে ঘুরছি!’ বাস এখনও এল না। হাঁটতে হবে নাকি? কুনাল এখনও জানাল না, লোকটা সত্যিই মরে গিয়েছে,

র বেল হয়ে গিয়েছে। পাড়ায় তোর রেপুটেশন কীরকম, সেই রিপোর্টও আছে আমার কাছে।

“না রে, এখানে থাকা মোটেই সেফ নয়। ইন্দ্র আমাকে এত খাতির যত্ন করে রেখেছে ছবিগুলো হাতিয়ে নেবে বলে! কেড়ে নেবে। তেমন বুঝলে, তোকে ফোন করে নেব আমি। ছবিগুলো পাচার করব তোর হাত দিয়ে।”

অমিতেশকে বলার মতো কোনও কথা মাথায় আসছিল না বিজনের। তখনই ঠিক করে, ঘর থেকে বেরিয়েই কুনালকে ফোন করবে। আর একবার ছবিগুলোর দিকে তাকিয়েছিল বিজন, কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছিল ওই নগ্নতায়। প্রথমবার হয়নি। কারণ, তখন তো জানত না, মেয়েটি তার বন্ধুর প্রেমিকা! অমিতেশের ডেরা থেকে বেরিয়ে দিল্লি রোডের দিকে আসতে আসতে ফোন করল

না বেঁচে আছে। বিজন জানে, বেঁচেই আছে। তবু পকেট থেকে ফোন করে কুনালকে ধরার চেষ্টা করল। বেজে গেল ফোন। ধরল না কুনাল। কাছাকাছি বাসের শব্দ পেল বিজন। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, বাস এসে গিয়েছে।

জেল মোটেই খুব একটা খারাপ জায়গা নয়। মানুষ ফালতু ভয় পায়! বাপিও পেত। মা দিদি জামিন পেয়ে বেরনোর পর বলেছে, “খুব একটা অসুবিধে হবে না। সবার সঙ্গে একটু মানিয়ে চলবি, গল্পগাছা করবি, জেলে আছিস বলে মনেই হবে না!” অতটা অবশ্য আপন হয়ে যায়নি জায়গাটা, ঘুমটুকু ছাড়া বাপির এক

মিনিটের জন্যও মনে হয় না, সে জেলের বাইরে আছে। মা দিদি একসঙ্গে ছিল, গল্প করে কেটে যেত। বাপি এখানে একা। কয়েদিদের সকলের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। কিছু বেরিয়ে যাচ্ছে, ঢুকছে নতুন। চেনাজানা যা কিছু হচ্ছে, এই পাঁচিল ঘেরা এলাকায়।

পাঁচিলের বাইরে আলাপ হওয়া কোনও লোকের সঙ্গে এখন অবধি দেখা হয়নি। হলে বাপি তার বাইরের জীবনের একজন সাক্ষী পেত, যে এখানকার পাঁচজনকে বলতে পারত। বাপি গরিব হলেও, ভদ্র ঘরের ভাল ছেলে। কারও সাতে পাঁচে থাকত না। হারামি বউটাই তাকে ফাঁসিয়েছে। এখানকার অনেক কয়েদিকেই বাপি নিজের ঘটনা জানিয়েছে। তারা জানিয়েছে অন্যদের। তবু বাপির সন্দেহ হয়, এরা আমার কথা বিশ্বাস করছে তো? সন্দেহ হওয়ারই কথা, বাপি এখানকার কোনও কয়েদির গল্পই বিশ্বাস করে না। মনে হয়, এরা যা কিছু বলছে, সব মিথ্যে! দু' চারজন বাদে কেউ নিজের দোষ কবুল করে না। কারণ, এই সেলের প্রায় সবাই বিচারাধীন বন্দি। কারও অপরাধই প্রমাণ হয়নি। এখানকার একজন বাপিকে খুব বিশ্বাস করে। বাপির কপাল ভাল বলতে হবে, সেই লোকটাই এই সেলের পান্ডা। কমলদা, কমল গাঙ্গুলি। বাইরের লোক বামুন নিয়ে কত রকম আহ্লাদ করে, তারা ভাবতেই পারবে না, জেলে খুনি ডাকাতদের বাবা হয়ে বসে আছে একটা পৈতেধারী লোক!

বাপি যেদিন প্রথম এসেছিল এখানে, জেল অফিস থেকে দেওয়া বালিশ কম্বল পেটে করে উবু হয়ে বসেছিল, একটা লোক এসে বলল, "কমলদার সঙ্গে দেখা করো।" জেলে যে একজন বস থাকে এবং তাকে ঘিরে কিছু চামচা, এই ব্যাপারটা বাপি দত্ত উকিলের কাছ থেকেই জেনে এসেছিল। এদের নামে প্রচুর কেস। এরা কখনও সাজাপ্রাপ্ত কয়েদি, কখনও আবার বিচারাধীন। একটা কেসে জেল খাটা শেষ হলে, পরের দিনই অন্য কেসে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। চেলার অর্ডার শুনে কমল গাঙ্গুলির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল বাপি। কম্বলের গদিতে বসেছিল কমলদা। পৈতে দিয়ে পিঠ চুলকোতে চুলকোতে বলল, "কী রে, রথতলা কলোনির মাগী বিয়ে করেছিলি? শালা শখ মন্দ নয়!" বাপি তো হাঁ, এ কোথা থেকে খবর পেল? নাকি অনেকেই রথতলা কলোনির মেয়েকে বিয়ে করে বাপির মতো এখানে এসে ঢোকে? থ'মারা বাপিকে হাতের ইশারায় বসতে বলেছিল কমলদা। বাপি বসে সামনে, মনে প্রশ্ন।

"ওভাবে কী দেখছিস? ভাবছিস, কীভাবে জানলাম?"

বাপির ইচ্ছে করছিল, মাথা উপর নীচ করতে, সাহসে কুলোয়নি। কমলদা বলেছিল, "এখানে ঢোকার আগেই কেস হিস্ট্রি এসে যায় আমার হাতে। তুই ফোর নাইন্টি এইট নিয়ে ঢুকেছিস। তোর মা, দিদির বেল হয়ে গিয়েছে। পাড়ায় তোর রেপুটেশন কীরকম, সেই রিপোর্টও আছে আমার কাছে। রিপোর্ট ভাল। সবাই বলছে, তুই ফেঁসে গিয়েছিস রথতলা কলোনির মেয়েটাকে বিয়ে করে। এক দেখায় বিয়ে করেছিলি, পাড়াটা যে খারাপ, তাও জানতি না। মানে, পাক্কা বোকা তুই! কোনও খাদ নেই!" থেমে বড় করে শ্বাস নিয়েছিল কমলদা। ফের বলেছিল, "কিন্তু কথা হচ্ছে, বউ যারা পেটায়, তারা হয় মাতাল, নয়তো মেনিমুখো। তুই মদ খাস না, খবর এসেছে। তার মানে, মেনিমুখো! এসব লোকেরা পাড়ায় ভিজে বিড়াল হয়ে ঘুরে বেড়ায়, সবার সঙ্গে খুব ভাব। দোর বন্ধ করে কেলায় বউকে।"

স্বপক্ষে একটি কথাও বলেনি বাপি। তার শুধু মনে হচ্ছিল, এ কোথায় এসে পড়ল সে! পুলিশের মারধর এড়াতে কোর্টে এসে উকিলের কাছে সারেন্ডার করেছিল। তারপর দেখা যাচ্ছে সরাসরি ঢুকে পড়েছে বাঘের খাঁচায়! ধাঁ করে একটা পা বাপির সামনে বাড়িয়ে দিয়েছিল কমলদা। উদোম পা, তামাটে রং, বড় বড় লোম। লুঙ্গি থাইয়ের শেষ সীমানায়। বাপি বুঝতেই পারছিল, পা টা টিপে দেওয়ার জন্যই বাড়িয়েছে এখানকার বস। টিপতে বাধো বাধো লাগছিল, বড্ড ছোট মনে হচ্ছিল নিজেকে।

অন্যমনস্ক হয়ে অন্যদিকে তাকিয়েছিল কমলদা। পায়ে হাত পড়ছে না দেখে, কপাল কুঁচকে ধমক দিয়েছিল, "কী হল, টেপ!"

টিপতে শুরু করেছিল বাপি। কী করবে, উপায় তো নেই। দত্ত

উকিলের থেকে শুনে এসেছে, জেলে মারধর যা কিছু করে বস আর চামচেরা। ফাটকে ঢুকিয়ে দেওয়ার পর পুলিশের আর কোনও দায়িত্ব নেই। বস তখনও ঠিক করে উঠতে পারেনি, বাপি সত্যিই বউ পেটাতো কিনা।

চোখ বুজে পা টেপা খেতে খেতে কমলদা ডিরেকশন দিচ্ছিল, "হাঁটুর নীচটায় এক্‌ বেশি করে দে, চেটোটা, চেটোটা..." বেশিক্ষণ দিতে হয়নি। মিনিটদশেক হতেই কমলদা বলল, "ঠিক আছে, তুই ছাড়। বাচ্চু!" শুধু ডাকার অপেক্ষা, বাচ্চু ছিল পাশেই। বাপির মুখোমুখি বসে কমলদার ডান পা তুলে নিয়েছিল কোলে, টেপা দেখে মনে হচ্ছিল, লোকটার নিশ্চয়ই সেলুন ছিল। আন্দাজ অবশ্য মেলেনি। পরে বাপি জেনেছিল, বাচ্চুদা তিন নম্বর রুটে বাস আকাশপাতাল ভেবে চোখ খুলেছিল কমলদা। নীচের ঠোঁট উল্টে মাথা নাড়তে নাড়তে বলেছিল, "না। তোর দ্বারা বউ পেটানো সম্ভব নয়। এটা আমার কেন মনে হচ্ছে, তা অবশ্য বলতে পারব না। বিশ্বাসটা যতদিন থাকবে, আমার গ্রুপে খাওয়াদাওয়া করবি। পরে যদি কানে অন্যরকম রিপোর্ট আসে, লাথি মেরে বের করে দেব।" বিশ্বাস এখনও আছে। মনে হচ্ছে, শেষদিন অবধি থেকে যাবে। এখানকার সকলেই জানে, কমলদা মায়ের পেটের ভাইয়ের মতন দেখে বাপিকে। এত খাতিরে বাপির বেশ অস্বস্তি হয়। অন্য কয়েদিদের চেয়ে বাপিদের খাবারের মেনু অনেকগুণ ভাল। একই রান্নাঘরে দু' রকম রান্না হচ্ছে। অন্যরা যেখানে ছ'টায় ঘুম থেকে উঠে চা, মুড়ি ছোলা, অথবা চিঁড়ে খাচ্ছে, সেখানে বাপিরা ছ'জন খাচ্ছে, পরোটা, তরকারি, ডিমসেদ্ধ, এক নম্বর চা! লাঞ্চে অন্যদের [illegible] ভাত, ট্যালটেলে ডাল, পাঁচমিশালি তরকারি। সপ্তাহে [illegible]পিস মাছ, পনেরো দিন অন্তর খাসির মাংস। সে জায়গায় [illegible]পিদের রোজই মাছ মাংস চলছে। ঝরঝরে ভাত, ঘন ডাল, স্পেশ্যাল সবজি। বাপির মনে হয়, এক দু'দিন অন্য কয়েকদিদের [illegible]ঙ্গে বসে চালু খাবারটা খায়। ওদের বাড়ির লোকের [illegible]নো টাকাতেই তো বাপিদের এত লপচপানি! কিন্তু ভয় [illegible]য়, দয়া দেখাতে গিয়ে যদি কেলানি খায় কমলদার হাতে। [illegible]য়, [illegible]য়ে যাচ্ছিল। দুপুরে থালা হাতে বাপি লাইনে [illegible]াঁড়িয়েছে, [illegible] গোচ্ছে লাইন। কমলদার চ্যালা খোকা বাপির কনুই [illegible]র বের করে এনে বলল, "দাদা ডাকছে।"

[illegible]লদার সামনে যেতেই খেতে হল ধ্যাতানি। চোখ পাকিয়ে [illegible]লছিল, "আর যদি কোনওদিন ওই লাইনে দেখি, [illegible]র কি কোনও প্রেস্টিজ নেই? [illegible]ই লাথখোরদের লাইনে দাঁড়াবি?" [illegible]আর সাহস করেনি অন্য লাইনে দাঁড়াতে। [illegible]ল কমলদা কিছু বলে না। [illegible] আপত্তি নেই। শুধু এঁটো থালা ধোওয়া বারণ। কাজ বলতে, গাছে জল, মাঠ আর সেল ঝাড় দেওয়া, জল তোলা, নর্দমা পরিষ্কার, থালা ধোওয়া, রান্নার ব্যবস্থা করা। বাপি রান্না ঘরের কাজটাই বেছে নিয়েছে।

ক্রমশ

অলঙ্করণ: নির্মলেন্দু মন্ডল

সানন্দা শব্দভেদ

সূত্র পা শা পা শি

১ শরৎচন্দ্র পণ্ডিত যে নামে পরিচিত। ৪ অবশেষ, শেষকাল। ৬ মুসলিম কায়দায় পিছনে হঠে সসম্ভ্রম অভিবাদন। ৮ দুর্দান্ত, অতি দুরন্ত বা অশান্ত। ১০ বেগে ছোটা, দৌড়ানো। ১১ খাঁটি, প্রকৃত। ১২ গুণিরা সর্বত্র যা পান। ১৩ শস্য মাড়াই করার বা রাখার স্থান। ১৫ গ্রাস। ১৭ শ্রীলঙ্কার অন্যতম শহর। ১৮ রাজহাঁস। ১৯ সম্পূর্ণরূপে পেষণ। ২০ শিশু কৃষ্ণ। ২১ বিশৃঙ্খল অবস্থা।

১	২		৩		■	৪			৫
■		■		■	■		■	■	
■		■	৬		৭		■	■	
■	৮	৯		■		■	১০		
১১			■	■	১২			■	■
■	■	১৩		১৪	■	■	১৫	১৬	
১৭			■		■	১৮			■
	■	■	১৯				■		■
	■	■		■	■		■		■
২০				■	২১				

গত সংখ্যার সমাধান

বৃ	কো	দ	র	■	অ	নু	স	ন্ধা	ন
ন্তা	■	র	ণ	ভে	রি	■	র	■	য়
ক	র	দ	■	■	ন্দ	■	সি	ঞ্চ	ন
■	ম	■	ক	ল	ম	বা	জ	■	■
সা	জা	■	ল	■	■	জি	■	ম	ঘা
ম	ন	■	তা	■	■	মা	■	হা	ট
■	■	অ	ন	ব	র	ত	■	কা	■
গ	র	ব	■	র্ষ	■	■	প	ল	ক
র	■	দা	■	কা	র	বা	র	■	স
ম	ন	ন	শী	ল	■	গ	ত	ক্ল	ম

সূত্র পা শা পা শি

২ গোলামের গোলাম অর্থাৎ একান্ত অনুগত ব্যক্তি। ৩ কুরুরাজার বংশ। ৪ পরমেশ্বর। ৫ দেবসেনাপতি কার্তিকেয়। ৭ অমিশ্র, খাঁটি। ৯ বহুমূল্য দ্রব্যাদি রাখার ঘর। ১০ দেনা করা বা ঋণ নেওয়া। ১৪ অর্থাদির প্রাপ্তিস্বীকার পত্র। ১৬ শক্তিবৃদ্ধিকারী। ১৭ অগ্নিদেব। ১৮ বিমর্ষ, বিষণ্ণ। ১৯ গর্ত, কথা সাহিত্যিক সমরেশ বসুর বিখ্যাত উপন্যাস।

চিত্রপট

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

রান্না করে দু' তিনজন মাস্টার লোক, ক্যাটারিং ছিল তাদের। বাপি হেল্প করে, বাটনা বাটে, সবজি কেটে দেয়...কমলদা যেন কেন তাকে এত পছন্দ করে, এখনও বুঝে উঠতে পারেনি বাপি। কিন্তু ক'দিন যেতেই বুঝতে পেরে গেল কমলদার আসল ব্যাপারটা। কমলদাকে শুধু একটা জিনিসই সাপ্লাই দিয়ে যেতে হয়, খুনের প্ল্যান! একটাই মার্ডার। প্ল্যান এমন হবে, পুলিশ টিকিটিও ছুঁতে পারবে না। বাপি প্ল্যানটা বলে, কমলদা ফাঁকগুলো ধরিয়ে দেয়। পাকা লোক তো, অনেকগুলো বডি নামিয়েছে। খুনটা করবে বাপি, ডলিকে। জেলের দ্বিতীয়দিন কমলদা খুব মন দিয়ে শুনেছিল বাপির গল্প। একেবারে ডিটেলে, প্রায় এক ঘণ্টা ধরে। মাঝে মুখটা কখনও করুণ হয়ে যাচ্ছে, কখনও বা রেগে উঠছে। দু'বার বাপিকে থামিয়ে পায়চারি করে নিল। বাপির বলা শেষ হলে, কমলদা উত্তেজিত গলায় জানতে চেয়েছিল, "এখান থেকে বেরিয়ে প্রথমে তুই করবি?"

উত্তরে বাপি বলেছিল, "শোধ তুলব। প্রতাপ, ডলি আর ওর বাবা মায়ের উপর।"

"কীভাবে শোধ তুলবি?" ফের প্রশ্ন করেছিল লদা।

"প্রতাপকে প্রথমে কেলাব। আমাদের ফল্‌স কেসে জেলে ঢোকানোর জন্য ডলিদেরও জেলের ভাত খাইয়ে ছাড়ব!"

শে! তুই কি শালা হিজড়ে নাকি? সেই জন্যই তোর বউ চার জায়গা মাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ওকে আর কী দোষ দেব!" হতাশ গলায় বলেছিল কমলদা। বসকে অসন্তুষ্ট হতে দেখে বাপি তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিল, "তা হলে তুমি বলো, কীভাবে শোধ নেব?"

"মার্ডার। একেবারে সামনাসামনি। মরার আগে ডলি যেন জেনে যেতে পারে, কে তাকে খুন করল। তোর বন্ধু আর ডলির বাবা মায়ের ব্যবস্থা আমি করছি। লোক দিয়ে ওদের আমি এইসা ক্যালান ক্যালাবো, জীবনে আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না! তবে ডলির শাস্তি তোকে নিজে হাতে দিতে হবে। তবেই বুঝব। তুই এক বাপের ব্যাটা।"

কমলদার কথা শেষ হতেই তড়িঘড়ি ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিল বাপি। সে জানে, খুনটা মোটেই করতে পারবে না। অত কল্‌জের জোর ওর নেই!

বড্ড তাড়াতাড়ি সায় দেওয়ার কারণে কমলদার বোধ হয় সন্দেহ হয়েছিল! বাপিকে তাতানোর জন্য বলতে থাকে, "সবকিছু জানার পরও তুই তো ওকে ভালবেসেছিলি, চেয়েছিলি ওর পাস্ট ভুলে সুখে ঘর সংসার করতে। তোর ভালবাসার কোনও দাম দেয়নি [illegible] মা দিদির উপর অত্যাচার করে গিয়েছে মানে। শেষমেশ জেলে ঢুকিয়েছে। তোদের বংশের কানও মেয়ে কখনও জেলে যায়নি।"

পি বলেছিল, "ছেলেও যায়নি। আমি প্রথম।"

"তবে! এই গদ্দারির সাজা একটাই, খুন! তোরা যতই

দিনচারেক আগে ডলির বাবা-মা এসে কাকুতিমিনতি করল, "আমরা কেস

নির্দোষ হোস, সমাজে আর কোনওদিন মাথা তুলে হাঁটতে পারবি না। আত্মীয়দের কোনও অনুষ্ঠানে যেতে মন চাইবে না তোদের। হাজার বোতল সেন্ট ঢেলেও গা থেকে জেলের গন্ধ তাড়াতে পারবি না! তার দাম দিতে হবে না ডলিকে?”

আলোচনা চলে। প্ল্যান তৈরি করতে গিয়ে বাপি মনে মনে এতবার খুন করেছে ডলিকে, সত্যিকারের খুন করার রোখটাই চলে গিয়েছে! ব্যাপারটা কমলদা বুঝতে না পারলেই হল। বাপি ভেবেছিল, কমলদাও নিশ্চয়ই বউ পালিয়ে যাওয়া পাবলিক। তাই

তুলে নিচ্ছি। তুমি ডলিকে ঘরে নাও। মেয়েটা একদম পাল্টে গিয়েছে। সারাক্ষণ বাড়িতেই থাকে।”

কমলদার কথায় তখনকার মতো সত্যিই তেতে গিয়েছিল বাপি। বলেছিল,“ হ্যাঁ। ওকে খুনই করব আমি। কিন্তু ধরা পড়লে তো ফাঁসি। ও মরবে, আমি মরব তাতে কী লাভ?”

“মরবি না। আমি তো আছি। তুই খুনের প্ল্যানগুলো বল। আমি বলে দিচ্ছি, ভুলগুলো কোথায়, কী করলে ধরা পড়বি না!”

তারপর থেকে বাপি একটা করে খুনের প্ল্যান বের করে শোনায় কমলদাকে! কখনও বলে, ওভারব্রিজ থেকে ঠেলে ফেলে দেব ট্রেনের সামনে। আয়নার সামনে যখন সাজবে, আদর করতে গিয়ে চালিয়ে দেব ছুড়ি, বিষ মিশিয়ে দেব খাবারে, যখন খেয়ে নেবে, বলব, বিষ ছিল... সবার থেকে আলাদা হয়ে নিজেদের মধ্যে এসব এত খার চরিত্রহীন মেয়েদের উপর। পরে বাপি খবর নিয়ে জেনেছে, কমলদার তিনটে বিয়ে। একটা বউ এই সেলের এক কয়েদির বউ ছিল, দেখা করতে আসত স্বামীর সঙ্গে। কমলদা ভালবেসে ফেলে তাকে। সেই কয়েদি ছাড়া পেয়ে গিয়েছে অনেকদিন। কমলদার কোনও ক্ষতি করার চেষ্টা করেনি। মেনে নিয়েছে ভবিতব্য। বছরে এক দেড় মাস জেলের বাইরে কাটাতে পারে কমলদা। পালা করে তিন বউয়ের কাছে থাকে। তবু যেন কেন মেয়েদের উপর এত রাগ, কে জানে! বাপির এখানে কেটে যাচ্ছে বেশ। দেখতে দেখতে একমাস হয়ে গেল। দত্ত উকিল বলেছে, “ম্যাক্সিমাম আর হপ্তাখানেক। তারপরই বেল হয়ে যাবে।

তোমার পিছনে এখন কমল গাঙ্গুলি, কেস টানলে টাকাই পাব না!” কমলদার প্রতি কৃতজ্ঞতায় মাথা নিচু হয়ে যায় বাপির। ভাবতে খারাপ লাগে, দিনসাতেক পরেই লোকটাকে ছেড়ে যেতে হবে! কথা মতো ডলিকে খুনও করতে পারবে না। তবে উচিত শিক্ষা একটা দেবেই। ইতিমধ্যে অনেকেই জে ল এসে দেখা করে গিয়েছে বাপির সঙ্গে। শিবে দা তো অবাক হয়ে বলল, “কী জাদু করেছ এখানে? তোমার জন্য তো কোনও টাকা দিতে লাগছে না!” মা দিদিও এসেছিল দু’বার। বাপি আর আসতে বারণ করে বলেছিল, “ক’দিন পর তো বেরিয়েই যাব। খামোকা দৌড়ঝাঁপ করছ কেন!” মা এখন আগের বাড়িতে ফিরে গিয়েছে। দেখাশোনা কর ছে বিজয়কাকারা। দিদি ফিরে গিয়েছে শ্বশুরবাড়িতে। ওদিকে আর কোনও প্রবলেম নেই। বিজনদাও একদিন এসেছিল দেখা করতে। বাপি বলেছে, “এখান থেকে বেরিয়ে আপনার কাছেই চাকরি করব। না করতে পারবেন না।” একগাল হেসে বিজনদা বলেছিল, “কোরো।” বিজনদার মতো মানুষ হয় না! কীভাবে দেড়টা মাস পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। অন্য জায়গায় চাকরির চেষ্টা করবে না বাপি। বেশি মাইনে দিলেও না। সত্যিই তো তার গায়ে জেলের গন্ধ লেগে গেছে। বিজনদার কারখানা ছাড়া অন্য কোথাও গিয়ে সহজ হতে পারবে না। আর একজন উপকারী মানুষ অবশ্য এখনও আসেনি দেখা করতে, দাশুবাবু। হয়তো জানেই না বাপি এখন কোথায়! সারেন্ডার করার আগের ক’দিন বাপি কারখানায় ছিল। এখান থেকে বেরিয়েই বাপি দাশুবাবুর সঙ্গে দেখা করবে।

াপির চেনাজানা ভাল লোকগুলো সব বাইরে। সে পড়ে রয়েছে পাঁচিলঘেরা য়গায়। দিন দিন পাঁচিলটা যেন একটু করে উঁচু হয়। ’দিন আগে কমলদাকে লেছিল. াপি। কমলদা বলেছিল, “ছুটির দিন যত এগিয়ে বে, ছটফট করবি খুব। ঘুম আসবে না রাতে। তখন আমার কাছে সে মাল খেয়ে যাস।” অনেক কয়েদিকেই রাতে উঠে কাঁদ দেখেছে বাপি। দু’ একজন আছে সারাক্ষণ গুম মেরে কে। অনেক কয়েদিই রাতে না ঘুমিয়ে কাঁদে। বেশ ক’বার ঘুম ভেঙে গিয়েছে বাপির। ভিজিটার্স টাইম একটা থেকে তিনটে। ঙ্গা হয়ে যায়, অপেক্ষা করে বাড়ির লোকের জন্য। াপির কাছে ‘খারাপ লোক’ বলতে দু’জন এসেছিল। দিনচারেক আগে। ডলির বাবা মা। কত কাকুতিমিনতি, “আমরা কেস তুলে মি ডলিকে ঘরে নাও। মেয়েটা এখন একদম পাল্টে সব শোনার পর বাপি দাঁত “আমি একবার বাইরে বেরই, তোমাদের কী অবস্থা করব, দেখবে!”

ক্রমশ

অলঙ্করণ: নির্মলেন্দু মন্ডল

সানন্দা শব্দভেদ

সূত্র পা শা পা শি

১ শ্রদ্ধা দেখানো। ৫ উপলব্ধি, বোধ। ৮ অবনতি; পড়ার বা পতনের অবস্থা। ৯ খারাপ, মন্দ। ১০ লবণসম্বন্ধীয়। ১২ পরিবর্তন, আজকাল মন্ত্রিসভায় মাঝে মধ্যেই যা হয়। ১৫ সময়ের অভাব। ১৮ কথায় আছে এদের গলায় দড়ি। ২০ দৃষ্টিপাত, তাকানো। ২২ কোনও সময়ে। ২৪ না পারা। ২৬ আকস্মিক বেগে আসে এমন। ২৮ প্রধান, মুরুব্বি। ২৯ আকস্মিকভাবে একাধিক ঘটনার যুগপৎ সংঘটন।

১	২	৩		৪		৫		৬	৭
৮								৯	
				১০			১১		
১২	১৩		১৪						
					১৫	১৬		১৭	
১৮		১৯							
					২০				২১
		২২	২৩						
২৪	২৫						২৬	২৭	
২৮					২৯				

গত সংখ্যার সমাধান

দা	দা	ঠা	কু	র		প	রি	শে	ষ
	সা		রু			রে			ড়া
	নু		কু	র	নি	শ			ন
	দা	মা	ল		ছ		ধা	ব	ন
আ	স	ল			ক	দ	র		
		খা	মা	র			ক	ব	ল
জা	ফ	না		স		ম	রা	ল	
ত			বি	দ	ল	ন		ব	
বে			ব			ম		র্ধ	
দা	মো	দ	র		অ	রা	জ	ক	তা

সূত্র পাশাপাশি

১ অন্যত্র যাওয়া। ২ বহুলোকের এক জায়গায় বিশৃঙ্খল সমাবেশ। ৩ দীপ বা প্রদীপ। ৪ শ্রীকৃষ্ণ। ৫ যে কাঠের ঘর্ষণে আগুন জ্বলে। ৬ ইহলোক। ৭ মন্দভাগ্য। ১১ কটু, তীব্র। ১৩ স্বামী ও স্ত্রী। ১৪ দশ ফোঁটার তাস। ১৬ ইসলামি রীতির প্রাথমিক বিদ্যালয়। ১৭ কল্পনাপটু। ১৮ যার নাম পরিচিত নয়। ১৯ বৃষ্টিপ্রেমী পাখি। ২০ ক্লান্তিহীন। ২১ ছোট গাছবিশেষ। ২৩ বিচারের জন্য উপস্থাপিত, রুজু। ২৫ দিনের পর যা আসে। ২৬ হঠাৎ আগুন জ্বলে ওঠার শব্দ। ২৭ মনোগত ভাব।

চিত্রপট

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

বাপির রাগ ফিরে আসছে। ডলির সঙ্গে সবচেয়ে ভাল সময়টা কেটেছিল

পরদিনই মা এসেছিল ভিজিটিং টাইমে। একাই এসেছিল। বলল, ডলির বাবা মা নাকি মায়ের পায়ে গিয়েও পড়েছে। ক্ষমা চেয়েছে বারবার। ডলিকে ঘরে ফিরিয়ে নিতে অনুরোধ করেছে। মা ওদের সঙ্গে কোনও খারাপ ব্যবহার করেনি। বলেছে, "ছেলে আগে ফিরুক, তারপর ওসব নিয়ে কথা হবে।" বাপিকে মাথা না গরম করার পরামর্শ দিয়ে গিয়েছে মা।

"অ্যাই বাপি, ভিজ়িটর এসেছে তোর।"

ঘোর ভাঙে বাপির। ডেকে দিয়ে গেল বাচ্চুদা। সেলের মেঝেতে বসে এতক্ষণ আঁক কাটছিল বাপি। কে এল আবার এখন? সেলের দরজায় বাপির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে গার্ড। নিয়ে যাবে ভিজ়িটরের কাছে। জালের কাছে এসে চমকে ওঠে বাপি। এক হাত দূরে আর একটা জাল, দাঁড়িয়ে আছে ডলি! লালচে রঙের কোঁচকানো সালোয়ার কামিজ, মাথাভর্তি সিঁদুর, একদমই সাজেনি। রোগা হয়ে গিয়েছে কি? মুখটা খুব দুঃখু দুঃখু করে রেখেছে। পুরো অ্যাক্টিং!

বাপি কিছুই বলছে না দেখে ডলি ভাঙা গলায় লল, "তোমার পাড়ার লোক ঢুকতে দিচ্ছে না। মি বাড়ি যাব।"

াপি দাঁত চেপে বলে, "ভালই তো। পাড়ার লোককে বলে দেব, যাতে তোমাকে না আটকায়। থেকে বেরিয়েই তো তোমাকে আমি খুন করব। ভালই হবে, তখন আর খুঁজে বেড়াতে হবে না।"

ডলি মাথা নিচু করে এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

বাপিও ফিরতে থাকে গলি ধরে। শরীর থেকে অদৃশ্য কিছু একটা বেরিয়ে যাচ্ছে, কেমন যেন হালকা হালকা লাগছে শরীর মাথা! পোষা রাগটা কি উবে যাচ্ছে? বাপি পা চালিয়ে সেলে ফিরে আসে। জানলার ধারে চামচেদের মাঝে বসে আছে কমলদা। বাপি সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

কমলদা বলল, "কী রে, কিছু বলবি? ভিজ়িটর কে এসেছিল?"

গুরুত্ব না দিয়ে বাপি বলল, "ওই, পাড়ার একটা মেয়ে।"

কমলদা ঠোঁট উল্টে এমন একটা ভাব করল, পাড়ার মেয়ে দেখতে আসা যেন বিরাট ব্যাপার!

বাপি বলল, "আর একটা আইডিয়া এসেছে মাথায়, পরে ভুলে যেতে পারি।"

কমলদা হাতের ইশারায় চেলাদের সরে যেতে বলে। নিমেষে খালি হয়ে যায় কমলদার চারপাশ। বাপি বসে পড়ে সামনে। ডলিকে খুন করার ছকটা জমিয়ে বলতে হবে, নয়তো এতদিনের পোষা রাগ বরিয়ে যাবে সব। বাপি শুরু করল, "বুঝলে , আমার মনে হয়, ওকে ভিক্টোরিয়া মমোরিয়াল দেখাতে নিয়ে গিয়ে খুন করলে বচেয়ে ভাল হয়!"

কেন?" জানতে চায় কমলদা।

"ওখানে ঝোপ, পুকুর সব আছে। কিস করতে করতে টুক করে ফাঁস টেনে দেব ওড়না দিয়ে। আওয়াজ পাবে না কেউ। লোকে ভাববে, ভালবাসা বাসি হচ্ছে। আশপাশে যখন দেখব কাউকে দেখা যাচ্ছে না, পুকুরে ঠেলে দেব বডিটা। তারপর ঝোপের আড়াল ধরে কেটে পড়ব!"

ঠিকঠাক। পুকুরের জলে ভাসবে রানি!

বামুনবুড়ি দক্ষিণেশ্বর গিয়েছিল। এখনই বাস থেকে নামল বড় রাস্তার মোড়ে। সঙ্গে গগনের বউ। দুর্গাবাড়ি এখান থেকে খুব দূরে নয়। বড় রাস্তার মোড় থেকে চিরকাল পায়ে হেঁটেই ফিরেছে

ভিক্টোরিয়ার মাঠে বসে। ডলিকে ওই বাড়ির রানি কল্পনা করেছিল বাপি! বলেওছিল ডলিকে।

"গুড, হেভি প্ল্যান। তোর কিসের দাগ থাকবে না, ধুয়ে যাবে জলে। যাওয়ার সময় মনে করে ওর হাতব্যাগটা নিয়ে নিবি। ওতে মোবাইল থাকবে তো, আরও অনেক কিছু থাকবে, পুলিশের হাতে গেলে, ইজ়িলি ধরা পড়ে যাবি তুই..."

কমলদার কথা কানে ঢুকছে না বাপির, ফিরে আসছে রাগ। ডলির সঙ্গে সবচেয়ে ভাল সময়টা কেটেছিল ভিক্টোরিয়ার মাঠে বসে। ডলিকে ওই বাড়ির রানি কল্পনা করেছিল বাপি! সেকথা বলেওছিল ডলিকে। ওখানেই ডলিকে মারলে শোধ নেওয়া হবে

বামুনবুড়ি। এখন আর পারে না। বয়স তো আর বসে নেই। রিকশা স্ট্যান্ডের দিকে এগোয় দু'জনে।

"দেখিস বাবা, বেশি পয়সা নিসনি। আমি কিন্তু এখানকার পুরনো লোক!" রিকশাওয়ালাকে বলে বামুনবুড়ি। স্ট্যান্ডে পা রেখে রিকশার সিট ধরে ওঠার চেষ্টা করে, পারে না। বুড়িকে উঠতে সাহায্য করে রিকশাওয়ালা। গগনের বউ পাশে উঠে এল। ওর হাতে দু'টো ক্যারিব্যাগ, ভিতরে দু'জনের পুজোর ডালা। যার মধ্যে আছে মায়ের পায়ে ঠেকানো ফুল আর প্রসাদ। রিকশা

চলতে শুরু করেছে। অনেকদিন ধরেই দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার চেষ্টা করছিল বামুনবুড়ি। কাউকে সঙ্গে পায় না। সবাই ব্যস্ত। গগনের বউকে বলে রেখেছিল এক সপ্তাহ আগে, আজ ও আসতে পেরেছে। মায়ের কাছে অনেক ক'টা মানত করা ছিল। মোটামুটি সব উতরেছে। পুজো না দেওয়া অবধি মনে স্বস্তি পাচ্ছিল না বুড়ি। আজ বড় আনন্দ হচ্ছে। বামুনবুড়ি মায়ের কাছে মনে মনে প্রার্থনা করেছিল, দুর্গাবাড়ি নিয়ে এমন কিছু ঘটুক, যাতে বাড়ি বিক্রি আটকে যায়। বুড়ি ভাবতে পারেনি, মায়ের রোষানলে এভাবে পড়ে যাবে প্রোমোটার। দু' মাস হাসপাতালে কাটিয়ে বেচারা এখনও বিছানায়। স্ট্রোক, শরীরের একটা পাশ পড়ে গিয়েছে। মায়ের কাছে আজ নতুন করে মানত করে এসেছে বামুনবুড়ি,'' মা, পারিজাতকে সুস্থ করে দাও। একবার যখ এতবড় ধাক্কা খেয়েছে আর আগের ভুল করবে না।'' প্রোমোটারের ঠেলায় যেসব ভাড়াটে ঘর ছেড়েছিল, তারা সবাই ফিরে এসেছে। বিজন কোথা থেকে টাকাপয়সা জোগাড় করে একট একটু করে সারাচ্ছে দুর্গাবাড়ি। এসবই তো মনে মনে মায়ের কাছে চেয়েছিল বামুনবুড়ি। বাপি জেলের যাওয় র সঙ্গে সঙ্গে মা'কে স্মরণ করেছিল, "ছেলে টা বড় ভাল গো, ও যেন তাড়াতাড়ি ছাড়া পায়।' বাপিকে জেলে পাঠিয়েছে ওর বউ। ওদের মধ্যে ন কি বনিবনা নেই। এর চেয়ে বেশি কিছু জানে না বামুনবুড়ি। বিজন তাকে এইটুকুই বলেছে। বাপির খোঁজে প্রায়ই পুলিশ আসত দুর্গাবাড়িতে। বিজন ওকে আগলে রেখেছিল। বাপির ব্যাপারে বামুনবুড়িকেও বেশ কয়েকবার জেরা করেছিল পুলিশ। বুড়ি বলেছে, "কারখানায় কে ঢুকছে বেরচ্ছে, আমি অত খোঁজ রাখতে যাব কোন দুঃখে?"

এ ধরনের মিথ্যে বলার অভ্যেস বামুনবুড়ির আছে! দুর্গাবাড়িতে একসময় নানা পার্টির কত নেতা, কর্মী লুকিয়ে থেকেছে। তাদের কেউ পুলিশের নাগালের বাইরে থাকতে চায়, কেউ বা উল্টো পার্টির। সবাইকেই লুকিয়ে রেখেছে বামুনবুড়ি। কানও বাছবিচার করেনি। বাপির জন্য এবার ভাল বুদ্ধি বের রছিল বিজন। কারখানা আর সুন্দরদের ঘরের মাঝের জাটা খুলে ভেজিয়ে রেখেছিল। আগে তক্তাতে পেরেক ত। দরজা খোলা তে সুবিধে হয়েছিল, পুলিশ এলেই বাপি চলে ল সুন্দরদের ঘরে। তা ও বাপির জেল রোখা গেল ব লছিল, বাপি নাকি নিজেই ধরা দিয়েছে। ামুনবুড়ির মাথায় ঢোকে না এসব, ধরাই যখন দিবি, লুকিয়ে কতে গেলি কেন? বাপি জেল থেকে ফিরেছে পাঁচ মাসের ল, পুজো দিতে যাওয়া হচ্ছিল না। রিকশা র্গাবাড়ির সামনে। নেমে এল বামুনবুড়ি, গগনের বউ। দরের কাছে সে থমকে দাঁড়ায় বুড়ি, একটা বউ দোরগোড়ায় র ঘুর করছে। মনে হচ্ছে, পোয়াতি।

মশ

লেন্দু মণ্ডল

শব্দভেদ

সূত্র পা শা পা শি

১ বিয়ের রাতে বর কনে যা করে। ৩ সবাইকে চেনে এমন। ৭ ধূলা। ৮ কোনও ব্যক্তির পরিবর্তে যে স্বাক্ষর করে। ১০ তাড়াতাড়ি। ১১ ভাষণ, কথা। ১২ সম্পূর্ণ নষ্ট। ১৪ হাতি। ১৫ অরণ্যে নির্বাসন। ১৭ সদ্য উদয়। ১৯ মরণশীল। ২০ সূর্যের আলো। ২২ দ্বিধাগ্রস্ত। ২৩ ঝগড়ার দেবতা। ২৫ যুদ্ধের বেশ। ২৬ অজয়, ব্রহ্মপুত্রকে যা বলা হয়। ২৭ তীব্র যন্ত্রণা। ২৮ বর কনের বিয়ের রাত কাটানোর ঘর।

১		২			■	৩		৪	৫
	■		■	■	৬	■	■	৭	
	■	৮		৯		■	১০		
১১			■	১২		১৩		■	■
	■	■	১৪		■	১৫			১৬
১৭		১৮		■	১৯		■	■	
■	■	২০		২১		■	২২		
২৩	২৪		■	২৫				■	
২৬		■	■		■	■		■	
২৭				■	২৮				

গত সংখ্যার সমাধান

অ	ভি	বা	দ	ন	■	অ	নু	ভ	ব
প	ড়	তি	■	ন্দ	■	র	■	ব	দ
স	■	■	■	লা	ব	ণি	ক	■	ন
র	দ	ব	দ	ল	■	■	ডু	■	সি
■	ম্প	■	হ	■	স	ম	য়া	ভা	ব
অ	তি	চা	লা	ক	■	ক্ত	■	বু	■
জ্ঞা	■	ত	■	■	অ	ব	লো	ক	ন
ত	■	ক	দা	চ	ন	■	■	■	ট
না	রা	■	য়ে	■	ল	■	দ	ম	কা
মা	ত	ব্ব	র	■	স	মা	প	ত	ন

সূত্র পা শা পা শি

১ সাধক কবির গানে জমিরূপে কল্পিত মানুষ। ২ অতি দ্রুতবেগে ঘোরার ভাব। ৪ চিরস্থায়িত্ব। ৫ দৃষ্টি। ৬ মরে না এমন। ৯ শব্দ, বাচনভঙ্গি। ১০ গৃহ, ভবন। ১৩ মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ১৪ গুপ্ত, অপ্রকাশিত। ১৬ সমস্ত নাগরিকের সমান অধিকার বা ক্ষমতা। ১৮ সমবেদনা। ১৯ জীবনের অবসান। ২১ অন্যকে কর দেয় এমন। ২২ দ্বিতীয়বার বিবাহপ্রার্থী। ২৩ শিখ ধর্মের প্রবর্তক। ২৪ দাঁত।

বামুনবুড়ি এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী মা, কী চাই এখানে?"
"এ বাড়িতে কোনও কারখানা আছে। বাপি নামে কেউ কাজ করে?" জানতে চায় বউটা।
"করে তো। তা তুমি কে?"
"আমি ওর বউ।"
বামুনবুড়ি খুশি হল। যাক, বাপির এই ঝামেলাটাও মিটল। রাগ পড়েছে বউয়ের, ফিরে এসেছে স্বামীর কাছে। বামুনবুড়ি ডেকে নিল বউটাকে, "এসো বাছা, আমার সঙ্গে এসো।"
ঘরটা একটু অন্ধকার মতো হতেই বিজন কম্পিউটারের পর্দা থেকে চোখ সরিয়ে দরজার দিকে তাকাল, ঠাকুরমা, পাশে অনুজ্জল শাড়ি পরা একটা বউ। কনসিভ করেছে বউটা, পেট বেশ উঁচু হয়ে আছে। মেয়েটাকে কেমন যেন চেনা চেনা লাগল বিজনের। ঠাকুরমাকে জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার?" বিজনের কথার উত্তর দিল না বামুনবুড়ি। সরাসরি বাপির উদ্দেশে বলল, "কই রে দ্যাখ, কাকে নিয়ে এসেছি!"
বাপি স্ক্রিন টানছিল একমনে। ঘুরে তাকায়, কারেন্ট াওয়ার মতো চমকে ওঠে ডলিকে দেখে!
ুকে এল বামুনবুড়ি, "কী ল, মনে হচ্ছে একেবারে চিনতে পারছিস না? এই ুলে গেলি?"
মি কে চিনি না। পেটের বাচ্চাটাও আমার নয়!" চিৎকার করে একথা বলে হুটপাট করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল বাপি।
রায়দা, সুবল হাঁ হয়ে গিয়েছে গোটা ঘটনায়! বিজন মনে করার চেষ্টা করে যাচ্ছে মেয়েটাকে, কোথায় যেন দেখেছে! আগে মেয়েটা দেখতে খুব ভাল ছিল!

বামুনবুড়ি বলল, "চল বউ, আমার ঘরে চল। রাগ কমলে বাপি ঠিক তোকে চিনবে।"
ঘর থেকে দু'জন বেরিয়ে যেতেই, বিজন মনে করতে পারে মেয়েটাকে, একদম শিওর! এরই ছবি এঁকেছিল অমিতেশ। বাপি বলল, বাচ্চাটা ওর নয়। না হওয়ারই কথা। বাপি অনেক মাস বউয়ের থেকে আলাদা। তা হলে কার সন্তান পেটে ধরেছে মেয়েটা? ভীষণ নার্ভাস লাগতে শুরু করেছে বিজনের! খানিক বাদেই মনে হয়, আমি যে আশঙ্কার কথা ভাবছি, তা না ও হতে পারে। বাপি বলেছিল, ওর বউয়ের চরিত্র ভাল নয়। খারাপ পাড়ায় বড় হয়েছে। সেই হিসেবে বাচ্চাটা যে অমিতেশের, নিশ্চিত করে বলা যায় না। আবার মেয়েটার পেট দেখে আন্দাজ করা যায়, মোটামুটি ছ' সাত মাসের। অমিতেশও প্রায় ওরকম সময়ই গাপন থেকে ফিরে গিয়েছে দিল্লি। ঘটনাগুলো চাখের সামনে ভাসছে বিজনের, অমিতেশের গাপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে বিজন ফোন করেছিল কুনালকে। বেজে গিয়েছিল ফোন। পরের দিন সকালে কুনাল নিজেই ফোন করে জানাল,
সিংহোমে।

মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকে এল বামুনবুড়ি, "কী হল, মনে হচ্ছে একে

চিত্রপট

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

অবস্থা খুবই ক্রিটিকাল। গত রাতে পারিজাতই ছিল কুনালের গাড়িতে। অত বড় খবরও তেমন নাড়া দেয়নি বিজনকে। সে তখন অমিতেশের ব্যাপারে বেশি উদ্বিগ্ন। কুনালকে সব ঘটনা খুলে বলেছিল। কুনাল নির্বিকার গলায় বলল, "চল, ওকে তুলে নিয়ে আসি। মাথা ওর খারাপ হয়েছে, আমাদের তো হয়নি। শালা ওরকম

বারে চিনতে পারছিস না? ক'দিনেই বউকে ভুলে গেলি?"

একটা গাড্ডায় গিয়ে পড়েছে, একদিকে মডেল, অন্যদিকে রামকিশোরদার ছেলে। ছেলেটাকে প্রথম দিন দেখেই আমার মনে হয়েছিল, ঢ্যামনা। অমিতেশকে শেষ করে দেবে ওরা।"

বিজন বলেছিল, "ওকে তুলে আনার ব্যাপারে, শুধু আমাদের ইনিশিয়েটিভ নেওয়া কি ঠিক হবে? ওর মেন্টাল কন্ডিশন যা দেখে এসেছি, জোর করে তুলে আনতে গিয়ে দেখা গেল, মাথা পুরোটাই খারাপ হয়ে গেল! এ ব্যাপারে ওর বাড়ির লোককে জড়িয়ে নেওয়া উচিত। নয়তো পুরো দায় আমাদের ঘাড়ে চাপবে।"

"ঠিক হ্যায়, কোই বাত নহি। আমি নন্দাকে ফোন করে আনিয়ে নিচ্ছি। অমিতেশের এবাড়ির লোকেরা সিচুয়েশনটা স্মার্টলি ডিল করতে পারবে না।"

নন্দার নাম শুনেই কুনালকে একটা ব্যাপারে সর্তক করে দিয়েছিল বিজন, "মেয়েটার কথা তুলিস না নন্দার কাছে। শক্‌ড হবে। অমিতেশের ছবিগুলো দেখে যদি কিছু বোঝার হয়, বুঝে নেবে।"

"ওকে, তাই হবে," বলে ফোন কেটেছিল কুনাল।

দু'দিন পরেই কুনাল ফোন করে জানাল, "বিকেল পাঁচটা নাগাদ নন্দাকে নিয়ে তোর ওয়র্কশপে আসছি, রেডি থাকিস।"

নিজের গাড়িতে নন্দাকে এয়ারপোর্ট থেকে পিক আপ করে সোজা ওয়র্কশপে চলে এসেছিল কুনাল। নন্দা শ্বশুরবাড়ি, বাপের বাড়ি, কোনওটাতেই ঢোকেনি। পাছে কেউ যদি সঙ্গী হতে চায়! সন্ধে নামতে দিয়ে বিজনরা বেরিয়েছিল অমিতেশকে উদ্ধার করতে। বিজন ইচ্ছে করেই দেরি করিয়েছিল, নন্দাকে যেন মেয়েটার মুখোমুখি না হতে হয়। আগের দিন বিজন সন্ধের পর গিয়ে মেয়েটার দেখা পায়নি। সেদিনও পেতে হল না। ওদের দেখে অমিতেশ যে আচরণ করবে ভেবেছিল বিজন, তার পুরো উল্টো ব্যবহার করল। দরজা খুলে অমিতেশ বলেছিল, "ভালই হল তোরা এসে গিয়েছিস। ক'দিন ধরেই ভাবছি, ফোন করব। ভয়ও হচ্ছে, আমাকে নিতে এসে তোরা যদি আবার ওদের হাতে মারধর খাস..."

আগের দিনের তুলনায় অমিতেশকে আরও বেশি অসুস্থ এবং কিছুটা অস্থির লাগছিল। কমপ্লিট ছবিগুলো প্যাক করে রেখেছিল, ইজেলে ছিল সেই ছবিটা, যেটার কাজ চলছিল। যত দূর মনে হল, বিজন দেখে যাওয়ার পর থেকে ছবিটায় আর হাত পড়েনি। অমিতেশের অস্থায়ী সংসার পড়ে রইল। ব্যাগে জামাকাপড় গোছাতে গোছাতে অমিতেশ কুনালকে বলেছিল,

"তুই একবার বেরনোর রাস্তাটা দেখে আয়, আমাদের আটকানোর জন্য দলবল দাঁড়িয়ে আছে কিনা?"
একটা লোকও ছিল না। বিজন তেমনটাই আন্দাজ করেছিল। অমিতেশ অহেতুক আতঙ্কে ভুগছে। নন্দা বসেছিল কুনালের পাশে। বিজনরা ক্যানভাসগুলো নিয়ে পিছনের সিটে। গাড়ি কিছুটা চলার পর কুনাল মিউজ়িক প্লেয়ার অন করেছিল, বাজছিল লতা মঙ্গেশকরের পুরনো হিন্দি গান।
গানের তলায় গলা রেখে বিজন অমিতেশকে বলেছিল, "ছবিটা তো ইনকমপ্লিট রইল।"
বিষণ্ণমুখে মাথা উপর নীচ করে অমিতেশ বলেছিল, "ও আর আসছে না।"
"কেন?"
"ওরা আটকে রেখেছে।"
"ওরা কারা?"
"জানি না," বলে জানলার বাইরে তাকিয়ে রইল অমিতেশ।

কানাইপুরে একদিন থেকে পরের দিন নন্দা, অমিতেশ ফ্লাইটে দিল্লি চলে গেল। ওখানে পৌঁছনোর পর একবার ফোনে কথা হয়েছিল ওদের সঙ্গে। তারপর কথা হল মাসখানেক আগে। ´বাড়ি রিপেয়ারিংয়ের জন্য বন্ধুদের কাছে অল্প কিছু করে টাকা চাইবে ঠিক করেছিল বিজন। প্রথম ফোনটা র অমিতেশকে।

ফোন পেয়ে অমিতেশের গলায় একটু বাড়াবাড়ি উচ্ছ্বাস, "কী রে, আছিস কেমন? বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া মিটেছে? ওটাও চালাচ্ছিস নাকি?"
শিউলিকেই ইঙ্গিত করেছিল নিশ্চয়ই। এড়িয়ে গিয়ে বিজন প্রয়োজনের কথাটা বলল, "দুর্গাবাড়ির অবস্থা খুব খারাপ। দেওয়ালে ফাটল, ছাদ ভেঙে পড়ছে। রিপেয়ারিং না করালেই নয়। এদিকে প্রোমোটার বিছানা নিয়েছে। কবে উঠবে ঠিক নেই। এখানকার ভাড়াটে, মানে আমিসুদ্ধু চাপা পড়ব বাড়ির নীচে!
নস, ভিখিরির চেয়ে
ভাল। এত বড় বাড়ি সারানোর সঙ্গতি আমারও নেই। তোরা যদি একটু হেল্প করিস, শোধ করে দেব। তবে সেটা আমাদের সাধ্যমতো সময়ে।"
ব্যাপারই না। আমার
অনেক টাকা। ই যে ছবিগুলো দেখেছিলি,
বক'টাই বিক্রি হয়ে গেছে। আমাকে আর চাকরি করতে হচ্ছে না। ফুলটাইম আর্টিস্ট হয়ে গিয়েছি। পাশে পাখির ডাক শুনতে পাচ্ছিস?"
পেয়েছিল বিজন। বলল, "হ্যাঁ।"
মিতেশ বলেছিল, "আমি এখন চান্দায়। পাহাড়ের ছবি কাই এসেছি। পাখিটা সকাল থেকে ডাকছে, এত চুতে পাখি বেশি থাকে না। আমি এখন যেখানে বসে আছি, যের পিছনের কথা মনে থাকে না।"

ক্রমশ

লঙ্করণ: নির্মলেন্দু মন্ডল

শব্দভেদ

সূত্র পা শা পা শি

১ শ্রদ্ধা দেখানো। ৫ বিকেলবেলার। ৮ দেবরাজ ইন্দ্রের সারথি। ৯ বেশির বিপরীত। ১০ বিরক্তিকর বাচালতা। ১২ সেই সময়ের। ১৫ এক ধরনের জনপ্রিয় পিঠে। ১৮ কাজের নয় এমন। ২০ অধিকার না থাকা। ২২ অতি মিহি ও মসৃণ বস্ত্রবিশেষ। ২৪ অর্ধেক বা প্রায় অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ২৬ নৌকার পাল। ২৮ কুৎসিত অক্ষর। ২৯ একই সময়।

১	২	৩		৪	■	৫		৬	৭
৮			■		■		■	৯	
	■	■	■	১০			১১	■	
১২	১৩		১৪		■	■		■	
■		■		■	১৫	১৬		১৭	
১৮		১৯			■		■		■
	■		■	■	২০				২১
	■	২২	২৩			■	■	■	
২৪	২৫	■		■		■	২৬	২৭	
২৮				■	২৯				

গত সংখ্যার সমাধান

মা	লা	ব	দ	ল	■	স	ব	চি	ন
ন	■	ন	■	■	অ	■	■	র	জ
ব	■	ব	ক	ল	ম	■	স	ত্ব	র
জ	বা	ন	■	ব	র	বা	দ	■	■
মি	■	■	গ	জ	■	ব	ন	বা	স
ন	বো	দ	য়	■	ম	র	■	■	মা
■	■	র	বি	ক	র	■	দো	ম	না
না	র	দ	■	র	ণ	সা	জ	■	ধি
ন	দ	■	■	দ	■	■	ব	■	কা
ক	ন	ক	ন	■	বা	স	র	ঘ	র

সূত্র লম্বালম্বি

১ পরিষ্কার করা হয়নি এমন। ২ বাড়ির যা মজবুত করতে হয়। ৩ অল্পবয়সি মেয়ে। ৪ শ্রী কৃষ্ণ। ৫ ধনসম্পত্তি। ৬ মাটির উপর গাড়ির চাকার দাগ। ৭ পদ্মের কুঁড়ি। ১১ রোজনামচা। ১৩ কেনা। ১৪ চণ্ডিকাদেবীর রূপবিশেষ। ১৬ করণীয় কাজের নির্দিষ্ট পরম্পরা। ১৭ শিলা। ১৮ অতিরিক্ত আধুনিক। ১৯ প্রকার। ২০ ক্লান্তিহীন। ২১ রসপূর্ণ। ২৩ জেলার প্রধান শহর। ২৫ অহংকার। ২৬ বাসস্থান। ২৭ মূল্য, দর।

চিত্রপট

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

বিজন চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল, টাকা থেকে পাখিতে চলে গেল অমিতেশ! নন্দার উচিত হয়নি ওকে একা ছাড়া। মাথার অবস্থা এখনও সুবিধের মনে হচ্ছে না। খানিক বিরতির পর অমিতেশ বলে উঠেছিল, "তুই চিন্তা করিস না। আমি তো এখান থেকে টাকা পাঠাতে পারব না, নন্দাকে ফোন করে দেব, ও তোর সঙ্গে যোগাযোগ করে নেবে।"

ক'দিন বাদেই ফোন করেছিল নন্দা। জিজ্ঞেস করেছিল, "কত টাকা লাগবে?"

বিজন বলেছিল, "তোমাদের যতটা দিলে অসুবিধে না হয়, ততটুকুই দিও।"

নন্দা বলল, "দু' লাখ পাঠাচ্ছি। আর একটা ব্যাপার একটু বলে রাখি। তোমার বন্ধু আগের ছবিগুলোর হ্যাংওভার এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি, ও হয়তো আবার কানাইপুরে যেতে চাইবে। আমি তো আটকানোর চেষ্টা করবই। তুমিও এটা সেটা বলে ওকে ডিসকারেজ কোরো।"

নন্দা ছবির মেয়েটার ব্যাপারে কিচ্ছু জিজ্ঞেস করল না। বিজন এটাও বুঝেছে, মেয়েটার কারণেই অমিতেশকে এখানে আসতে দিতে চাইছে না।

ময়মতো টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিল নন্দা। ওই দিয়েই ´বাড়ি রিপেয়ারিংয়ের কাজ শুরু করেছে। ´কে ফোন করেছিল, বলেছে টাকা দেবে। কুনাল াফ জানিয়েছে, একটা পয়সাও দিতে পারবে না। কানও টাকাই নেই হাতে। যাও বা কিছু আমদানির যোগ এসেছিল, বিজনের জন্যই নাকি সেটা নষ্ট হয়েছে। পারিজাত, বিজনের টাসলে হেরে গিয়েছে পারিজাত। টেনশনটা হজম করতে পারেনি। বিজন জানে কুনাল এরকমই, কোনওদিনই সিরিয়াস হতে পারল না। যৌবনের অবুঝ আবেগ এখনও রয়ে গিয়েছে ওর মধ্যে। এই কুনালই হয়তো কাল তুলিকাকে ভজিয়ে ভাজিয়ে ওর গয়না বিক্রি করে টাকা নিয়ে আসবে। দুর্গাবাড়ির সমস্যাগুলো এখন প্রায় মিটিয়ে এনেছে বিজন, এই সময় বাপির বউয়ের আসাটা খুবই বিপজ্জনক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। ঠাকুরমা যেভাবে আগলে নিয়ে গেল ওকে...আশ্রয় দেওয়ার যথেষ্ট যুক্তিও আছে। ছ' সাত মাসের পেট নিয়ে, বাচ্চার বাবাকে খোঁজার তো একটা লিমিট আছে! আর কত পথ ঘুরবে মেয়েটা? অমিতেশের এখানে আসাটা যে করেই হোক আটকাতে হবে। কুনালকেও বলা যাবে না, এই মেয়েটারই ফাঁদে পড়েছিল অমিতেশ। কুনালের যা স্বভাব, এখনই হইচই শুরু করে দেবে। হয়তো অমিতেশকে ডেকে পাঠাল। অমিতেশের আবার হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হওয়ার প্রবণতা আছে। মেয়েটাকে দেখে মাথায় হয়তো ভূত চাপবে, বাচ্চাটা আদৌ ওর কি না, তা নিয়ে মাথাই ঘামাবে না! মা আর বাচ্চার সমস্ত দায়িত্ব তুলে নেবে কাঁধে। নন্দা ব্যাপারটা কীভাবে নেবে, াপির প্রতিক্রিয়া কেমন হবে, প্রতিশোধ নেওয়ার ফাকাসটা অমিতেশের দিকে ঘুরে যাবে না তো? ভাগ্য ভাল, মেয়েটাকে শুধু বিজন শনাক্ত করতে পরেছে। কুনাল পারবে না, অমিতেশের ছবিগুলো দখেনি। গোপন ডেরা থেকে বেরনোর আগেই মিতেশ প্যাক করে রেখেছিল ক্যানভাসে। কানাইপুরের বাড়িতে ফিরে সেসব আর খোলা

ঠাকুরমার ইন্টারভিউ নিয়ে কুনাল এক্সাইটেড। বলল, "বুড়ি কী শট দিল

মাইরি! ভাবতে পারবি না। ওকে আমার সিনেমায় ব্যবহার করতে হবে। একটা আবিষ্কার।”

হয়নি। পরের দিন সবগুলো নিয়ে ওরা প্লেনে ওঠে। বাপির বউ বিজনকে চেনে না। একটুর জন্য হয়তো দেখা হয়নি। অমিতেশের গোপন আস্তানা খুঁজে বিজন যখন পৌঁছেছিল, তার আগেই বেরিয়ে গিয়েছিল মেয়েটা। সেদিন যদি দেখা হয়ে যেত, মেয়েটা হয়তো বাপির খোঁজ না করে বিজনের কাছে অমিতেশের ঠিকানা চাইত। বিজনের জানা তথ্যগুলো সব চেপে যেতে হবে। কিছু সত্য চিরকাল গোপন থেকে যায়। সব প্রকাশ হয়ে গেলে, এতদিন ধরে পৃথিবীর চাকা চলত না!

“এবার কী হবে?”

সম্বিত ফিরল বিজনের। প্রশ্নটা রায়দার, সামনে দাঁড়িয়ে আছে অসহায় মুখ করে। কথাটা ঠিক ধরতে পারল না বিজন। কপাল কুঁচকে জানতে চাইল, “কীসের কী হবে?”

“এই যে এত কাজ পড়ে রইল? আজই ডেলিভারি সব। বাপিটা আবার চলে গেল।”

নিত্যকার রাগটা ফিরে এল বিজনের মনে। এতদিন হয়ে গেল, লোকটা একফোঁটা কাজ শিখল না! বিজনকে জব্দ করার জন্যই যেন এখানে ঢুকেছে। খেঁকিয়ে উঠল বিজন, “কী আবার হবে। হয় নিজে করুন, নয়তো খুঁজে নিয়ে আসুন বাপিকে।”

দ্বিতীয়টা রায়দার পক্ষে সহজ। সে এগোল দরজার দিকে!

আরও তিন মাস কেটে গেল। এবার ভীষণ গরম পড়লেও, আজ সকালটা বড় মনোরম। ভোরের দিকে বৃষ্টি হয়েছে, মেঘ এখনও কাটেনি। কাজের চাপে আজ মাথা তুলতে পারছে না বিজন। এদিকে কুনাল এসেছে, সঙ্গে দেবরাজ। আড্ডাই হল না। কুনাল মুভি ক্যামেরা এনেছে। ছবি তুলছে দুর্গাবাড়ির। হেরিটেজ বিল্ডিং নিয়ে তথ্যচিত্র তৈরি করবে। বরাত পেয়েছে সরকারের থেকে। সরকার পেমেন্ট দিলেই, বলেছে দুর্গাবাড়ির জন্য কিছু দেবে। সকালে এখানে ঢুকেই বিজনের কয়েকটা শট নিয়েছে কুনাল। ওয়র্কশপে নয়, এবাড়ির ভাঙা ঘরের পুরনো আমলের জানলার পাশে, ছাদে ইট খসে পড়া সিঁড়িতে বসিয়ে। বলেছে, “ওয়র্কশপে তোকে ঠিক মানায় না। দাড়ি গোঁফসমেত তোর মধ্যে একটা হেরিটেজ লুক আছে, প্রপার অ্যামবিয়েন্সে ফেললে, ফ্রেমটা খুলে যাবে।” বিজনের সামনে বুম ধরেছিল দেবরাজ। ক্যামেরার লুক থ্রু করে কুনাল বলেছিল, “এবাড়ির ইতিহাস নিয়ে কিছু বল।”

“মাফ কর বাবা! তুই যা জানার, ঠাকুরমার কাছ থেকে জেনে নে। সে ভাল বলতে পারবে। আমার হাতে প্রচুর কাজ।”

ঠাকুরমার ইন্টারভিউ নিয়ে ওয়র্কশপে ফিরে এসেছিল কুনাল। খুব এক্সাইটেড। বলল, “বুড়ি কী শট দিল মাইরি! ভাবতে পারবি না। ওকে আমার সিনেমায় ব্যবহার করতে হবে। একটা আবিষ্কার। ইন্দির ঠাকরুনের মতো!”

“তুই আগে রায়দার পার্টটা দে। কথা দিয়েছিলি।”

শিশুর মতো হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল কুনাল। ফ্রেঞ্চ কাট রেখেও হাসিটার বয়স বাড়াতে পারেনি! কুনাল হাসলেই ফ্রেঞ্চ কাটটা নকল মনে হয়। দেবরাজ আজ কুনালের অ্যাসিস্ট্যান্টগিরি করছে বটে, কিন্তু ওর এবাড়িতে আসার আসল উদ্দেশ্য অন্য। পারিজাত যে টাকা অ্যাডভান্স হিসেবে দিয়েছিল ভাড়াটেদের, সেটা আদায় করতে আসে। আজ নিয়ে প্রায় দশ বারোবার আসা হয়ে গেল। পারিজাত এ যাত্রায় বেঁচে গেলেও, পুরোপুরি সুস্থ আর কোনওদিনই হবে না। বিজন দেবরাজকে বলেছে, "আপনাকে এত ঘন ঘন আসতে হবে না। ভদ্রস্থ একটা অ্যামাউন্ট হাতে এলেই, ফোন করে ডেকে নেব।" টাকা শোধ করার ব্যবস্থাও করে ফেলেছে বিজন। অর্কর পাঠানো টাকাতে দুর্গাবাড়ির চব্বিশটা ঘরের মেরামত কমপ্লিট। ভাড়াটেদের ভাড়া বাড়িয়েছে, দিতে বলেছে নিয়মিত। তিন মাস বাদ পড়লেই অসুবিধে জানতে চাওয়া হবে কমিটি থেকে। ভাড়াটেদের কয়েকজনকে নিয়ে বিজনই কমিটিটা তৈরি করেছে। কমিটি ঠিক করেছে, বিজন তাদের সেক্রেটারি। দুর্গাবাড়ির পিছন দিকে অনেকটা খোলা জায়গা আছে। সেটা গাড়ি রাখার জন্য দেওয়া হচ্ছে। ভাড়ার টাকাতেই শোধ হবে পারিজাতের ঋণ। তারপর যেটা জমবে, রাখা হবে বাড়ির মেরামতির জন্য। যারা পারিজাতের থেকে টাকা নিয়েছিল, সুবিধেমতো অ্যামাউন্ট জমা করতে থাকবে কমিটির ফান্ডে। পুরোটাই দিতে হবে। সময় পাবে

সালিশি করতে হবে। বিজন বলেছে, "দেখো, এটা আমার অফিস। এখানে বসে ওসব আমি শুনব না। সপ্তাহে একটা দিন ঠিক করো, নির্দিষ্ট সময়ে কমপ্লেন শুনবে কমিটি। তখন যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার, নেওয়া যাবে।" এদের ঝগড়ার আয়ু অবশ্য খুব কম, এক সপ্তাহের বেশি টেকে না! হয়তো দুই কর্তার ঝগড়া চলছে, তাদের দুই বউ লুকিয়ে একে অপরকে রান্না পাঠাচ্ছে। বুদ্ধিটা জোর বাঁচিয়েছে বিজনকে। শুধু একটা ঝগড়াকে সে কিছুতেই এড়াতে পারছে না, ডলি বাপির কাজিয়া! ওটা যখন তখন আছড়ে পড়ছে ওয়র্কশপে। ডলির ছেলে হয়েছে। দেখতে মোটেই বাপির মতো নয়, খুব ফর্সা, গালগাল। অমিতেশের মুখটা মনে করে মেলানোর চেষ্টা র বিজন কখনও মেলে, কখনও না! ডলির মতোও হতে রে। ডলি তো একসময় খুব সুন্দর ছিল, অমিতেশের বলেছে। ডলির াবি, বাচ্চাটা বাপির। বাপি কিছুতেই মেনে নেবে বলে; "সব হিসেব মনে আছে। ও বাচ্চা আমার তেই হতে পারে না। মি ডিএনএ টেস্ট করাব।" ই ব্যাপারটা বাইরের কারও সঙ্গে আলোচনা করে নেছে পি। বিজন খেয়াল করায়, "ডিএনএ টেস্টের কিন্তু অনেক খরচ।"

ক খরচ। আমি নিজেকে বিক্রি করে প্রমাণ করব, ও বাচ্চা আমার য়!"

ই ঢ্যাঁটা। মাঝে মাঝেই বাচ্চা কোলে নিয়ে শপের দরজায় এসে দাঁড়ায়। তাকিয়ে থাকে বাপির দকে। বাপি তখন হয়তো মন দিয়ে কাজ করছে, দরজার দকে না তাকিয়ে কেমন করে যেন বাপি টের পায় ডলি

ডলি মাঝে-মাঝেই বাচ্চা কোলে নিয়ে এসে দাঁড়ায়। তাকিয়ে থাকে বাপির দিকে।

প্রচুর। এসবই জানে দেবরাজ। তবু কিছুদিন অন্তর চলে আসে। বিজনকে বলেছে, "টাকার জন্য আসি না। জায়গাটা আমার অন্যরকম লাগে। মনে হয়, টাইম মেশিনে চড়ে অতীতে পৌঁছে গিয়েছি!"

দেবরাজ ওয়র্কশপে বসে বাঁশি শোনায়। একদিন ছাদের ভেঙে পড়া ঘরটায় বাঁশি বাজিয়ে উত্তেজিত হয়ে নেমে এল দেবরাজ। বিজনকে বলল, "প্লিজ়, চলুন একবার উপরে। ওই ঘরে কী অদ্ভুত সাউন্ড এফেক্ট আসছে!"

বিজন গিয়েছিল ছাদে। দোতলার সেই ঘরের ছাদ অনেকটাই নেই। তখন সন্ধেবেলা, তারারা সবে ফুটছে। জানলার মুখোমুখি চাঁদ। দারুণ বাজাচ্ছিল দেবরাজ। বিজন দেবরাজের বাঁশির প্রশংসা করেছিল কুনালের কাছে।

কুনাল বলল, "ধুর, ধুর! ও কী বাঁশি বাজাবে। ননী ক্ষীর খেয়ে বড় হয়েছে! ঠিক মতো দুঃখ কষ্ট না পেলে বাঁশি ভাল বাজানো যায় না। সব শিল্পের ক্ষেত্রেই তাই। বাঁশির বেলার একটু বেশি। তুই রাগসঙ্গীতের কিছু বুঝিস না বলে ভাল লেগেছে।"

বিজন আর তর্কে যায়নি। সত্যিই সে ক্লাসিক্যাল ভাল বোঝে না। শুনতে ভাল লাগে। দুর্গাবাড়িতে ক'দিন পরপর বাঁশি বাজছে ঠিকই, যা আগে কখনওই কল্পনা করা যেত না, কিন্তু তা বলে ঝগড়া কিছু কমেনি। খুটখাট লেগেই আছে। এর সঙ্গে নতুন একটা আপদ তৈরি হয়েছিল, অনেক বুদ্ধি করে সেটা সামলেছে বিজন। দুর্গাবাড়ির নতুন অধ্যায়ে ঝগড়া মাত্রাছাড়া পর্যায় পৌঁছলেই, দু' পক্ষ চলে আসছিল ওয়র্কশপের দরজায়, এসেছে। কাজ করতে করতে বিজনকে বলে, "দাদা, ওকে এখান থেকে সরে যেতে বলুন। কাজে ডিস্টার্ব হচ্ছে।" ডলি নানা ধরনের ঝামেলা করে। যেমন, ওয়র্কশপে ঢুকে বাচ্চাটাকে বাপির টেবিলে নামিয়ে বলে, "দিদা ঘরে নেই। পায়খানা যাচ্ছি।" বাপির তখন ত্রাহি চিৎকার, ডলি ততক্ষণে ধাঁ! ঝগড়া একদিন এমন চরমে উঠল, বাপি চ্যালাকাঠ দিয়ে মারতে গেল ডলিকে। বামুনবুড়ির আড়ালে লুকোল ডলি। বুড়িও গেল খেপে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "যা, ডলিকে দেখতে হবে না তোকে। এবাড়ির আমার অংশটা ডলির নামে লিখে দিয়ে যাব। তুই কেন, তোদের কারখানাসুদ্ধু উচ্ছেদ করবে ডলি।" কথাটা আঁতে লেগেছিল বিজনের। সবাইকে শুনিয়ে বিজনকে এভাবে ছোট করার কোনও মানে হয় না! এই সংঘাতে তার তো কোনও ভূমিকা নেই। বাপিটাও হয়েছে এমন, বিজনের কারখানা ছেড়ে যাবে না। ঝগড়া অপেক্ষা করছে জেনেও রোজ আকডাঙা থেকে কাজে এসে ঢোকে। বিজন বলেছে, অন্য কোথাও চাকরি দেখে নিতে। সে ও যাবে না, "ও কোন অধিকারে এবাড়িতে এসে আছে? আমি তো চাকরি করতে আসি। এবাড়িতে ঢুকেছি ওর অনেক আগে। ওকে জায়গা দিয়ে, আমাকে তাড়ানো ঠিক হচ্ছে না।" এই সমস্যার সমাধান বিজন এখনও খুঁজে পায়নি। এদিকে আবার কানাঘুষো শুনেছে, বুড়ি সত্যিই উকিল ডেকে পাঠিয়েছিল, ডলির নামে নিজের অংশটা লিখে দিয়েছে! ঠাকুরমাকে এই ব্যাপারে কোনও প্রশ্ন করেনি বিজন। আত্মসম্মানে লাগছিল। বিজন একটা বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছে,

সম্পত্তি ডলিই পাক আর যে কেউ, দুর্গাবাড়ির ভাড়াটেদের উচ্ছেদ করা কঠিন হবে। বিজন এদের মধ্যে এমন একটা সংঘবদ্ধ ভাব এনে দিয়েছে, ভিত সহজে নাড়ানো যাবে না। বিজনের লিডারশিপের গল্প কৃষ্ণার কানেও পৌঁছে ছে। বাড়ি ফিরতে বিজনের রাত হলে, কৃষ্ণা টিটকিরি মারে, "ওই যে এলেন, দেশের কাজ করে!" শ্লেষের তলা থেকে একটু বুঝি গর্বের ' ন্ধও পায় বিজন!

ওয়র্কশপে ঢুকল সুবল, বাপি একঘণ্টা পরে আসে। সুবল রায়দাকে বলল, "কী হল, আমার টেবিলে কাজ কই?"
"তুই আগে কয়েকটা এক্সপোজ দে। তারপর কাজ পাবি।"
"কেন, তোমাদের এক্সপোজ মাস্টারের কী হল? তাকে দিয়ে করাও।"
"এগুলো আর্জেন্ট আছে। না করবি তো দাদাকে বল।"

হয়, ও ঠাকুরমাকে বালিশ চাপা দিয়ে মেরেছে!"
এবার বিজনেরও সন্দেহ হতে শুরু করে। ডাক্তার সার্টিফিকেট দিয়ে গিয়েছে ঠিকই, বুড়ি মানুষ বলে বেশি খতিয়ে দেখেনি। ক্তারেরও সত্তর পেরিয়েছে। ডলি এখনও কেঁদে যাচ্ছে, নও প্রতিবাদ করেনি। বিজন ওর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ল, "বাপি ী বলছে, শুনছ?"
ও তোলে না, পিঠ নামা করছে। বাপি চলে এল কাছে, বেখেয়ালে কালে তুলে নিল বাচ্চাটাকে, "ও সব পারে! আমার চয়ে ভাল ওকে কেউ চেনে না। এখনই পুলিশ ডাকা উচিত।"
বিজন ফের ডলিকে বলল, "কী হল, কিছু বলো? ডাকব পুলিশ?"
মুখ তুলল ডলি। চোখ ভেসে যাচ্ছে জলে। কান্নাচাপা গলায় লল, "বাড়ি কার মে লিখে গিয়েছে, নিজেই গিয়ে দেখুন না। ওই তো, ট্রাঙ্কের মধ্যে আছে।"
ডলি। বিজন এগিয়ে কে ট্রাঙ্ক খোলে। দলিল পায়। নতুন কাগজ। পড়তে রমার দরজার মুখে এসে দাঁড়ায়। এখানে

এই দৃশ্যকে অত্যন্ত প্রতিভাবান কোনও পেন্টারের আঁকা ছবি বলে মনে হয় বিজনের।

বাপি সুবলে কম্পিটিশন চলছে। যেমন সব কারখানায় হয়। বিজন এসব কথা কানে নেয় না। কালার ভান করে নিজের কাজ করে যায়। কিন্তু এই মুহূর্তে বিজন আর বধির থাকতে পারল না...কারণ, বাইরে কে যেন মড়াকান্না জুড়েছে, "ওগো, কী সর্বনাশ হল গো! ও গো তোমরা কে কোথায়..."
ডলির গলা। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে বিজন, ডলির বাচ্চার কিছু হল? বাপি কি বিড়ালের মতো একফাঁকে ঢুকে মেরে ফেলল বাচ্চাটাকে? নাকি নিয়ে পালিয়েছে, কোথাও গিয়ে ফেলে আসবে। ঘর থেকে ছিটকে বেরোয় বিজন। ঠাকুরমার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কাঁদছে ডলি। বিজনকে দেখতে পেয়ে বলল, "দিদা, মরে গিয়েছে।" 'মরে গিয়েছে' বিষম বিস্ময়ের কথাটা মনে মনে বলে বিজন! এগিয়ে যায় ঠাকুরমার ঘরের দিকে। ঘরে ঢুকে ঠাকুরমার মুখের দিকে একপলক তাকাতেই বিজন বুঝতে পারে, সত্যিই মরে গিয়েছে। চোখটা খোলা। চোখের পাতা নামিয়ে দেয় বিজন। মনে মনে বলে, বলা নেই, কওয়া নেই, চলে গেল! আজ সকালেও তো হেঁটে চলে বেরিয়েছে। পিছনে ভিড় জমেছে, বিজন বলল, "ডাক্তার ডাকো। ডেথ সার্টিফিকেট লাগবে।"

ঠাকুরমাকে দুর্গাবাড়ির উঠোনে খাটিয়ায় শোয়ানো হয়েছে। খবর পাঠানো হয়েছে বাবাকে। বাবা আদৌ আসবে কি না, তা নিয়ে চিন্তায় আছে বিজন। যদি না আসে, তাকেই মুখাগ্নি করতে হবে। বামুনবুড়িকে ঘিরে দুর্গাবাড়ির অনেকেই কাঁদছে। সবচেয়ে বেশি ডলি। পাশে বাচ্চাটা পড়ে রয়েছে, কোনও হুঁশ নেই! বাপি ঢুকল ভিড় ঠেলে। আজ কাজে আসতে দেরি হল ওর। চারপাশের অবস্থা বুঝে নিয়েই চেল্লামেল্লি শুরু করে দিল বাপি। ডলির দিকে আঙুল তুলে বলল, "ওই শালি মেরেছে। ওর নামে লিখে দিয়ে গিয়েছে বাড়ি...তর সইল না, বুড়িকে মেরে দিয়ে এখন নিজে সব ভোগ করবে।" সবার চোখ এখন ডলির দিকে। ডলি কিন্তু কিছু বলছে না, ফুঁপিয়ে যাচ্ছে মাথা নিচু করে।
বাপি চেঁচাচ্ছিল, "ও এরকম কিছু একটা ঘটাবে, আমি আগেই জানতাম। যে বাড়িতে ঢুকবে, ছারখার করে দেবে! আমার মনে

দাঁড়িয়েই কনকলতা ভট্টাচার্য দুর্গাবাড়িকে দেখত। আজকের দৃশ্যটা আর দেখা হল না। ঠাকুরমার হয়ে বিজন দেখছে। উইল যখন পড়ছিল বিজন, পাশে দাঁড়িয়ে এবাড়ির কয়েকজন দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়েছে। এখন সকলেই জানে, কনকলতা ভট্টাচার্য নিজের অংশ একমাত্র নাতিকেই দিয়ে গিয়েছে!
উঠোনে এখন অন্তিমযাত্রার নিঃশব্দ আয়োজন। ঠাকুরমাকে মালা পরানো হয়েছে, খাটের পায়ায় বাঁধা হচ্ছে ফুল। বিজন লক্ষ করে, কী আশ্চর্য কাণ্ডজ্ঞানে কুনাল এই দৃশ্যের ছবি তুলছে না! ক্যামেরার মুখ মাটির দিকে। পাশে দাঁড়িয়ে দেবরাজ, হাতে বাঁশিটা নেই। আজ অ্যাসিস্ট্যান্টগিরি করে কাটল ওর। আজ যদি বাঁশি বাজাত, শুনে যেতে পারত ঠাকুরমা। বাপি বাচ্চাটাকে কোল থেকে নামায়নি, এখনও কি হুঁশ ফেরেনি ওর? বুলান, কৃষ্ণাকে ভিড় সরিয়ে ঢুকতে দেখে বিজন, কৃষ্ণার কাঁধে অফিস ব্যাগ। ঠাকুরমাকে দেখার পর মা, মেয়ে কাকে যেন খুঁজছে ভিড়ের মধ্যে। বিজনকে নিশ্চয়ই। অবশেষে বাবা মাকে ঢুকতে দেখে বিজন। বাবার পরনে লুঙ্গি, গেঞ্জি, কোমরে গামছা। শ্মশান যাওয়ার জন্য রেডি হয়েই এসেছে। মুখাগ্নি তার মানে করবে। সামনের এই দৃশ্যকে অত্যন্ত প্রতিভাবান কোনও পেন্টারের আঁকা ছবি বলে মনে হয় বিজনের। অন্তিম যাত্রার দৃশ্য, অথচ কী প্রাণময়! কত রকম লোক, প্রত্যেকের ভঙ্গি আলাদা, ভঙ্গির পরতে লুকিয়ে তাদের ইতিহাস। এদের সবাইকে ধারণ করেছে দু'শো আড়াই'শো বছরের পুরনো এই বাড়ি। এত নিখুঁত করে কে যে ছবিটা আঁকল, কোনও সিগনেচার নেই! মা, কৃষ্ণা, বুলান একে একে ঠাকুরমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছে। বাবাও খুব নির্বিকারভাবে করতে গিয়েছিল, পারল না। কান্নায় ভেঙে পড়ল ঠাকুমার পায়ের উপর! আসলে শিল্পী সংশোধন করল ক্যানভাসের এই অংশটা...বোধ হয় ঠিক মনঃপূত হচ্ছিল না। চিত্রপটের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে বড্ড একা মনে হতে থাকে বিজনের। চৌকাঠ ডিঙিয়ে সে নীরবে ছবির মধ্যে ঢুকে যায়!

অলংকরণ: নির্মলেন্দু মণ্ডল

সমাপ্ত